ভারত-সংস্কৃতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—পাঁচ টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীসুখেন গুপ্ত

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৮, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

আমার কতকগুলি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—বৈশাখ, ১৩৪৫ সালে "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" নাম দিয়া সাতটি প্রবন্ধ বাহির হয় এবং জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ সালে "ভারত-সংস্কৃতি" নাম দিয়া আটটি প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রথম পুস্তকখানির খালি তিনটি সংস্করণ হয়, দ্বিতীয়খানির মাত্র একটি। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে এই দুইটি পুস্তকের প্রবন্ধগুলিকে একত্র করিয়া "ভারত-সংস্কৃতি" নামে প্রকাশিত করা হইল। কেবল "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" পুস্তকের "ভিক্ষুক" প্রবন্ধটি বাদ দেওয়া হইল—সেটি অনুরূপ অন্য কতকগুলি রচনার সহিত প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

এই দুইখানি বই, "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" এবং "ভারত-সংস্কৃতি" যথাক্রমে আমার সহপাঠী সুহৃৎ মেজর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বর্ধন এবং "বঙ্গীয় শব্দকোষ"-এর সংকলয়িতা ও বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঁহাদের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। প্রস্তুত মিলিত গ্রন্থখানিকে যথাপূর্ব প্রিয়বর মেজর প্রভাতকুমার বর্ধন এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের প্রতি আমার যথাযোগ্য প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত সমর্পণ করিতেছি। আশা করি, এই নবীন সংস্করণে এই দুইখানি বই বঙ্গীয় পাঠকসমাজে পূর্ববৎ আদরের সহিত গৃহীত হইবে। ইতি

চৈত্র সংক্রান্তি, বঙ্গাব্দ ১৩৬৪ — শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুধর্মা

১৬, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯

এই পুস্তকের প্রথম আটটি প্রবন্ধ "গুপ্ত প্রকাশিকা" কর্তৃক ১৩৫৮ সালে "ভারত-সংস্কৃতি" পুস্তকে প্রকাশিত হয় এবং অবশিষ্ট ছ'টি প্রবন্ধ "মিত্র ও ঘোষ" কর্তৃক প্রকাশিত "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

সূচীপত্র

ভারত-সংস্কৃতি

হিন্দু সভ্যতার পত্তন

আমাদের হিন্দু সভ্যতার অতি-প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা সকলেই অতিমাত্রায় সচেতন। প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ ভাবে চর্চা করেন নি কিন্তু সাধারণ শিক্ষা পেয়েছেন এমন হিন্দু-সন্তান প্রায় সকলেই এই কথাটীকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য ব'লে মেনে নিতে অভ্যস্ত যে, পৃথিবীতে সভ্যতার প্রথম উদয় হয় আমাদের এই ভারতবর্ষে, আর এই প্রাচীনতম সভ্যতার পত্তন ঘ'টেছিল আমাদের আর্য্য পূর্ব-পুরুষদেরই মধ্যে। জগতে সভ্যতার উদ্ভব আর্য্যদেরই মনীষার ফল ; এর জন্য কৃতিত্ব তাঁদেরই, আর তাঁদের বংশধর ব'লে আমরাও এই কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী। আমাদের হিন্দুজাতির অতি-প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা সংস্কার ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মজ্জার ভিতরে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। পুরাণ-কাহিনীতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চার যুগের কথা আমরা পড়ি, সে কত লক্ষ বছরের কথা! "লক্ষ"-টাকে না হয় একটু অতি-রঞ্জন ব'লেই মানলুম, কিন্তু অনেক হাজার বছরের কথা, এটা তো বটে!

আমাদের মধ্যে যাঁরা আধুনিক শিক্ষা একটু-আধটু পেয়েছেন তাঁরা ভারতবর্ষের বাইরের কোনও এক দেশ থেকে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে আর্য্যেরা যে এদেশে এসে হিন্দুসভ্যতার পত্তন করেন, এ কথাটা সাধারণতঃ এক রকম মেনেই নিয়েছেন। যাঁরা প্রাচীন শিক্ষা পেয়েছেন, কেবল সংস্কৃতই প'ড়েছেন, তাঁরা এ কথাটা নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যকতাই উপলব্ধি করেন না, বা স্বীকার করেন না,—তাঁদের কাছে ভারতবর্ষই আর্য্যজাতির আদি পিতৃভূমি, ভারতের বাইরের কোনও দেশ থেকে কোনও কালে আর্য্যেরা যে এসে থাকতে পারে, একথা মনে করাই তাঁদের কাছে একটা অসম্ভব কল্পনা। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আর্য্যেরা এসেছিল কি না, একথা নিয়ে আলোচনা এখন ক'রবো না ; তবে ভারতবর্ষের বাইরে থেকেই যে আর্য্যেরা এসেছিল, এই মত-বাদই আমি গ্রহণ করি,—খালি এইটুকুই উপস্থিত ক্ষেত্রে ব'লে রাখ্‌ছি। বাইরে থেকে আর্য্যদের ভারতে আগমন হয়,—এই মত বিগত উনিশের শতকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপে কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিকের

মধ্যে দানা বাঁধ্‌তে থাকে, এবং পণ্ডিত মাক্স-মূলর্‌ এই মতটী বিশেষ ভাবে তাঁর প্রবন্ধাদিতে প্রচার করেন। তিনি আর তাঁর মতন আরও কতকগুলি পণ্ডিত অনুমান ক'রেছিলেন যে, মধ্য-এশিয়ায়, এখন থেকে চার হাজার বৎসর পূর্বে, আদি আর্য্যজাতি বাস ক'রৃত, সেখানে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বা অন্য কারণে আর্য্যদের বাস অসম্ভব হ'য়ে পড়ায়, তারা পশ্চিমে আর দক্ষিণে নানা দেশে ছড়িয়ে' পড়ে। তাদের কয় দল ইউরোপে যায়, সেখানে রুষ, গ্রীস, ইতালী, জর্‌মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উপনিবিষ্ট হয়; এই-সব দেশের শ্লাব, গ্রীক, ইতালীয়, টিউটন, কেল্‌ট্‌ জাতির লোকেরা এই প্রাচীন আর্য্যদেরই বংশধর। একদল মধ্য-এশিয়া থেকে দক্ষিণে আসে, তারা পারস্যদেশে উপনিবিষ্ট হয়; আবার পারস্য থেকেই তাদের একদল আসে ভারতবর্ষে, এরাই হ'চ্ছে বেদ রচক ভারতীয় আর্য্য, এরাই ভারতীয় সভ্যতার মূল। বিজ্ঞান আর ইতিহাসের অন্য-অন্য বিচার আর মতের সঙ্গে এই মতবাদটীও যথাকালে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে এসে পৌছাল, আর ইংরেজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত ভারতীয়গণ বিশেষ প্রতিবাদ না ক'রে এই মতটী গ্রহণ করলে। ইউরোপে ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয় জাতির লেখা-পড়া-জানা লোকদের মধ্যে এই মতের প্রতিষ্ঠা সহজেই হ'য়েছিল। সংস্কৃত, প্রাচীন ঈরানী, আর্মানী—এশিয়া-খণ্ডের তিনটী সুসভ্য জাতির এই তিনটী প্রাচীন ভাষা; আর ইউরোপের প্রায় তাবৎ জাতির ভাষা—গ্রীক, লাতিন, প্রাচীন শ্লাব, আল্‌বানীয়, কেলটীয়, টিউটনীয়—এই সবগুলি, এক অধুনা-লুপ্ত মূল বা আদি আর্য্যভাষা থেকে উৎপন্ন;—তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ববিদ্যা এই তথ্যটী নির্ধারণ ক'রে দেয়, বিগত উনিশের শতকের প্রথমার্ধে। এক "আদি আর্য্য-ভাষা" যদি মেনে নেওয়া গেল, তা হ'লে এই আদি আর্য্যভাষা ব'ল্‌ত এমন এক "আদি আর্য্যজাতি"কেও মান্‌তে হয়, আর ব'ল্‌তে হয় যে প্রাচীনকালে কোথাও-না-কোথাও এই জাতি বাস ক'রৃত। যারা এখন বিভিন্ন আর্য্যভাষা বলে, আদি আর্য্যদের সেই বংশধরেরা আজকাল পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে সভ্য জাতি ব'লে পরিগণিত; আর হিন্দু, পারসীক, গ্রীক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন আর্য্যভাষী জাতিও সভ্যতায় খুব উঁচুতে ছিল। সুতরাং, আদি আর্য্যজাতির লোকেরাও যে সুসভ্য ছিল, এরূপ অনুমান ক'রৃতে আধুনিক আর্য্যদের বা আর্য্যম্মন্যদের আট্‌কাল' না। এই "আর্য্যবাদ" ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই গ'ড়ে তুললেন। তাঁরা দেখ্‌লেন, ইউরোপের আধুনিক আর্য্যভাষী জাতির লোকেরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে' প'ড়েছে—পোর্তুগীস, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী, জর্‌মান প্রভৃতি জাতির লোকেরা আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা, অস্‌ট্রেলিয়া, সর্বত্র ইউরোপের সভ্যতা নিয়ে'

গিয়েছে ; সহজেই তারা ঐসব দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে নিয়ে', স্থানীয় "নেটিভ" জাতিদের উপর আধিপত্য ক'র্ছে, তাদের সুসভ্য ক'রে তুল্ছে (এটা অবশ্য ইউরোপীয় তরফের কথা), এবং নিজেদের অসুবিধা হ'লে বা দরকার বোধ ক'র্লে তাদের সমূলে উচ্ছেদসাধনও ক'রেছে আর ক'র্ছে। History repeats itself —একই ইতিহাস বিভিন্ন কালে পুনরাবৃত্ত হয়,—এই অর্ধ-সত্য বচন কাজে লেগে গেল ; এখন আর্য্যভাষীদের দ্বারায় যা হ'চ্ছে, প্রাচীনকালে আর্য্যদের পূর্ব-পুরুষদের হাতে তা-ই হ'য়েছিল, এরূপ অনুমান করা হ'ল। আজকালকার আর্য্যদেরই মত, সুসভ্য শ্বেতকায় সুন্দরকান্তি প্রাচীন আর্য্যেরা তাদের পিতৃভূমি থেকে ছড়িয়ে' প'ড়ে, নানা অসভ্য বা অর্ধ-সভ্য জাতির দেশে গিয়ে, অবলীলাক্রমে তাদের জয় ক'রে, সভ্যতার আলোক দিয়ে তাদের মানুষ ক'রে তোলে,—আর প্রাকৃতিক আর অন্য কারণে গ্রীস, ইতালী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এরা নব-নব সভ্যতার সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষে এই ব্যাপার বিশেষভাবে ঘ'টেছিল। এদেশে কৃষ্ণকায় অসভ্য জঙ্গ্লী অনার্য্য বাস ক'র্ত ; আর্য্যেরা এল', তারা এদের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত জাতি, তারা যে অনার্য্যদের জয় ক'রে তাদের উপরে রাজা হ'য়ে ব'স্বে, এ তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, এরূপটী তো হওয়াই উচিত ; কতকগুলি অনার্য্য, আর্য্যদের বশ্যতা স্বীকার ক'রলে, তারা আর্য্যদের দাস হ'ল, আর্য্যদের সমাজে তাদের স্থান দেওয়া হ'ল, তাদের নাম দেওয়া হ'ল "শূদ্র"। বাকী সব, হয় আর্য্যদের হাতে ম'ল, নয় পাহাড়ে জঙ্গলে পালিয়ে' গেল—এদেরই বংশধর আজকালকার কোল-ভীল-সাঁওতাল-মুণ্ডা, গোঁড়-খন্দ-ওরাওঁ-মালের্, গারো-বোডো-কুকি-নাগা। ভারতবর্ষে বহু শত বৎসর পূর্বে যে সব আর্য্য মানুষ এসেছিল, তারা ইউরোপীয়দের পূর্ব-পুরুষদেরই জ্ঞাতি ; সুতরাং ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দু, যারা নিজেদের বিশুদ্ধ আর্য্য-বংশীয় ব'লে মনে ক'রে একটু গর্ব ক'রে থাকে, তারা হ'ল ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয়দেরই স্বগোত্রীয়—দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। কথাটা ভারতীয় উচ্চবর্ণের লোকেদের কাছে মন্দ লাগ্ল না (আর এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই তো প্রথমটা ইংরেজী প'ড়তে আরম্ভ ক'রেছিল)—রাজার জাতি ইংরেজ, তাদের সঙ্গে এক গোষ্ঠীর, একথা উচ্চবর্ণের হিন্দুর মনের নিভৃত কোণের মধ্যে একটু পুলকের ঝিলিক এনে দিয়েছিল ব'লেই মনে হয়,—তবে এ মনোভাবটী বাইরে স্পষ্ট ক'রে স্বীকার ক'রে জাতীয় আত্মসম্মান-বোধে আঘাত দিতে কেউ রাজী ছিলেন না। ইংরেজও এই সম্পর্ক এক রকম মেনে নিয়েই, ভারতের ব্রাহ্মণ আর উচ্চবর্ণের হিন্দুকে (আর তাদের অনুগামী নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকেও) our Aryan brother, the mild Hindu

ব'লে পিঠ চাপ্‌ড়াতে লাগ্‌ল; ইংরেজের তুচ্ছতাবোধ-মিশ্র এই উদারতায় আমাদের অনেকে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গেল।

নানা জাতির সংমিশ্রণের ফলে আমাদের হিন্দুজাতি; এই সংমিশ্রণ প্রাচীনকালে অতি সহজেই অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা ঘ'টেছিল। তারপরে তুর্কী-বিজয়ের পর থেকেই জাতিভেদের কড়াকড়ি এসে গেল, পুরোপুরি মিশাল আর হ'য়ে উঠল না। এর ফলে, হিন্দু জাতির বিভিন্ন সমাজের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য-বোধ র'য়ে গেল, কোথাও বা আবার নোতুন ক'রে এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ গ'ড়ে উঠ্‌ল; বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটী অবাধ অনুকম্পার অভাব নোতুন ক'রে ঘ'টল,—এই অবাধ অনুকম্পার অভাবটুকুই আধুনিক হিন্দু-সমাজের সব-চেয়ে বড়ো অভাব। এই স্বাতন্ত্র্য- বা পার্থক্য-বোধের ফলে, নিজেরা আর্য্য-সন্তান ব'লে দাবী করেন এমন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মনে একটা আভিজাত্য-বোধও সুদৃঢ় হয়; তাতে ইউরোপ থেকে আমদানী-করা অনার্য্য-জয়ী আর্য্যের কল্পনা আরও সহায়তা করে।

হিন্দু সভ্যতার পত্তনের ইতিহাসটী এইরূপে বেশ মনোমত ক'রে তৈরী হ'ল। কৃষ্ণকায় কুৎসিত-দর্শন অসভ্য বর্বর অনার্য্য জাতি, স্মরণাতীত যুগ থেকে এদেশে বাস ক'র্‌ত; তাদের ধর্ম ছিল অতি নিম্ন স্তরের, রীতিনীতি ছিল ক্রূর। গৌরবর্ণ সুসভ্য আর্য্যেরা এসে তাদের জয় ক'রলেন। আর্য্যদের হাতেই হিন্দু সভ্যতার পত্তন হ'ল; প্রথম যুগের আর্য্যদের দেবতাদের আরাধনা নিয়ে বেদ-সংহিতা, তাঁদেরই দেবতাদের কথা নিয়ে পরের যুগে রচিত পুরাণ; আর্য্যদের রাজবংশের ইতিকথা নিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ। অনার্য্যদের ধর্ম আর রীতি-নীতি একটা-আধটা গ্রাম্য অনুষ্ঠান বা আখ্যানের মধ্যে হয়তো কোথাও একটুখানি টি'কে রইল, কিন্তু মোটের উপরে তার সমস্ত নিশানা আর্য্য সভ্যতার প্লাবনের মুখে ধুয়ে' মুছে' গেল।

অনার্য্যদের সম্বন্ধে এখন ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ আর্য্য-ভাষী উত্তর-ভারতে—যে একটা জুগুপ্সার ভাব এসে গিয়েছে, "অনার্য্য" শব্দটীই তার জন্য কতকটা দায়ী। "অনার্য্য" শব্দ যদি খালি "অন্‌-আর্য্য" অর্থাৎ 'যা আর্য্য নয়, বা আর্য্য-জাতি-সম্পৃক্ত নয়' এই অর্থেই প্রযুক্ত হ'ত, তা হ'লে কথা ছিল না; কিন্তু "অনার্য্য" অর্থে 'ঘৃণ্য, নীচ', এই অর্থ সংস্কৃত-যুগ থেকেই এসে যাওয়ায়, শব্দটী জাতি-বাচক বা সভ্যতা-বাচক আর না থেকে, মানসিক ও নৈতিক অপকর্ষ-বাচক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেশময় সব জাতিই আর্য্যত্বের দাবী উপস্থিত ক'র্‌ছেন—তাঁরা দ্বিজ—হয় ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈশ্য, তাঁরা অনার্য্য শূদ্র নন। এটী আর

কিছুই নয়, আধুনিক জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। সকলেই দ্বিজ হোন্, "আর্য্য" হোন্ অর্থাৎ noble হোন্, নিজেদের উচ্চ মনে ক'রে যথার্থ উচ্চ হ'য়ে থাক্‌বার শক্তি লাভ করুন—আর্য্যানার্য্য সকলেরই জন্য আমি এ কামনা করি।

আর্য্যদের শ্রেষ্ঠতার বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন করাই আজকাল heresy বা পাষণ্ডোচিত মনোভাব-প্রসূত ব'লে অনেকে গণ্য ক'রবেন। আর্য্যেরা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যজাতি ছিলেন না—এ কথা বলা, বা এ কথার ইঙ্গিত করা, যেন পিতৃপুরুষের নিন্দা করার মতন অথবা স্বজাতিদ্রোহিতারূপ মহাপাতক, এই রকমের একটা আবছা-আবছা ধারণা অনেক ভারতীয়ের মনের মধ্যে এখনও আছে। তবে হিন্দুর মনে সত্যানুসন্ধিৎসা সদা-জাগ্রত। তিনটা মনোভাবকে আমি আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির মূল মনোভাব ব'লে মনে করি—সমন্বয়, সত্যানুসন্ধিৎসা, আর অহিংসা; সত্যানুসন্ধিৎসাই আমাদের জাতির অতীত ইতিহাসে যা কিছু আধ্যাত্মিক আর আধিমানসিক উৎকর্ষ এনে দিয়েছে, এখনও এই সত্যানুসন্ধিৎসা আমাদের একেবারে যায় নি। সুতরাং, এ-সব কথা শিক্ষিত হিন্দুর কাছে ব'ললে, প্রথমটা প্রচলিত সংস্কারে একটা আঘাত লাগ্‌লেও, জিনিসটিকে সাধারণ হিন্দু তলিয়ে' বুঝ্‌তে চায়—নোতুন আর সম্পূর্ণ অনপেক্ষিত মত ব'লে শেষ পর্য্যন্ত মুখ ফিরিয়ে' ব'সে থাক্‌তে চায় না, বা পারে না।

ভারতবর্ষে আর্য্যদের একাধিপত্যের স্বপক্ষে প্রবলতম যুক্তি হ'চ্ছে আর্য্যভাষা সংস্কৃতের স্থান,—সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র এই আর্য্যভাষা সংস্কৃত ভাষাতেই নিবদ্ধ হ'য়ে থাকা রূপ ব্যাপারটা; আর তার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর-ভারতে আর্য্যভাষার প্রসার। সংস্কৃত শাস্ত্রের—বেদের না হোক্ পুরাণের—মত অনুসারে আবার আমাদের ইতিহাস অনাদিকাল থেকে ধারাবাহিক রূপে চ'লে এসেছে—অন্ততঃ, অতি প্রাচীনকাল থেকে। এই ভাষাগত ও সাহিত্যগত যুক্তি দুইটা সবচেয়ে বেশী ক'রে আমাদের "আর্য্য-বাদ"-গ্রস্ত ক'রে রেখেছে।

এর প্রতিপক্ষে কয়টা যুক্তি আছে, সে কয়টা এই—দাক্ষিণাত্যে আর দক্ষিণ-ভারতে সুসভ্য অনার্য্য ভাষার অস্তিত্ব; সংস্কৃত-সমেত উত্তরভারতের আর্য্যভাষা-গুলির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান অনার্য্য ভাষার প্রভাব; খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেকার যুগের আর্য্যভাষী হিন্দুর সভ্যতার নিদর্শনের একান্ত অভাব; ভারতের বাইরে আর্য্যজাতির ইতিহাস; জগতের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের সংযোগ।

তমিল ভাষা তার বিরাট্ সাহিত্য নিয়ে দক্ষিণ-ভারতে বিদ্যমান,—এই ভাষা দ্রাবিড়দের স্বতন্ত্র সভ্যতার এক অনপনেয় নিদর্শন, যে সভ্যতা পুরাপুরি আর্য্য-সভ্যতার কাছে আত্ম-বলিদান দেয় নি। বৈদিক ভাষা ভারতের আর্য্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন—এই ভাষাতে প্রাচীন আর্য্য-ভাব অনেকটা বিদ্যমান; কিন্তু এই বৈদিক ভাষাতেও অনার্য্য ভাষার ছাপ কিছু পরিমাণে আছে; আর তা ছাড়া যতই এদিকে আসি, ততই অনার্য্য ভাষার প্রভাব আর্য্য ভাষায় (অর্থাৎ অর্বাচীন সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে) বাড়্ছে দেখতে পাই; আর্য্যভাষাকে যে ক্রমে-ক্রমে অনার্য্য ভাষার, কোল-দ্রাবিড়ের ছাঁচে ঢেলে নেওয়া হ'য়েছে, আর্য্য ভাষা ক্রমে যে অনার্য্যেরই ঘরে জা'ত দিয়ে ব'স্ছে—তা বুঝ্তে দেরী হয় না। এ ছাড়া, রামায়ণ, মহাভারতের আর পুরাণের মধ্যে বড়ো-বড়ো রাজা-রাজড়ার নাম আমরা পাই; কিন্তু আমাদের অনুমিত রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের যুগের, অর্থাৎ তিন-চার পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বেকার হিন্দু যুগের, পুরাতন ঘর-বাড়ী, হাতের কাজ, শিল্পের নিদর্শন—এ-সব কিছুই তো পাই না; মাত্র হাজার দুই বছরের প্রাচীন এই "ইতিহাস" অর্থাৎ মহাকাব্য আর পুরাণ গ্রন্থগুলিই আমাদের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের একমাত্র অবলম্বন;—এই সাহিত্যিক অবলম্বন ভিন্ন, "পাথুরে' প্রমাণ" কিছুই নেই। মৌর্য্য যুগের আগেকার হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন তা হ'লে কিছুই কি নেই? মিসর, বাবিলোন, আসিরিয়া, এশিয়া-মাইনর, ক্রীট-দ্বীপ—এ-সব জায়গায় তো এখন থেকে তিন-চার-পাঁচ হাজার বছরেরও জিনিস পাওয়া গিয়েছে; ভারতবর্ষে মোহন-জো দড়ো আর হড়প্পায় যে-সব নগরের ধ্বংসাবশেষ আর অন্য জিনিস মিলেছে, সেগুলি অবশ্য ৪।৫ হাজার বছর পূর্ব্বেকার, কিন্তু সেগুলি তো আর্য্য জাতির লোকেদের হাতের কাজ নয়—অন্ততঃ ঐ বিষয় নিয়ে যাঁরা আলোচনা ক'রেছেন এমন পণ্ডিতেরা এই কথাই ব'লছেন। এর উপর আছে—ভারতের বাইরে আর্য্যজাতির ইতিহাসের কথা। আর্য্যেরা তাদের আদি বাস-ভূমি থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ অন্য পাঁচটী জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে বা মিলনে) কখন প্রথম দেখা দিলে, তারও একটী হদিস পাওয়া যা'চ্ছে,—সেটা এখন থেকে মাত্র চার হাজার বছর পূর্ব্বে; তখন গ্রীসে ও উত্তর-পূর্ব এশিয়া-মাইনরে তাদের প্রথম দর্শন পাওয়া যায়; এর ঢের পরে তারা ভারতবর্ষে আসে—ভারতবর্ষ থেকে যে তারা বাইরে গিয়েছিল, এরূপ অনুমানের স্বপক্ষে বড়ো একটা যুক্তি নেই। শেষ কথা—ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অন্য দেশের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্লে চ'ল্বে না। প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষ পারস্য-বাবিলোন ও এশিয়া-মাইনর অঞ্চলের

সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিল, সে যোগসূত্র আমাদের ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নির্ধারণের একটী প্রধান অবলম্বন। সেটীকে বাদ দেওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। গ্রীস প্রভৃতি অন্যান্য নানা দেশে বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতি আর বিভিন্ন জাতির লোকের মিশ্রণে, কি ভাবে নবীন এক-একটী জাতি ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হ'য়েছিল,—আমাদের হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির সৃষ্টি আলোচনার কালে সেদিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ্‌তে হবে।

কি ভাবে হিন্দু সভ্যতার পত্তন ঘ'টেছিল, আর পূর্ণরূপ-প্রাপ্ত হিন্দু-সভ্যতার বয়সই বা কত, এ সম্বন্ধে যে মতবাদ আমার মনে হয় একটু-একটু ক'রে সাধারণ্যে গৃহীত হ'য়েছে আর হ'চ্ছে, উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই মতবাদের কিছু দিগ্‌দর্শন করবার চেষ্টা ক'র্‌বো। বিষয়টী a posteriori হিসাবে অর্থাৎ জ্ঞাত তথ্যের আধারের উপর অনুমান ক'রে না ব'লে, a priori অর্থাৎ ইতিহাসাত্মক ক'রে, পৌর্বাপর্য্য অনুসারে পুনর্গঠিত রূপের বর্ণনা ক'রে, ব'লে যাবো। পরে ভবিষ্যতে এক-একটী বিষয় অবলম্বন ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে।

এখন থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে,খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৩০০০-এর দিকে, মধ্য-বা পূর্ব-ইউরোপের কোনও অংশে, অথবা রুষ দেশে উরাল-পর্বতমালার দক্ষিণের সমতল ভূভাগে, আদি Indo-European ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্যজাতির উৎপত্তি হয়। নিজেদের দেশে সভ্যতায় এরা খুব উচ্চ স্তরে উঠ্‌তে পারে নি—বাস্তব সভ্যতায় এরা অনেকটা পেছিয়েই ছিল। তবে এদের মধ্যে অনেক মানসিক আর নৈতিক গুণের উদ্ভব হয়; এরা একাধারে কর্মী ও চিন্তাশীল, কল্পনাশীল ও দৃঢ়ব্রত জাতি ছিল, নিজেদের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধতার ভাবও যথেষ্ট ছিল; আর, অনুমান হয়, এদের মধ্যে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে যে কতগুলি ধারণা ছিল, সেগুলির আধারের উপরই স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য মনোভাব প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যজাতির মধ্যে বহু গোত্র ছিল, আর এই-সব গোত্রের মধ্যে এদের মূল-ভাষারও কিছু-কিছু পার্থক্য এসে যায়। এই আদি আর্য্য জাতি কোনও কারণে তাদের পিতৃভূমি থেকে পূবে, দক্ষিণে আর পশ্চিমে ছড়িয়ে' পড়তে বাধ্য হয়। দেশে শীতের হঠাৎ আতিশয্য এর একটী কারণ হ'তে পারে; আবার পূর্ব আর উত্তর থেকে অনার্য্য উরাল-আল্‌তাই জাতীয় লোকেদের চাপ বা আক্রমণও একটী প্রধান কারণ হ'তে পারে।

আর্য্যেরা যখন ৩০০০ খ্রীঃ-পূঃ-তে তাদের নিজেদের দেশে আদিম অবস্থায় আছে,—কিছু চাষবাস, কিছু মেষ-চারণ, এই তাদের প্রধান বৃত্তি—তখন কিন্তু জগতের অন্যত্র কতকগুলি বড়ো-বড়ো সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে; প্রথম—মিসরের

সভ্যতা ; খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ থেকে যার জের টানতে হয়, আর যার মূল পত্তন আরও প্রাচীন ; বাবিলোন আর আসিরিয়ার সভ্যতা,—প্রায় মিসরের মতই প্রাচীন ; আর এ ছাড়া, এশিয়া-মাইনর আর আর্য্য-পূর্ব গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতা। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বড়ো-বড়ো ইমারত, দেবমন্দির, ভাস্কর্য্য, মূর্তিশিল্প, শিলালেখ, মৃন্ময়লেখ, আর যুদ্ধবিগ্রহ, বিজয়বার্তা, প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে এই সভ্যতা ; আদি আর্য্যদের এসব কিছুই ছিল না। মিসর ও মেসোপোতামিয়ার লোকেরা গাধা ও গোরুকে প্রথম পোষ মানায়, আর অনেকে অনুমান করেন, গো-পালন মেসোপোতামিয়া থেকে উত্তরে আদিম-আর্য্যদের মধ্যে প্রসৃত হয়—গোরুর জন্য আদিম আর্য্য শব্দটী, সংস্কৃত "গৌ, গো" যা থেকে হ'য়েছে, সেটী মূলে মেসোপোতামিয়ার সুমের-জাতির ভাষার শব্দ। এরা কিন্তু প্রথমে ঘোড়ার কথা জানত না। ঘোড়া রুষ-দেশের বন্য পশু ছিল। আর্য্যেরা আগেই ঘোড়ার সংস্পর্শে আসে, আর এই ভাবে তারা নিজেদের দেশে থাকতে-থাকতে একটী বড়ো অস্ত্র সংগ্রহ করে—তারা ঘোড়াকে পোষ মানায়। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হ'য়ে বা দুই ঘোড়ায় টানা দু'চাকার রথে চ'ড়ে, তারা দূরপথ অল্পদিনে অতিক্রম করার একটা উপায় আবিষ্কার ক'রলে। এই আবিষ্কারের ফলে, যখন তারা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রথম এসে অবতীর্ণ হ'ল, তখন সুসংবদ্ধ, আত্মবোধ-যুক্ত, কর্মশক্তি ও ভাবনাশক্তিতে বলীয়ান্ এই আর্য্যদের—এরা পার্থিব সভ্যতায় অর্ধ-বর্বর হ'লেও—এদের রোধ করা সুসভ্য মিসর, আসিরীয়-বাবিল, এশিয়া-মাইনর আর গ্রীসের অধিবাসীদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়া'ল।

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ২০০০-এর দিকে এই আর্য্যজাতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজেদের পিতৃভূমির বাইরে অন্য জাতির দেশে প্রথম দেখা দিলে। এদের আগমনের সংবাদ আমরা প্রাচীন গ্রীসে, প্রাচীন এশিয়া-মাইনরে ও আসিরিয়া-বাবিলোনিয়াতে পাই। তখন ভারতবর্ষের অবস্থা কি ছিল জানি না ; খুব সম্ভব তখন দ্রাবিড়-জাতীয় আর বা Austric অস্ট্রিক কোন জাতীয় লোকেরা, উত্তর-ভারতে গঙ্গা আর সিন্ধু প্লাবিত দেশে, আর দক্ষিণ-ভারতে, তাদের সভ্যতা কায়েম ক'রে শান্তভাবে জীবন যাপন ক'রছে। আর্য্যেরা নিজ পিতৃ-ভূমিতে ইতিমধ্যেই কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হ'য়ে প'ড়েছে, এদের ভাষায় সামান্য পার্থক্য এসে গিয়েছে। গ্রীসে যে আর্য্যেরা যায় আর গ্রীসের আর্য্য-পূর্ব যুগের সুসভ্য জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে যারা আসে, সেই পশ্চিমা আর্য্যদের ভাষা,—আর যে আর্য্যেরা খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে উত্তর-পূর্ব এশিয়া-মাইনরে আর মেসোপোতামিয়ায় আসে, সেই পূবে' আর্য্যদের ভাষায়,

কতকগুলি লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়।

নানা কারণে আর্য্যদের প্রাচীন কথার ইতিহাস-সম্পর্কে মধ্য-এশিয়াকে আমাদের এখন ছেড়ে দিতে হ'চ্ছে। ভারতবর্ষে আস্‌বার পথে আর্য্যেরা উত্তর-মেসোপোতামিয়া হ'য়ে আসে, এই রকম আভাস আমরা পাচ্ছি; মধ্য-এশিয়ার কথা একটা নিছক কল্পনা মাত্র। সুতরাং মেসোপোতামিয়া সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়ায়, এই পূর্ব-কল্পনা এখন বর্জনীয়। উত্তর-মেসোপোতামিয়াতে আর্য্যেরা প্রথম দেখা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, ঐ স্থানের অধিবাসীরা তাদের সম্বন্ধে লিখে গিয়েছে। এই-সব লেখা পাওয়া গিয়েছে, আরও যাচ্ছে। আর্য্যদের সম্বন্ধে বাবিলোনীয় আর এশিয়া-মাইনরের প্রাচীন ভাষায় লেখা এই-সব কথা হ'চ্ছে আর্য্যদের বিষয়ে সব চাইতে প্রাচীন সামসময়িক উল্লেখ। এই-সব লেখা দেখে এই অনুমান হয় যে, সুসভ্য আসিরীয়, বাবিলোনীয় আর এশিয়া-মাইনরের জাতিগুলির মধ্যে, হয় উত্তর থেকে ককেসস্‌-পর্বত পেরিয়ে', নয় উত্তর-গ্রীসে মাসিডন ও থ্রেস প্রদেশ হ'য়ে কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে উত্তর এশিয়া-মাইনরের পথ ধ'রে, এশিয়া-মাইনর আর মেসোপোতামিয়া অঞ্চলে এদের আগমন ঘটে। এই নবাগত আর্য্যেরা দলে দলে আসে; এদের কতকগুলি গোত্র ঐ-সব অঞ্চলে বস-বাস কর্‌তে থাকে, স্থানীয় জাতিগুলির মাঝে নিজেদের একটা গৌরবময় স্থান ক'রে নিতে এরা সমর্থ হয়, কোথাও-কোথাও বা স্থানীয় লোকেদের জয় ক'রে তাদের রাজা হ'য়ে বসে—এমন কি, এদের একদল বাবিলোন দখল ক'রে সেখানে কয়েক শতাব্দী ধ'রে রাজত্ব বা প্রভুত্ব করে। আর্য্যদের যে-সব দল ওদেশে র'য়ে গেল, তারা ক্রমে ঐ দেশের লোকেদের সঙ্গে মিশে' গিয়ে, তাদের ভাষা নিয়ে, নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে' ফেল্‌লে। কিন্তু তাদের রাজাদের বা প্রধানদের নাম, তাদের দেবতাদের নাম, তাদের ভাষার দুই-চারটে শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে; তা থেকে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৮০০ থেকে ১২০০ পর্য্যন্ত মেসোপোতামিয়া-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট এই সকল আর্য্যদের কথা কিছু-কিছু জান্‌তে পারা যায়। এই আর্য্যেরাই এই অঞ্চলে প্রথম ঘোড়া আনে। এরা যে ভাষা ব'ল্‌ত, সে ভাষা হ'চ্ছে বৈদিক সংস্কৃত আর প্রাচীন ঈরানীয়, এই দুইয়ের জননী; আর এদের যে ধর্ম ছিল আর যে-সব দেবতার পূজা এরা ক'র্‌ত, তা থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে এদের ধর্ম আর দেবলোকই ভারতে গিয়ে বৈদিক ধর্ম আর বৈদিক দেবলোকে পরিণত হয়। এরা ছিল সত্যকার বেদ-পূর্ব আর্য্য; ভারতীয় বৈদিক ধর্মের পত্তন এদের মধ্যে, আর এদের অন্য অন্য যে সব গোত্র পূর্বে ঈরানের দিকে এল', তাদের মধ্যে ঘ'টতে থাকে। আর এটাও খুব সম্ভব যে মেসোপোতামিয়াতে

আর ঈরানে এই আর্য্যদের মধ্যে, নিজেদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে-সব স্তোত্র এরা রচনা ক'রতে থাকে, সেই-সব স্তোত্রের কিছু-কিছু ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছে—খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৮০০ কি ১৫০০তে রচিত এই-সব স্তোত্র, ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১০০০ কি ৯০০-র দিকে লিখিত হ'য়ে, "ব্যাস" নামক ঋষির দ্বারা বেদ-সংহিতায় সংগৃহীত হয়। বেদ-পূর্ব যুগের এই সমস্ত আর্য্যদের কতকগুলি নাম আর শব্দের নিদর্শন নীচে দেওয়া যাচ্ছে। নামগুলি বাবিলোনীয় ও এশিয়া-মাইনরের ভাষায় গৃহীত, এগুলির যথাযথ উচ্চারণ বিদেশীয় বাবিল ও কানিসী ভাষায় ঠিক-মত রক্ষিত হ'তে পারে নি—এগুলির হিন্দু-ঈরানীয় যুগের আর্য্যভাষার তথা বৈদিক ভাষার অনুমোদিত রূপ বা পাঠ অনেকটা বিচার আর অনুমান ক'রে ঠিক ক'রতে হ'য়েছে। দেবতাদের নাম, যথা—[১] Shuriash—বেদ-পূর্বীয় আর্য্য ভাষায় Surias, বৈদিক "সূর্য্যঃ"; [২] Maruttash—বেদ-পূর্ব Marutas, বৈদিক "মরুতঃ"; [৩] Shimalia, "উজ্জ্বল (অর্থাৎ তুষার-ধবল) পর্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবী" = বেদ-পূর্বীয় *Z'himala-, বৈদিক "হিম+আল"; [৪] Shugamuna "মহামারীর দেবতা, জ্যোতির দেবতা" = বেদ-পূর্বীয় *S'auka-manas, বৈদিক "শোক+মনস্"; ([৩] ও [৪] সংখ্যক দেবতাদ্বয় ভারতবর্ষে বৈদিক জগতে আর প্রতিষ্ঠিত রইলেন না); [৫] Dakash "নক্ষত্রদের পিতা" = ভারতীয় Daksha "দক্ষ", ২৭ নক্ষত্রের পিতা; [৬] Indara = বৈদিক "ইন্দ্র" ("ইন্দর"—স্বরভক্তি-যুক্ত রূপ); [৭] Mitra = বৈদিক "মিত্র"; [৮] Nashattiya = বৈদিক "নাসত্য"; [৯] Uruwna বা Aruna = বৈদিক "বরুণ"; রাজা বা প্রধানদের নাম, যথা—[১] Abirattash = বৈদিক রূপ "অভিরথঃ"; [২] Shuzigash = বৈদিক রূপ "সুজিগঃ"; [৩] Arta-manya = বেদ-পূর্ব *Rta-manyas, বৈদিক "ঋতমন্যুঃ"; [৪] Arzawiya = বৈদিক "আর্জব্য"; [৫] Biriamaza = বৈদিক "বীর্য্যবাজ"; [৬] Biri-daswa = বৈদিক "বৃদ্ধাশ্ব"; [৭] Dashru = সম্ভাব্য বৈদিক "দশ্রু" অথবা "দস্র"; [৮] Aitagama = বেদ-পূর্ব *Aitagama, বৈদিক "এতগাম"; [৯] Indaruta = বেদপূর্ব* Indarauta, Indrauta, বৈদিক "ইন্দ্রোত"; [১০] Namyawaza = সম্ভাব্য বৈদিক "*নাম্যবাজ"; [১১] Rushmanya = সম্ভাব্য বৈদিক "*রুচিমন্য"; [১২] Shatiya = বৈদিক "সত্য"; [১৩] Shubandu = বৈদিক "সুবন্ধু"; [১৪] Shumitta, Shumittarash = বৈদিক "সুমিত্রঃ"; [১৫] Shutarna = সম্ভাব্য বৈদিক "*সুধর্ণ" বা "সুধর্ণি"; [১৬] Shutatna = বৈদিক "সুত (বা সৃত) তন"; [১৭] Shuwardata = বৈদিক (সম্ভাব্য) "*সুবর্দাত",

স্বর্দত্ত" ; [১৮] Teuwatti = সম্ভাব্য বৈদিক "*স্তবাস্ত" ; [১৯] Turbazu = সংস্কৃত "তুর্বস্থ", বৈদিক "তুর্বশ" ; [২০] Tushratta = বেদ-পূর্ব *Duzhratha, বৈদিক "দূরথ" ; [২১] Artashumara = বৈদিক "ঋতস্মর" ; [২২] Artatama = বৈদিক "ঋতধাম" ; [২৩] Dasharti = সম্ভাব্য বৈদিক "*দাসর্তি" [২৪] Matti-waza = সম্ভাব্য বৈদিক "*মথিবাজ" ; [২৫] Saushshatar = "সৌক্ষত্র" ; ইত্যাদি। আর্য শব্দ যথা—[১] Maria = বৈদিক "মর্য", যোদ্ধা ; [২] Aika = প্রাগ্‌বৈদিক *Aika, বৈদিক "এক" ; [ ] Tera = "ত্রি, ত্রয়" ; [৪] Panza = "পঞ্চ" ; [৫] Satta = "সপ্ত" ; [৬] Nava = "নব ; [৭] Tapashash = "তপস্" ; [৮] Wartanna = "বর্তন" ; [৯] Wasanna = "বসন" (অবস্থান-অর্থে) ; ইত্যাদি। (এই নাম ও শব্দগুলি Acta Orientalia XI, i, ii, iii, খণ্ডে প্রকাশিত N. D. Mironov কর্তৃক লিখিত Aryan Vestiges in the Near East of the 2nd Millenary B C. নামক মূল্যবান্ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া ; Mironov-সংগৃহীত যে-সকল নাম বা শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে, সেগুলি এখানে দেওয়া হ'ল না)। এই রূপ বৈদিক ভাষার সাক্ষাৎ জননী-স্থানীয় ভাষা ব্যবহার ক'রৃত এমন আর্যদের আমরা আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব বৎসরে ও তার পরেও মেসোপোতামিয়া ও এশিয়া-মাইনরে দেখ্‌তে পাই।

আর্যেরা এই দেশে অবস্থান কালে সুসভ্য Ashur অশুর বা অসুর অর্থাৎ আসিরীয় এবং বাবিলোনীয় জাতির প্রভাবে পড়ে। আসিরীয়-বাবিলোনীয় জাতির বিরাট্ বিরাট্ ইমারত, আর এদের (বিশেষতঃ আসিরীয়গণের) শৌর্য ও নিষ্ঠুরতা আর্যদের অভিভূত করে। আর্যদের মধ্যে আসিরীয় রীতি-নীতিও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যন্ত্র-শিল্পে ও গৃহ-নির্মাণে দক্ষ, দেবতা-বিরোধী অসুর বা দানবের কল্পনাতে, ভারতে আস্‌বার পরে আর্যজাতির মনের মধ্যে নিহিত অসুরজাতির স্মৃতির পরিণতি ঘটে।

যে-সকল আর্য গোত্র মেসোপোতামিয়ায় বাস ক'রলে না, পূবের দিকে এল', তারাই হ'ল ঈরানীয় ও ভারতীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষ। পর্শু বা পার্শ্ব বা পার্স, মদ, শক, পার্থব প্রভৃতি আর্য গোত্রগণ পারস্য-দেশেই র'য়ে গেল ; ভরত, কুরু, মদ্র, শিবি, দ্রুহ্য, ত্রিৎসু, পুরু, ভৃগু প্রভৃতি নানা গোত্র ভারতে প্রবেশ ক'রলে। মনে হয়, ভারত আর ঈরানে, অন্ততঃ পূর্ব-ঈরানে, তখন একই অনার্যজাতির লোকেরা বাস ক'রত ; আর্যেরা এদেরই "দাস" বা "দস্যু" ব'লে উল্লেখ ক'রে গিয়েছে।

"দাস" বা "দস্যু"দের সঙ্গে ভারতের বাইরেই আর্য্যদের সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষের কথা কিছু-কিছু বৈদিক সাহিত্যে—ঋগ্‌বেদে—পাওয়া যায়। তার পরে ক্রমে এই অনার্য্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বময় মিলনও ঘ'ট্‌তে থাকে। অনুমান হয় আর্য্যদের আস্‌বার সময়ে ভারতবর্ষে প্রধানতঃ তিনটী জাতির অনার্য্য বাস ক'রত। [১] Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু শ্রেণীর অনার্য্য—খাটো চেহারা, রঙ্‌ ঘোর কালো, চেপ্‌টা নাক, পুরু ঠোঁট, চুল কোঁকড়ানো—এরা বেশীর ভাগ সামুদ্রিক উপকূল-অঞ্চলে বাস ক'র্‌ত, সভ্যতা ব'ল্‌তে এদের বিশেষ কিছুই ছিল না, মাছ ধ'রে বা শিকার ক'রে খেত—এই জাতি এখন প্রায় সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, দক্ষিণ-বেলুচিস্থানে, দক্ষিণ-ভারতে, আসাম-অঞ্চলে কোথাও-কোথাও এদের একটু-আধটু অবশেষ বা চিহ্ন বিদ্যমান; খুব সম্ভব এরাই ছিল ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী। [২] Austric অস্‌ট্রিক জাতি—একটী মত অনুসারে এরা উত্তর-পূর্ব পথ দিয়ে—আসাম-অঞ্চল দিয়ে—বর্মা আর ইন্দোচীন থেকে ভারতে প্রবেশ করে; অন্য মতে, এদের আদি বাস ছিল পশ্চিম-এশিয়ায়, সম্ভবতঃ এশিয়া-মাইনরে, ভারতবর্ষে এসেই এরা বিশিষ্টতা পায়। এদের চেহারা কি রকম ছিল তা ঠিক জানা যায় না—মনে হয়, আকারে এরা খাটো ছিল, নাক এদের চেপ্‌টা হ'ত—আর এরা যা ভাষা ব'লত, সেই ভাষা থেকে এখনকার কোল ভাষা আর খাসিয়া ভাষা হ'য়েছে, আর এদের অন্য শাখা ইন্দোচীনে, মালয় দেশে, দ্বীপময় ভারতের দ্বীপপুঞ্জে আর প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে ছড়িয়ে প'ড়েছে। গঙ্গার উপত্যকায়, আর মধ্য আর দক্ষিণ-ভারতে এরা বেশী ক'রে ছড়িয়ে প'ড়েছিল, হিমালয়-অঞ্চলেও যে এরা ছিল তার প্রমাণ আছে। ধানের চাষ, পান-সুপারীর ব্যবহার,—ভারতীয় সভ্যতায় এগুলি অস্‌ট্রিক জাতির দান ব'লে মনে হয়; আর তা ছাড়া, এদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান, আমাদের হিন্দু পূজা-পদ্ধতিতে ও বিবাহের আর শ্রাদ্ধের নানা অনুষ্ঠানে, আর হিন্দুর পুনর্জন্ম-বাদের অন্তরালে অবস্থান ক'রছে ব'লে অনুমান হয়। অস্‌ট্রিক-ভাষী জনগণ উত্তর-ভারতের সমতল অংশে এখন হিন্দু জনসাধারণে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়ে, তাদের পৃথক্‌ অস্‌ট্রিক অস্তিত্ব বর্জন ক'রেছে। [৩] দ্রাবিড় জাতি; এই দ্রাবিড় জাতি দীর্ঘকায়, সরল-নাসিক ও দীর্ঘ-করোটি ছিল ব'লে অনুমান হয়। ভারতের পশ্চিমের দেশের লোকেদের সঙ্গে এদের সংযোগ বা সম্বন্ধ ছিল। আর্য্যেরা ভারতে আসবার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে, পশ্চিম থেকে এদের ভারতে প্রবেশ ঘটেছিল ব'লে অনুমান হয়। পশ্চিম-ভারতে আর দাক্ষিণাত্যে এদের প্রচুর বাস ছিল; তবে অনুমান হয়, এরা

উত্তর-ভারতে আর পূর্ব-ভারতেও প্রসার লাভ করেছিল, অস্ট্রিক জাতের সঙ্গে মিলে একত্র বাস ক'রত। অস্ট্রিক (কোল) আর দ্রাবিড়, এই দুই জাতির খুব মিলন আর মিশ্রণও ঘটেছিল ব'লে বোধ হয়। দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিল; বড়ো-বড়ো বাড়ী-ঘর নগর প্রভৃতি বানা'ত,—হিন্দু সভ্যতার বাহ্য অনেক উপকরণ এই দ্রাবিড়দেরই কাছ থেকে আহৃত; শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনা ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগ-সাধনার মূল তত্ত্বও দ্রাবিড়দের মধ্যেই উদ্ভূত হয় ব'লে মনে হয়। মোহেন-জো-দড়ো আর হড়প্পার বিরাট্ সভ্যতা দ্রাবিড় জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক ব'লে বোধ হয়। দ্রাবিড়েরা আর্য্যদের মত গো-পালন ক'রত—কোল (অস্ট্রিক) জাতি তা ক'রত না; তবে অস্ট্রিকেরাই হাতীকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল ব'লে মনে হয়।

এই তিনটী জাতি অথবা বিভিন্ন তিন প্রকার ভাষা ও সংস্কৃতি-যুক্ত জনগণ ব্যতীত, আরও একটী জাতির ভারতে আগমনের কথা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন—Proto australoid নামে অভিহিত একটী আদিম জাতি, এরা নেগ্রিটোদের পরেই এসেছিল, সম্ভবতঃ পশ্চিম থেকে, কিন্তু এদের ভাষার কোনও নিদর্শন ভারতবর্ষে নেই। এ ছাড়া, সম্প্রতি Hevesy Vilmos (বা William Hevesy) নামে এক হঙ্গেরীয় পণ্ডিত, কোলেদের সঙ্গে Finno-Ugrian ফিন্নোউগ্রীয় জাতির (রুষদেশ, সাইবিরিয়া ও উত্তর-ইউরোপ যাদের আদিম বাসভূমি তাদের) সংযোগ ছিল ব'লে মত প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু এ মত এখনও বিচারাধীন।

আর্য্যেরা ভারতে যখন প্রথম এল', দেশে সুসভ্য (অথবা মোটামুটি সভ্যতা-প্রাপ্ত) এই দুইটী বড়ো অনার্য্য জাতি বাস ক'রত। নাগরিক সভ্যতার উন্মেষ দ্রাবিড়দের মধ্যেই হয়; অস্ট্রিক জাতির সভ্যতা ছিল মুখ্যতঃ গ্রামীণ সভ্যতা; আর নবাগত আর্য্যদের সভ্যতা ছিল মুখ্যতঃ যাযাবর ও অংশতঃ গ্রামীণ সভ্যতা। আর্য্যদের আগমনে দেশের আদিম অনার্য্য অধিবাসীদের একেবারে সমূলে উচ্ছেদ হ'ল না। নবাগত আর্য্য আর পুরাতন অনার্য্য পাশাপাশি বাস ক'রতে লাগ্‌ল। আর্য্য, দ্রাবিড়, কোল (অস্ট্রিক)—এই তিন জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান আর রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে লাগ্‌ল। আর্য্য ছিল বিজেতা—অন্ততঃ পাঞ্জাব-অঞ্চলে বিজেতৃরূপেই তার প্রবেশ হ'য়েছিল; তার ভাষা ছিল খুব জোরের ভাষা, আর তার সংঘ-শক্তিও ছিল অসাধারণ। আর্য্যের ভাষা তাই সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রলে; হয়তো তখনকার দিনের দ্রাবিড় আর কোল

"দাস" বা "দস্যু"দের সঙ্গে ভারতের বাইরেই আর্য্যদের সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষের কথা কিছু-কিছু বৈদিক সাহিত্যে—ঋগ্‌বেদে—পাওয়া যায়। তার পরে ক্রমে এই অনার্য্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বময় মিলনও ঘ'ট্‌তে থাকে। অনুমান হয় আর্য্যদের আস্‌বার সময়ে ভারতবর্ষে প্রধানতঃ তিনটী জাতির অনার্য্য বাস ক'রত। [১] Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু শ্রেণীর অনার্য্য—খাটো চেহারা, রঙ্‌ ঘোর কালো, চেপ্‌টা নাক, পুরু ঠোঁট, চুল কোঁকড়ানো—এরা বেশীর ভাগ সামুদ্রিক উপকূল-অঞ্চলে বাস ক'রত, সভ্যতা ব'ল্‌তে এদের বিশেষ কিছুই ছিল না, মাছ ধ'রে বা শিকার ক'রে খেত—এই জাতি এখন প্রায় সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, দক্ষিণ-বেলুচিস্থানে, দক্ষিণ-ভারতে, আসাম-অঞ্চলে কোথাও-কোথাও এদের একটু-আধটু অবশেষ বা চিহ্ন বিদ্যমান; খুব সম্ভব এরাই ছিল ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী। [২] Austric অস্ট্রিক জাতি—একটী মত অনুসারে এরা উত্তর-পূর্ব পথ দিয়ে—আসাম-অঞ্চল দিয়ে—বর্মা আর ইন্দোচীন থেকে ভারতে প্রবেশ করে; অন্য মতে, এদের আদি বাস ছিল পশ্চিম-এশিয়ায়, সম্ভবতঃ এশিয়া-মাইনরে, ভারতবর্ষে এসেই এরা বিশিষ্টতা পায়। এদের চেহারা কি রকম ছিল তা ঠিক জানা যায় না—মনে হয়, আকারে এরা খাটো ছিল, নাক এদের চেপ্‌টা হ'ত—আর এরা যা ভাষা ব'লত, সেই ভাষা থেকে এখনকার কোল ভাষা আর খাসিয়া ভাষা হ'য়েছে, আর এদের অন্য শাখা ইন্দোচীনে, মালয় দেশে, দ্বীপময় ভারতের দ্বীপপুঞ্জে আর প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে ছড়িয়ে প'ড়েছে। গঙ্গার উপত্যকায়, আর মধ্য আর দক্ষিণ-ভারতে এরা বেশী ক'রে ছড়িয়ে প'ড়েছিল, হিমালয়-অঞ্চলেও যে এরা ছিল তার প্রমাণ আছে। ধানের চাষ, পান-সুপারীর ব্যবহার,—ভারতীয় সভ্যতায় এগুলি অস্ট্রিক জাতির দান ব'লে মনে হয়; আর তা ছাড়া, এদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান, আমাদের হিন্দু পূজা-পদ্ধতিতে ও বিবাহের আর শ্রাদ্ধের নানা অনুষ্ঠানে, আর হিন্দুর পুনর্জন্ম-বাদের অন্তরালে অবস্থান ক'রছে ব'লে অনুমান হয়। অস্ট্রিক-ভাষী জনগণ উত্তর-ভারতের সমতল অংশে এখন হিন্দু জনসাধারণে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়ে, তাদের পৃথক্ অস্ট্রিক অস্তিত্ব বর্জন ক'রেছে। [৩] দ্রাবিড় জাতি; এই দ্রাবিড় জাতি দীর্ঘকায়, সরল-নাসিক ও দীর্ঘ-করোটি ছিল ব'লে অনুমান হয়। ভারতের পশ্চিমের দেশের লোকেদের সঙ্গে এদের সংযোগ বা সম্বন্ধ ছিল। আর্য্যেরা ভারতে আসবার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে, পশ্চিম থেকে এদের ভারতে প্রবেশ ঘটেছিল ব'লে অনুমান হয়। পশ্চিম-ভারতে আর দাক্ষিণাত্যে এদের প্রচুর বাস ছিল; তবে অনুমান হয়, এরা

উত্তর-ভারতে আর পূর্ব-ভারতেও প্রসার লাভ করেছিল, অস্ট্রিক জাতের সঙ্গে মিলে একত্র বাস ক'রত। অস্ট্রিক (কোল) আর দ্রাবিড়, এই দুই জাতির খুব মিলন আর মিশ্রণও ঘটেছিল ব'লে বোধ হয়। দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিল; বড়ো-বড়ো বাড়ী-ঘর নগর প্রভৃতি বানা'ত,—হিন্দু সভ্যতার বাহ্য অনেক উপকরণ এই দ্রাবিড়দেরই কাছ থেকে আহৃত; শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনা ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগ-সাধনার মূল তত্ত্বও দ্রাবিড়দের মধ্যেই উদ্ভূত হয় ব'লে মনে হয়। মোহেন-জো-দড়ো আর হড়প্পার বিরাট্ সভ্যতা দ্রাবিড় জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক ব'লে বোধ হয়। দ্রাবিড়েরা আর্য্যদের মত গো-পালন ক'রত—কোল (অস্ট্রিক) জাতি তা ক'রত না; তবে অস্ট্রিকেরাই হাতীকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল ব'লে মনে হয়।

এই তিনটী জাতি অথবা বিভিন্ন তিন প্রকার ভাষা ও সংস্কৃতি-যুক্ত জনগণ ব্যতীত, আরও একটী জাতির ভারতে আগমনের কথা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন—Proto australoid নামে অভিহিত একটী আদিম জাতি, এরা নেগ্রিটোদের পরেই এসেছিল, সম্ভবতঃ পশ্চিম থেকে, কিন্তু এদের ভাষার কোনও নিদর্শন ভারতবর্ষে নেই। এ ছাড়া, সম্প্রতি Hevesy Vilmos (বা William Hevesy) নামে এক হঙ্গেরীয় পণ্ডিত, কোলেদের সঙ্গে Finno-Ugrian ফিন্নোউগ্রীয় জাতির (রুষদেশ, সাইবিরিয়া ও উত্তর-ইউরোপ যাদের আদিম বাসভূমি তাদের) সংযোগ ছিল ব'লে মত প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু এ মত এখনও বিচারাধীন।

আর্য্যেরা ভারতে যখন্ প্রথম এল', দেশে সুসভ্য (অথবা মোটামুটি সভ্যতা-প্রাপ্ত) এই দুইটী বড়ো অনার্য্য জাতি বাস ক'রত। নাগরিক সভ্যতার উন্মেষ দ্রাবিড়দের মধ্যেই হয়; অস্ট্রিক জাতির সভ্যতা ছিল মুখ্যতঃ গ্রামীণ সভ্যতা; আর নবাগত আর্য্যদের সভ্যতা ছিল মুখ্যতঃ যাযাবর ও অংশতঃ গ্রামীণ সভ্যতা। আর্য্যদের আগমনে দেশের আদিম অনার্য্য অধিবাসীদের একেবারে সমূলে উচ্ছেদ হ'ল না। নবাগত আর্য্য আর পুরাতন অনার্য্য পাশাপাশি বাস ক'রতে লাগ্‌ল। আর্য্য, দ্রাবিড়, কোল (অস্ট্রিক)—এই তিন জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান আর রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে লাগ্‌ল। আর্য্য ছিল বিজেতা—অন্ততঃ পাঞ্জাব-অঞ্চলে বিজেতৃরূপেই তার প্রবেশ হ'য়েছিল; তার ভাষা ছিল খুব জোরের ভাষা, আর তার সংঘ-শক্তিও ছিল অসাধারণ। আর্য্যের ভাষা তাই সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রলে; হয়তো তখনকার দিনের দ্রাবিড় আর কোল

গোষ্ঠীর পরস্পর-বিরোধী অনার্য্য ভাষা আর উপভাষার গোলমালের মধ্যে আর্য্যভাষা একটা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা হিসাবে উত্তর-ভারতে প্রসার লাভ করে। আর্য্যের ধর্মের কতকগুলি অনুষ্ঠান, আর আর্য্যদের কতকগুলি দেবতা অনার্য্যেরা মেনে নেয়। আবার ধীরে ধীরে অনার্য্যের দেবতা, অনার্য্যের ধর্মানুষ্ঠান, অনার্য্যের দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান, অনার্য্যের ভক্তিবাদ, আর্য্যদেরও মনে ছাপ দিতে থাকে। অনার্য্য রাজা বা পুরোহিতেরা আর্য্যভাষা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য সমাজে গৃহীত হ'তে থাকে; একটা ক্রমবর্ধনশীল আর্য্য-ভাষী গোষ্ঠী বা সমাজ গ'ড়ে উঠ্‌তে থাকে। এইরূপে, সংস্কৃত-ভাষা যার বাহন এমন মিশ্র আর্য্যানার্য্য সভ্যতা, বা হিন্দু সভ্যতা, আর্য্যদের ভারতে আগমনের পর থেকে ধীরে ধীরে তৈরী হ'তে থাকে।

এইভাবে হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় national বা জাতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট রূপ ফু'টে' উঠ্‌তে প্রায় হাজার বছর লাগে। আর্য্যদের ভারতে আগমন তাদের মেসোপোতামিয়ায় প্রকট হওয়ার কিছু পরে ঘটে, এটী অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-র পরে, কি খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-র দিকে, এই ঘটনা হ'য়েছিল। বুদ্ধদেবের কালে—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র দিকে—হিন্দু সভ্যতার কাঠামো তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনার্য্যদের অস্‌ট্রিক আর দ্রাবিড় দেবতাদের লীলা-কথা, তাদের রাজা-রাজড়াদের প্রাচীন কাহিনী, এ-সব ক্রমে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হ'য়ে, আর্য্যদের দেব-কাহিনী আর রাজ-কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে সংযুক্ত হ'য়ে রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণের মধ্যে স্থান পেলে। এইরূপ ব্যাপার গ্রীসেও ঘ'টেছিল। সম্প্রতি এই ধরণের একটা মতবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে যে, ক্ষত্রিয়েরা মুখ্যতঃ অনার্য্য রাজন্য-সম্প্রদায়ের লোক; দেশে আবহমান কাল থেকে যে অনার্য্য রাজারা রাজত্ব ক'রতেন, নব-গঠিত মিশ্র হিন্দু-সমাজে তাঁদের পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রেখে তাঁরাই ক্ষত্রিয়-রূপে গৃহীত হ'লেন। আবার এ মতও প্রকাশিত হ'য়েছে যে, ভারতবর্ষে দলে দলে আর্য্যদের প্রবেশই ঘটে নি—কেবল আর্য্যের ভাষা আর আর্য্যের কতকগুলি ধর্মমত আর অনুষ্ঠান ঈরান থেকে ভারতবর্ষে প্রসৃত হয় মাত্র।

আর্য্যদের বিশেষ উপাসনা-রীতি হচ্ছে 'হোম'। দেবতারা আকাশে থাকেন, অগ্নি তাঁদের দূত বা মুখপাত্র, বেদী তৈরী ক'রে তা'তে কাঠের আগুন জেলে সেই আগুনে ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, পূষা, অগ্নি, অশ্বিদ্বয়, উষা, মরুদ্‌গণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে দুধ, ঘী, মাংস, যবের পুরোডাস বা রুটী, সোমরস এই-সব খাদ্যবস্তু আহুতি দেওয়া হ'ত, দেবতারা আগুনের মারফৎ সেই সব জিনিস পেয়ে খুশী হ'য়ে যে হোম ক'রত তাকে স্বর্ণ, অশ্ব, পুত্র-সন্তান, প্রচুর শস্য প্রভৃতি দান ক'রতেন। 'পূজা'র

রীতি আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না—প্রতিমা বা অনুরূপ দেব-প্রতীকের গায়ে ফুল, পাতা, চন্দন, সিঁদুর প্রভৃতি দেওয়া, চা'ল-ফল-মূলের নৈবেদ্য, অথবা বলিদানের পশুর মুণ্ড বা পাত্রে ক'রে তার রক্ত নিবেদন করা, এ সমস্ত বৈদিক অর্থাৎ আর্য্য রীতি নয়। 'পূজা'-শব্দটীও মূলে দ্রাবিড় ভাষার শব্দ ব'লে অনুমান হয়। এই অনার্য্য অনুষ্ঠান অনার্য্য দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হ'য়ে হিন্দু অনুষ্ঠানে পরিণত হ'ল।

আর্য্যদের প্রথম আগমনের সময়ে দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা যে দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি অনার্য্য ভাষা ব'লত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর্য্যদের আসবার বহু শত বৎসর পর পর্য্যন্তও এই সব অনার্য্য ভাষা জীবন্ত ছিল,—বুদ্ধদেবের সময়ে, এমন কি তার ৫০০.৬০০ বৎসর পরেও—উত্তর-ভারতবর্ষেরও অনেকখানি জুড়ে' জন-সাধারণ অনার্য্য ভাষা ব'লত, এরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। এই-সব অনার্য্যভাষীদের দ্বারা আর্য্যভাষা গৃহীত হবার সঙ্গে-সঙ্গে এদের ধর্ম, দেবতা, আচার-অনুষ্ঠানও আর্য্যীকৃত হ'য়ে গেল, সেগুলি সর্বজন-গৃহীত হ'য়ে প'ড়ল—পৌরাণিক দেবতাবাদ, ভক্তিবাদ ইত্যাদি এল'—বৈদিক ধর্ম্মের চেয়ে গভীরতর উন্নততর ধর্মজীবন ভারতীয় সমাজে এল'। অনার্য্যদের বড়ো-বড়ো দেবতা—শিব, উমা, বিষ্ণু—অনুরূপ আর্য্যদের দেবতাদের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেলেন, তাঁদের আরও মহনীয় ক'রে তুল্‌লেন। অনার্য্যদের বৃক্ষ-দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, নাগ, আর দৈবী শক্তির বিকাশ রূপে, দেবতা রূপে কল্পিত নানা পশুপক্ষীর প্রতীকের মাধ্যমে পূজা—এ-সবও এসে গেল।

খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধে আর্য্যদের বৈদিক সাহিত্য, মিশ্র আর্যানার্য্য বা হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র ব'লে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রায় সব শ্রেণীর ভারতীয়দের কাছে গৃহীত হয়। আর্য্যদের পুরোহিত-শ্রেণী ব্রাহ্মণ জাতিরও প্রতিষ্ঠা এই সময়েই ঘটে। প্রথম যুগের বিজেতা আর্য্যদের প্রভাব এরূপটী হওয়ার একটী কারণ। বেদ গৃহীত হ'য়ে যাওয়ায় ও সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায়, অনার্য্য ভাষার প্রতিষ্ঠা হওয়া আর সম্ভবপর হ'ল না। কিন্তু অনার্য্য ভাষা সহজে ম'রলও না। অনার্য্য শব্দ কিছু-কিছু প্রাকৃতে আর সংস্কৃতে ঢুকল, অনার্য্য চিন্তা-পদ্ধতিও সংস্কৃতে এসে' গেল। খ্রীষ্ট-জন্মের ১৫০ বৎসর পূর্বে কলিঙ্গের জৈন-ধর্মাবলম্বী রাজা খারবেল মস্ত এক অনুশাসন প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ ক'রে যান—রাজার এই অনুশাসন প'ড়ে কে বুঝ্‌বে যে তাঁর নাম আর্য্যভাষার নয়, দ্রাবিড় 'কার' অর্থে 'কালো, কৃষ্ণ' এবং 'বেল্' অর্থে 'বল্লম,'—

'কারবেল' বা 'খারবেল' শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ হবে 'কৃষ্ণষ্টি' (অর্থাৎ 'কৃষ্ণ ঋষ্টি বা বল্লম যার')। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র বংশীয় রাজারা যাঁরা খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে রাজ্য করেন—তাঁদের বড়ো-বড়ো প্রাকৃত অনুশাসন আছে, তাঁদের গোত্র-নাম হ'চ্ছে 'বাশিষ্ঠীপুত্র, গৌতমীপুত্র' প্রভৃতি; কিন্তু তাঁদের নিজেদের বংশ-নাম 'সাত-বাহন' শব্দটী আর্য্য ভাষার নয়,—এ নামটী অনার্য্য কোলভাষার, এই নামের অর্থ হ'চ্ছে 'অশ্ব-পুত্র', যার দ্রাবিড় অনুবাদ এঁদের একজন রাজার ব্যক্তি-গত নামে 'বিলিবায়-কুর' অর্থাৎ 'বড়বা-পুত্র' বা 'ঘোটকী-পুত্র' রূপে পাওয়া যাচ্ছে। এই-সব থেকে, দু'হাজার আড়াই হাজার বছর আগে ভারতীয় জীবনে অনার্য্য উপাদান কত প্রবল ছিল, তার একটা আভাস পাওয়া যায়; আর্য্য প্রভাব কতটুকু উপর-উপর ছিল, তাও বোঝা যায়।

ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বয়স, পূর্বে নির্দিষ্ট ইতিহাস অনুসারে খুব বেশী হবে না; এ কথায় আমাদের অনেকের আত্মসম্মানে ঘা লাগ্‌বে। আর্য্যদের আ'স্‌বার পূর্বে অনার্য্য দ্রাবিড় আর কোলদের ইতিহাস অবশ্য ছিল, তার অনেক কিছু রূপান্তরিত আকারে সংস্কৃত পুরাণে রক্ষিত হ'য়েছে। আর্য্যেরা আসাতেই হিন্দু জাতির রূপ-গ্রহণে সাহায্য হ'ল; আর্য্য-অনার্য্যের পূর্ণ সামঞ্জস্য হ'ল খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধে। হিন্দু জাতির আর সভ্যতার ইতিহাসে মোটামুটী দু'টী যুগ ধরা যেতে পারে—যজ্ঞের প্রাধান্যের যুগ, আর পৌরাণিক দেবতাদের প্রাধান্যের যুগ। খ্রীষ্ট-পূর্ব ১০০০ কি তার ২।৪ শ' বছর আগে থেকে এই সভ্যতার আরম্ভ; খ্রীষ্ট-জন্মের কিছু পূর্ব থেকে ৮০০।১০০০ বৎসর ধ'রে এই সভ্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল। পৃথিবীর অন্য প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে তুলনা ক'রলে, বয়স হিসাবে আমাদের হিন্দু সভ্যতা মিসর, বাবিলোন, ঈজিয়ান-দেশের সভ্যতার চেয়ে ঢের আধুনিক, আর প্রাচীন পারসীক তথা প্রাচীন চীনা সভ্যতার সমকালীন; গ্রীক সভ্যতা কিন্তু নিজ বিশিষ্ট মূর্তি খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধেই প্রাপ্ত হয়; আর চীনা সভ্যতা অব্যাহত গতিতে খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ থেকে শুরু ক'রে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধেই নিজ পরিণত রূপ ধারণ করে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগকে রোমান্ বা গ্রীকো-রোমান্ যুগের সভ্যতার, আর চীনের হান্ ও থাঙ যুগের সভ্যতার জুড়ি বলা যায়।

হিন্দু সভ্যতার অতি-প্রাচীনত্বে যাঁরা আস্থাবান্, তাঁরা জ্যোতিষের প্রমাণ উপস্থিত ক'রে এই প্রাচীনত্ব প্রমাণ ক'রতে চান। এ সম্বন্ধে খালি দুটো কথা ব'লতে চাই: এক—হিন্দু জ্যোতিষ গ্রীকেদের সঙ্গে হিন্দুর পরিচয়ের পরেই পুষ্টিলাভ

ক'রে, বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি প্রাচীন সাহিত্যের জ্যোতিষিক উল্লেখগুলি কি ভাবে নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে ; আর, দুই—যাঁরা এই জ্যোতিষের 'প্রমাণ' প্রয়োগ করেন, তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য নেই ; তা'থেকে বোঝা যায়, যুক্তিতর্কানুমোদিত বিচারের যে এক পথ, যে scientific বা logical discussion আমাদের একই জিনিস প্রমাণ ক'রে দেবে, সর্ববাদি-সম্মত সেই যুক্তিতর্কানুমোদিত বিচার-পদ্ধতি, সেই logical discussion এই জ্যোতিষিক আলোচনায় যেন ঠাঁই পাচ্ছে না। জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তে যে অতি-প্রাচীন তারিখের কথা শোনা যায়, অন্য দিক্ দিয়ে তার প্রতিকূলে এত বিষয় আছে, যে এই-সব বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তের কোনটাই গ্রহণ-যোগ্য ব'লে মনে হয় না। রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের রাজাদের তালিকা, এ-সবের ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা হ'য়েছে। যাঁরা প্রাচীন ইতিহাস যথারীতি আলোচনা করেন, তাঁদের কেউই রামায়ণের কোনও ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করেন না ; মহাভারতের মধ্যে, মহাভারত আর পুরাণের অনেক উপাখ্যানের মধ্যে, কিছু ঐতিহাসিকত্ব থাকতে পারে, এইটুকু স্বীকার করেন মাত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকে হ'য়েছিল, এইরূপ মত দু'জন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক—ইংরেজ Pargiter পার্জিটর সাহেব আর ভারতীয় হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী—এঁরা প্রকাশ করেছেন ; এঁরা বিভিন্ন পথ ধ'রে বিচার করেছেন, এঁদের আলোচনা-পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত উড়িয়ে' দেবার নয়। মহাভারতের পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে একথাও বলা যেতে পারে, যে তাঁরা আর্য্য-পূর্ব যুগের মানুষ—মহাভারতের মূল আখ্যান অনার্য্য রাজাদের নিয়ে, পরে অনার্য্য জাতির নবাগত আর্য্যজাতির সঙ্গে মিশ্রণের আর ভাষায় তাদের আর্য্যীকরণের সঙ্গে-সঙ্গে, এই উপাখ্যানও পরিবর্তিত হ'ল, পল্লবিত হ'ল, শেষে আমাদের সংস্কৃত মহাভারতে দাঁড়িয়ে' গেল, খ্রীষ্ট-জন্মের কাছাকাছি কোনও সময়ে—আর আর্য্যানার্য্য-মিশ্র হিন্দুজাতির এক সাধারণ জাতীয় সম্পত্তি হ'য়ে গেল ॥

এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন রূপ বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভারতবর্ষে আনীত হয়, আর্যগণের দ্বারা। সুদূর রুষ দেশে উরাল পর্বতের দক্ষিণে কাস্পিয়ান ও আরাল হ্রদদ্বয়ের উত্তরে, এখনকার কালে তুর্কী-ভাষী খিরঘিজ ও কাজাক জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ভূখণ্ডে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেরা বাস করিত; ইহাদের মধ্যে যে ভাষা ঐ সময়ে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই পরবর্তী কয়েক বর্ষ-সহস্রকের মধ্যে বিবিধ প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়—হিত্তী, বৈদিক, অবেস্তা ও প্রাচীন পারসীক, প্রাচীন গ্রীক, লাতীন, গথিক, প্রচীন তুষারীয়, প্রাচীন আইরিশ, প্রাচীন স্লাব প্রভৃতি ভাষাতে, মূল ইন্দো-ইউরোপীয়ের পরিণতি ঘটে। কোন্ পথ ধরিয়া ইন্দো-ইউরোপীয়গণ তাহাদের আদি পিতৃভূমি হইতে ভারতবর্ষে আসে, তাহা ঠিকমত জানা যায় না; তবে কতকগুলি প্রাচীন লেখের প্রমাণে এইরূপ অনুমান হয় যে, ইহাদের একটী দল আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২২০০-র দিকে কৌকাস বা ককেসস্ পর্বতমালার দক্ষিণে, মেসোপোতামিয়া বা ইরাকের উত্তরে আধুনিক কালের পূর্ব-তুর্কীদেশে ও উত্তর-পশ্চিম-ঈরানে, প্রথম দেখা দেয়। এখানে কিছুকাল ধরিয়া ইহারা অবস্থান করে, পরে ধীরে-ধীরে পূর্ব-তুর্কীদেশে, ইরাকে ও পশ্চিম-ঈরানে ইহারা প্রসৃত হয়, ও তৎপরে ঈরান ও আফগানিস্থান হইয়া ভারতে আসে।

আদি যুগের ইন্দো-ইউরোপীয়েরা সভ্যতায় তেমন উন্নত ছিল না, ইহাদের তুলনায় মিসরী, প্রাচীন গ্রীসের আদিম অধিবাসী, এবং বাবিল ও অসুর জাতির লোকেরা, নাগরিক সভ্যতায় অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছিল। আদি ইন্দো-ইউরোপীয়েরা কিন্তু প্রাচীন সভ্য জগৎকে একটী জিনিস দান করে,—সেটী হইতেছে ঘোড়া; ইহাদের পিতৃভূমিতে ঘোড়া বন্য অবস্থায় চরিত, সেখানেই ইহারা ঘোড়া ধরিয়া পোষ মানাইয়াছিল; ঘোড়াকে বশে আনিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া ও তাহাকে দিয়া রথ বা গাড়ী টানাইয়া, সেই সুপ্রাচীন যুগে ইহারা মানব-সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল; ঘোড়ার সাহায্যে দ্রুত গমনাগমন সহজ হইল, বিভিন্ন জাতির বিস্তৃতি ও পরস্পরের উপর প্রভাব-বিস্তার আগের চেয়ে আরও শীঘ্র এবং ব্যাপক-ভাবে ঘটিতে লাগিল। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেদের কতকগুলি উপজাতি

বা দল, উরাল-পর্বতের দক্ষিণ হইতে পশ্চিম মুখে গিয়া ইউরোপে উপনিবিষ্ট হয়, ইউরোপের নানা দেশে ইহাদের বংশধরেরা প্রাচীন কেল্‌তীয়, ইতালীয়, জর্‌মানীয়, হেল্লেনীয় বা গ্রীক, বাল্‌তীয় এবং শ্লাব প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হয়। আর একটি দল পূর্ব-মুখে গিয়া মধ্য-এশিয়ায় বাস করিতে থাকে, ইহাদের উত্তর-পুরুষদের পরে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্য-ভাগে উত্তর-সিন্‌-কিয়াঙ (বা চীনা তুর্কীস্থান) দেশে 'তোখারীয়' জাতিরূপে দেখা যায়, প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা মধ্য-এশিয়ার এই তোখারীয় জাতির সহিত পরিচিত ছিল ও ইহাদিগকে 'ঋষিক' ও 'তুষার' নামে অভিহিত করিত। এই-সব বিভিন্ন ইউরোপীয় দল ব্যতিরেকে আরও দুইটী দল এশিয়া-মাইনরের দিকে আসে; ইহাদের একটী কোনও অজ্ঞাত সময়ে এশিয়া-মাইনরের মধ্য-ভাগে উপনিবিষ্ট হয়, খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-র দিকে ইহাদের ভাষা, হিত্তী বা কানীসীয় ভাষা, এশিয়া-মাইনরের একটী দুর্ধর্ষ শাসক জাতির ভাষা-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে দেখা যায়। দ্বিতীয় দলটী ঈরানীয় ও ভারতীয় আর্য্যদের পূর্ব-পুরুষদের লইয়া; সম্ভবতঃ ককেসস্‌ পর্বত অতিক্রম করিয়া ইহারা উত্তর-ইরাকে ২২০০।২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আসিয়া উপনীত হয়। এই দলটী হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আর্য্য-শাখা।

খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় সহস্রকের শেষের কয় শতকে আর্য্যদের আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, তাহারা তাহাদের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থার অন্ধ তমিস্রা হইতে সুসভ্য এবং ইতিহাস-প্রবিষ্ট জাতিগণের সংস্পর্শে প্রথম আসিতেছে। অসুর-বাবিল-জাতীয় জনগণ তাহাদের প্রাচীন লেখ মধ্যে এই নবাগত আর্য্যদের আগমন উল্লেখ করিতেছে। আর্য্যদের আগমন উত্তর হইতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহারা ঐ অঞ্চলে প্রথম ঘোড়া আনয়ন করিয়াছিল। অসুর-বাবিল দেশের অর্থাৎ প্রাচীন ইরাকের লোকেরা ঘোড়ার সহিত পরিচিত ছিল না—তাহাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গোরু, ভেড়া, ছাগল, উট ও গাধা ছিল; ঘোড়া ওদেশের পশু ছিল না, আর্য্যদের নিকট হইতে তাহাদের পিতৃভূমি হইতে আনীত ঘোড়া ইহারা পরে পাইয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে যখন উরাল-পর্বতের দক্ষিণ-অঞ্চলে ও দক্ষিণ-রুষ দেশের সমতল ভূভাগে আর্য্যগণ অথবা তাহাদের পিতৃপুরুষ ইন্দো-ইউরোপীয়গণ বাস করিত, তখন দক্ষিণের অসুর-বাবিল বা ইরাক দেশের লোকদের কাছ থেকে গোরুর প্রসার উত্তরে ইন্দো-ইউরোপীয়গণের মধ্যে ঘটিয়াছিল—আগে ইন্দো-ইউরোপীয়গণ ঘোড়া ও ভেড়া মাত্র পুষিত, গাধা, গোরু ও ছাগল তাহাদের মধ্যে ছিল না; সুতরাং দেখা যাইতেছে, দক্ষিণের গোরু উত্তরে আর্য্যদের পূর্ব-পুরুষদের

দ্বারা গৃহীত হয়, এবং যেন তাহার পরিবর্তে উত্তরের ঘোড়া আর্য্যদের দ্বারা দক্ষিণে আনীত হয়।

আর্য্যেরা ইরাকে আসিয়াছিল, কতকটা দলবদ্ধ-ভাবে লুঠ-তরাজ করিবার জন্য, ও জো পাইলে দেশে উপনিবিষ্ট হইবার জন্য; এবং কতকটা দুই একজন করিয়া, ঘোড়া বিক্রী করিবার উদ্দেশ্যে। যাহা হউক, খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে আর্য্যগণ উত্তর-ইরাকে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। ইহাদের হিত্তী বা কানীসীয় শাখার জাতিগণ এশিয়া-মাইনরে একটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতিরূপে উপনিবিষ্ট হইয়াছে—হিত্তী জাতির ভাষায় উৎকীর্ণ লেখমালা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মাত্র বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইঁহাদের শ্রমের ফলে প্রাচীনকালের একটী বিশিষ্ট ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ভাষা আমাদের সংস্কৃতের একটু দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতি—এইরূপ জ্ঞাতিত্ব-সূত্রে ইহা গ্রীক, লাতীন, স্লাব, জরমানিক, কেল্‌তীয় প্রভৃতি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিক্ হইতে আর্য্য ভাষার শব্দ ও নাম অসুর-বাবিলদের ভাষায় উৎকীর্ণ লেখ-মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। আর্য্যদের কয়েকটী শাখা ঐ সময়ের কিছু পরে, ইরাক-অঞ্চলে, স্বকীয় শৌর্য্য-বলে, কতকগুলি দেশ অধিকার করিয়া লয়, ও স্থানীয় অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে থাকে। 'মিতান্নি' নামে একটী আর্য্য-শাখা ইহাদের অন্যতম। 'কাস্‌সী' (=কাশি ?) নামে আর একটী শাখা ১৭৪৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বাবিলন-নগরী অধিকার করিয়া লয়, এবং বাবিলনে কাশি-বংশীয় আর্য্য রাজারা কয়েক শতক ধরিয়া রাজত্বও করে। 'মিতান্নি', 'কাশি', 'হারুরি' বা 'আরুরি' (=আর্য্য ?) নামক এই সব আর্য্য বংশ, ঐ দেশের জনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের মধ্যে বাস করার ফলে, ক্রমে নিজেদের আর্য্যভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া যায়, ও স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া নিজ পৃথক্ জাতিসত্তা হারাইয়া ফেলে। ধীরে ধীরে এই ব্যাপার ঘটে। কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৪০০।১৩০০-র পরে। ঐ সময় পর্য্যন্ত ইহাদের ভাষার অস্তিত্বের বহু প্রমাণ স্থানীয় লেখাবলীর মধ্য হইতে পাওয়া যায়।

ইরাকের অসুর-বাবিল জাতির লেখ ও অনুশাসনে রক্ষিত খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ আনুমানিক ২০০০ হইতে ১৪০০ বা ১৩০০ পর্য্যন্ত যে সমস্ত আর্য্য ভাষার শব্দ ও নাম পাওয়া যায়, সেগুলিকে বৈদিক সংস্কৃতের পূর্ব অবস্থার ভাষার শব্দ ও নাম বলা যায়। এই যুগের আর্য্যভাষা, একদিকে ভারতে আগত আর্য্যগণের বৈদিক ভাষা,

ও অন্যদিকে ঈরানে উপনিবিষ্ট আর্যগণের প্রাচীন ঈরানী (পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ অবেস্তায় ও পারস্যদেশে বাণমুখ লিপিতে পর্বতগাত্রে ও অন্যত্র উৎকীর্ণ প্রাচীন-পারসীক অনুশাসনে রক্ষিত)—এই উভয় প্রকার ভাষার জননী। ইহাকে একসঙ্গে 'প্রাক্-সংস্কৃত' ও 'প্রাক্-ঈরানী' বলা যায়। ভারতে আর্যদের আগমন ঘটে ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পরে—এই মতবাদই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষা ভারতে আসিয়া ভারতীয় চিন্তা ও সভ্যতার বাহন হইবার পূর্বেই, ইহার 'প্রাক্-সংস্কৃত' অবস্থাতেই একটী প্রতাপশালী জাতির ভাষা হিসাবে, পশ্চিম-এশিয়া-খণ্ডে ইহার কতকটা প্রতিপত্তি ও প্রসার ঘটে। অর্বাচীন-কালে সংস্কৃতের ভগিনী-স্থানীয়া প্রাচীন ঈরানী ভাষার পরবর্তী রূপ প্রাচীন-পারসীক, মধ্য-পারসীক বা পহ্লবী এবং আধুনিক পারসীক বা ফারসী ইরাকে ও পশ্চিম এশিয়ার অন্যত্র, সেই প্রসার ও প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

'প্রাক্-সংস্কৃত' বা বৈদিক-পূর্ব আর্যযুগের সংস্কৃত তখনও কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতির বাহন হইতে পারে নাই, কারণ আর্য জাতি তখনও কতকটা আদিম যাযাবর অবস্থায় ছিল—পার্থিব সভ্যতায় ইহারা তখনও বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই; অসুর-বাবিলদের বিরাট ঐশ্বর্যময় সভ্যতা ইহাদিগকে তখন বিশেষ ভাবে অভিভূত করিয়াছিল, ইহারা নিজেরাই অনেক কিছু নূতন বস্তু শিখিতেছিল। কিন্তু ইহারা ইরাক-অঞ্চলে ঘোড়া আনিয়াছিল, ঘোড়াকে শিখাইবার কালে আর্য অশ্বপালগণ যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিত সেইরূপ কতকগুলি শব্দ অসুর-বাবিল লেখের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই শব্দগুলির রূপ হইতে বুঝা যায় যে, এগুলি সংস্কৃতের পূর্ব অবস্থার শব্দ। যেমন, ঘোড়াকে মাঠে একবার দৌড় করাইতে হইলে বলিত aika-wartana = 'অইক-বর্তন', অর্থাৎ সংস্কৃত 'এক-বর্তন'; তিনবার দৌড় করাইবার কালে বলিত terawartana = 'তের (= তির, বা ত্রি ?)-বর্তন'; তদ্রূপ panza-wartana = পঞ্চ-বর্তন, satta-wartana = সত্ত ('সপ্ত' শব্দের বিকৃত রূপ)-বর্তন, nawa-wartana = নব-বর্তন; ঘোড়াকে থামানোকে বলিত wasana 'বসন'। অন্য শব্দের মধ্যে পাইতেছি maria = 'মর্য' (বৈদিক শব্দ, অর্থ 'বীর' বা 'মানুষ'), tapash = 'তপঃ' (উত্তাপ); দেবতার নাম = Shuriash = 'সূর্যঃ', Maruttash = 'মরুত', Shugamuna = মহামারী অথবা জ্যোতির দেবতা, বৈদিক প্রতিরূপ 'শোকমনাঃ' (শুচ্ ধাতু দীপ্তি অর্থে, তাহা হইতে), Dakash = নক্ষত্র-গণের পিতারূপে উক্ত দেবতা, সংস্কৃত 'দক্ষ' (= দক্ষ), Shimalia = *Zhimalia = উজ্জ্বল অর্থাৎ হিম বা তুষার-ধবল পর্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবী, 'হিমালা', সংস্কৃত 'হিম'

শব্দের প্রাচীনতম প্রাক্-সংস্কৃত বা আর্য্য রূপ z'hima-এখানে পাইতেছি ; Indra = 'ইন্দ্র', Mitra = 'মিত্র' Nashattia = 'নাসত্য' অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়, Uruwna বা Aruna = 'বরুণ' ; এবং রাজাদের নাম, যথা Abirattash = 'অভিরথঃ', Shuzigash = 'সুজীগঃ', Artamanya = 'ঋতমন্যু', Arzawiya = 'আর্জবয়', Aitagama = *'অইতগাম', বৈদিক 'এতগাম', Artashumara = 'ঋতস্মর', Shuwardata = *'স্বর্দাত' বা 'স্বর্দত্ত', Tushratta = Duzhratha = 'দূরথ', ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দ ও নাম হইতে, ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা আসিবার পূর্ব্বেই ইহার পূর্ব রূপ আর্য্য বা ভারত-ঈরানীর ভাষা, কিরূপে এশিয়া-খণ্ডের সভ্য জনমণ্ডলে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ হইতে ১৩০০—এই সময়ের মধ্যে আর্য্য জাতির জগৎকে আর কিছু দিবার ছিল না, এক অশ্ব-পালন ছাড়া ; সুতরাং এই সময়ের মধ্যে অন্য জাতির উপরে আর্য্যদের প্রভাব, ভাষায় ও জীবনের অন্য দিকে তেমন কার্য্যকর হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ হইতে ১৩০০-র মধ্যে ইরাক হইতে আরও পূর্বে ঈরানে আর্য্যগণ আসিয়া উপনিবিষ্ট হইল, এবং ঈরান হইতে ভারতে আসিল। প্রাক্-বৈদিক ভাষা ইহাদের দ্বারা ভারতে আনীত হইল, উত্তর-পাঞ্জাবে ইহার প্রথম স্থাপনা হইল। ভারতে তখন অস্ট্রিক (কোল, মোন্-খ্মের) ও দ্রাবিড়-জাতীয় লোকের বাস ছিল ; ইহাদের মধ্যে দ্রাবিড় জাতি নাগরিক সভ্যতায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। নবাগত আর্য্যগণ শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ জাতির লোক হইলেও, নাগরিক সভ্যতায় দ্রাবিড়দের অপেক্ষা হীন ছিল বলিয়াই মনে হয়। অস্ট্রিকদের সভ্যতা মুখ্যতঃ গ্রামীণ সভ্যতাই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। আর্য্যগণ আংশিক-ভাবে যাযাবর ও আংশিকভাবে কৃষিজীবী ছিল। পাঞ্জাবেই আর্য্যদের বাস বেশী করিয়া ঘটে, কারণ ভারতের এই অঞ্চল আর্য্যদের কেন্দ্র-স্থানীয় ঈরানের পাশেই অবস্থিত অবস্থিত ছিল। (ব্যাপক অর্থে 'ঈরান' বলিলে, পারস্য আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান এই তিন দেশকেই ধরিতে হয়।) পাঞ্জাব হইতে আর্য্যগণ প্রথমটায় পূর্বদিকে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রসৃত হয় ; পরে সিন্ধু প্রদেশে ও দক্ষিণে মরুদেশে, ও গুজরাটের এবং মহারাষ্ট্রের দিকে ইহাদের বিস্তৃতি ঘটে। গঙ্গার দেশে বেশী করিয়া অনার্য্যদের সঙ্গে আর্য্যদের মিশ্রণ ঘটে, এবং এই মিশ্রণের ফলে, উত্তর-ভারতে একটী নবীন জাতি ও সভ্যতার উদ্ভব হয়—সেটী হইতেছে প্রাচীন ভারতের হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতা। বৈদিক যুগের পর হইতে এই সভ্যতা ধীরে-ধীরে রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। ইহার সংগঠনে আর্য্য ও অনার্য্য উভয়েরই আহৃত উপাদান মিলিত হয়।

এই নবীন সভ্যতাকে 'পৌরাণিক হিন্দু' সভ্যতাও বলা যাইতে পারে। বৈদিক সভ্যতা—ঋগ্‌বেদ আদি চারি বেদ এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি যাহার পরিচায়ক—তাহা হইতেছে মুখ্যতঃ আর্য্যজাতির জিনিস। ব্রাহ্মণ-যুগ হইতেই বেশী করিয়া জীবনে এবং ভাব-জগতে আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রণ ঘটিতে থাকে। জৈন, বৌদ্ধ, এবং উত্তর কালের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধের শেষ ভাগ হইতে যে রূপ গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা আরভমাণ আর্য্য অনার্য্যের মিলনের ফল।

এইভাবে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি সময়ে আর্য্য-অনার্য্য, বৈদিক-অবৈদিক অথবা হিন্দু সভ্যতা, একটী বিশিষ্ট বস্তু হইয়া দেখা দিল। আর্য্য জগতের প্রাচীন বৈদিক রূপ, আর্য্যদের বিশুদ্ধি, আর রহিল না ; অনার্য্য অস্‌ট্রিক ও দ্রাবিড় জগৎ-ও আর অবিমিশ্র রহিল না। ভিতরে ভিতরে বহু অনার্য্য ভাব, চিন্তাধারা ও অনুষ্ঠান এই নবীন মিশ্র সভ্যতায় স্থান পাইল। কিন্তু বাহির হইতে হইল আর্য্যের ভাষার জয়-জয়কার। উপর-উপর আর্য্য ভাষা ঠিক আছে বলিয়া মনে হইলেও, ইহাতে বহু অনার্য্য শব্দ প্রবেশ করিল, এবং নানা স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ে ইহাতে দ্রাবিড় ও অস্‌ট্রিক ভাষার প্রভাব আসিল ; বৈদিক ভাষার ভাঙ্গন ধরিল। আর্য্যের বৈদিক ভাষা পরিবর্তিত হইয়া প্রাকৃতের রূপ ধারণ করিতে লাগিল—পূর্ব ভারতেই এই পরিবর্তন একটু দ্রুত ঘটিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ৫০০-৪০০ শতকে পশ্চিম-পাঞ্জাব অঞ্চলে—পাণিনির দেশে—প্রচলিত আর্য্য ভাষা তখনও বৈদিক যুগের ভাষা হইতে বেশী পরিবর্তিত হয় নাই। পাঞ্জাব অঞ্চলের এই 'লৌকিক' বা কথিত ভাষার আধারে, পাণিনির পূর্ববর্তী আচার্য্যদের এবং স্বয়ং পাণিনির চেষ্টায়, একটী সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠিল, যেটী 'সংস্কৃত' নামে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল ; এবং প্রথম-প্রথম বৌদ্ধ ও জৈনেরা পূর্ব-ভারতের ও মধ্য-ভারতের কথিত ভাষা, প্রাচীন প্রাকৃত (মাগধী, পালি ও অর্ধমাগধী) যদিও তাহাদের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে ব্যবহার করিত, তথাপি ক্রমে তাহারাও ব্রাহ্মণদের মত সংস্কৃতকেও মানিয়া লইল। এদিকে সংস্কৃত ভাষা নিজেও প্রাকৃতের প্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ক্রমে ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন মুখ্যরূপে প্রকাশিত নবীন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন হইয়া দাঁড়াইল। উত্তর-ভারতে মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য সংস্কৃতি বা সভ্যতা, যেমন-যেমন উত্তর-ভারত বা আর্য্যাবর্তের গণ্ডী বা সীমা ছাপাইয়া ভারতের অন্যত্র প্রসার লাভ করিতে লাগিল, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র পর হইতে, তেমনি-তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে কথ্য ভাষা হিসাবে সংস্কৃতও প্রসারিত এবং জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইতে লাগিল। এইভাবে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতা

বিহার হইতে বাঙ্গালাদেশে, আসামে ও উড়িষ্যায় আগমন করিল ; সঙ্গে-সঙ্গে আর্য্য ভাষাও তাহার সাহিত্যিক রূপ সংস্কৃতকে লইয়া এই সমস্ত প্রদেশকে জয় করিল, স্থানীয় অনার্য্য ভাষার লোপ সাধন করিয়া অথবা সেগুলিকে কোণ-ঠেসা করিয়া দিয়া, এই প্রদেশগুলিকে আর্য্যাবর্তের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিল। সেই ভাবে গাঙ্গেয় মিশ্র আর্য্যনার্য্য বা হিন্দু সভ্যতা, আর্য্য ভাষা সংস্কৃতকে লইয়া দাক্ষিণাত্যেও পহুঁছিল, এবং উত্তর মহারাষ্ট্রকেও আর্য্যাবর্তের অংশ করিয়া দিল। আরও দক্ষিণে, অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রবিড় বা তমিল দেশ ও কেরলে, আর্য্যাবর্তের সভ্যতা গৃহীত হইল, সংস্কৃতও গৃহীত হইল ; কথ্য আর্য্য ভাষা প্রাকৃত কিন্তু অত দূর দক্ষিণে দ্রাবিড় ভাষাগুলির স্থান দখল করিতে পারিল না। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রাকৃত ভাষার বহু শব্দ এই-সব দ্রাবিড় ভাষাতে স্থান পাইল,—আর সংস্কৃতের তো কথাই নাই। কতকগুলি বিশেষ ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে, সংস্কৃত শব্দ বিশুদ্ধতম ও প্রাচীনতম দ্রাবিড় ভাষা 'চেন্-তমিঝ্' বা প্রাচীন তমিলে যে-ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সেগুলিকে সংস্কৃত বলিয়া চিনিবার উপায় নাই ; কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের আশ-পাশের শতকগুলিতে, এখন হইতে ১৮০০।২০০০।২২০০ বৎসর পূর্বে, সুদূর দক্ষিণ-ভারতে আদি-দ্রাবিড় জাতির মধ্যে সংস্কৃত কি ভাবে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তমিলের এই-সব বিকৃত সংস্কৃতজ শব্দ হইতে বুঝা যায়। যেমন—'ঋষি' হইতে প্রাচীন তমিল 'ইরুটি,' 'শ্রী' হইতে 'তিরু', 'স্নেহ' হইতে 'নেয়্' ও 'নেচম্', 'ব্রাহ্মণ' হইতে 'পিরামণন্', 'সহস্র' হইতে 'আয়িরম্', 'ধর্ম' হইতে 'তন্মম্' ও 'তরুমম্', 'সভা' হইতে 'অবৈ', 'সন্ধ্যা' হইতে 'অন্তি', 'শীর্ষ' হইতে 'ঈয়ম্', 'কৃষ্ণ' হইতে 'কিরুট্টিণন্' (এবং 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রাকৃত রূপ 'কণ্হ' হইতে 'কন্নন্')—এইরূপ শত-শত আছে, যেগুলি সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রাচীন দ্রাবিড়ের উপরে সংস্কৃতের প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। এইভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা সুসভ্য দ্রাবিড় জনগণের ভাষাগুলিকে নিজ রাজচ্ছত্রের অধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, এখন হইতে ২০০০।১৮০০ বৎসর পূর্বেই।

নিখিল ভারত জুড়িয়া আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতীয় লোকের মধ্যে এইরূপে সংস্কৃতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সাহিত্যের সংস্কৃত, 'লৌকিক সংস্কৃত' রূপ গ্রহণ করিবার অল্প কয়েক শতকের মধ্যেই। ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতের আর্য্য ভাষার (বিশেষ করিয়া, ইহার প্রতীক এবং প্রাচীন ও সাহিত্যিক রূপ হিসাবে, সংস্কৃতের) দিগ্বিজয়, ভারতের বাহিরে আরম্ভ হইল। মুখ্যতঃ ব্যবসায়-সূত্রে, স্থল-পথে, হিন্দু-সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ উভয় মতের হিন্দু, ভারতের

আশ-পাশের দেশ-সমূহে গতায়াত আরম্ভ করিল। সম্ভবতঃ হিন্দু সভ্যতার নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণের পূর্ব হইতেই ভারতের অনার্য্যগণ অন্যদেশে যাওয়া-আসা করিত —বিশেষতঃ অস্ট্রিক-জাতীয় অনার্য্যগণ স্থল-পথে ব্রহ্মদেশে ও জল-পথে মালয়-উপদ্বীপে, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপময়-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, এবং শ্যামে ও কম্বোজে যাইত; এই-সব দেশে অস্ট্রিক অনার্য্যদের জ্ঞাতিদেরই বাস ছিল, তাহাদের সহিত প্রাগৈতিহাসিক সংযোগ কখনও ছিন্ন হয় নাই; এবং উত্তর-ভারত ভাষায় ও সংস্কৃতিতে আর্য্য ও হিন্দু হইয়া গেলেও, সেই সংযোগ-সূত্র রক্ষিত হইয়াছিল, বরং আরও সুদৃঢ় হইয়াছিল। হিন্দু যুগে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের কয়েক শতক হইতে আরম্ভ করিয়া, সংস্কৃত ভাষা এইভাবে একদিকে যেমন পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ঈরানে ও মধ্য-এশিয়ায় আর্য্যদের জ্ঞাতিদের মধ্যে, ঈরানীয় শাখার পার্থব ও পহ্লব, সুগ্‌দ বা সোগ্‌দীয় (অথবা শুলিক বা চুলিক), এবং কুস্তন বা খোতনের অধিবাসীদের মধ্যে, ও তাহাদের উত্তরে ঋষিক বা তুষার (তোখারীয়) জাতির মধ্যে, প্রসার লাভ করিল (মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়াই এই অঞ্চলে আর্য্যভাষার বিস্তার ঘটিয়াছিল), তেমনি অন্যদিকে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশে (দক্ষিণ ও মধ্য-ব্রহ্মের অস্ট্রিক মোন্-জাতির মধ্যে, মধ্য-ব্রহ্মের এবং পরে উত্তর-ব্রহ্মের চীন-ভোট জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার ম্রন্-মা বা বর্মী জাতির মধ্যে), শ্যামে (দক্ষিণ-শ্যামের মোন্দের মধ্যে ও পরে উত্তর-শ্যামের চীন-ভোট জাতির শ্যাম-চীন শাখার দৈ বা থাই অথবা শ্যামীদের মধ্যে), কম্বোজের খ্মের জাতির মধ্যে, চম্পা বা কোচীন চীনের চাম জাতির মধ্যে, মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার মালয়দের মধ্যে, যবদ্বীপে, মদুরায় ও বলিদ্বীপে, বোর্নিওতে, এবং সুদূর ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জে, হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে (হিন্দুত্ব এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় রূপেই প্রচারিত হইয়াছিল), সংস্কৃত ভাষাও নূতন-নূতন প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র লাভ করিল,—ঐ-সব দেশের ভাষা ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলিরই মত সংস্কৃতের ছায়ায় আসিয়া সমবেত হইল। খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের ও পরের কয়েক শতকের মধ্যেই, ওদিকে কাস্পিয়ান হ্রদ ও সিন্-কিয়াঙ্ বা চীনা-তুর্কীস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব-ঈরান ও আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপকে ধরিয়া, এদিকে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, দক্ষিণ-ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক প্রভৃতি এবং বোর্নিও, সেলেবেস্ ও ফিলিপ্পীন পর্য্যন্ত লইয়া, এক 'বৃহত্তর ভারত' গড়িয়া উঠিল; এই বৃহত্তর ভারতের লোকেরা (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লোকেরা বিশেষ করিয়া) ধর্মে ও সভ্যতায় ভারতীয় হইয়া উঠিল, এবং সংস্কৃত তাহাদের মধ্যে সাদরে গৃহীত হইল। তাহাদের

ভাষা লিখিত ভাষা ছিল না, ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত বর্ণমালায় তাহাদের ভাষা-সমূহ প্রথম লিখিত হইল। ভারতীয় পুস্তকের—বৌদ্ধ শাস্ত্রের এবং রামায়ণ-মহাভারতাদি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থের—অনুবাদের সহায়তায় তাহাদের সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল বা সুদৃঢ় করা হইল ; সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের রাজারা নিজ অনুশাসন উৎকীর্ণ করাইতে লাগিলেন, ঠিক ভারতবর্ষে যেমনটী হইত। তাহাদের ভাষা-সাহিত্য ভারতীয় [সংস্কৃত] সাহিত্যের আদর্শে পুষ্ট হওয়ার ফলে, ও ভারতীয় অক্ষরে তাহাদের ভাষা লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে, সংস্কৃত শব্দ এই-সকল ভাষায় ভূরি-ভূরি প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ['তৎসম' শব্দ] ও বিকৃত-সংস্কৃত ['অর্ধতৎসম'] শব্দের সম্ভারে, তাহাদের ভাষা সমৃদ্ধ হইল ; আধুনিক বাঙ্গালা হিন্দী মারাঠীর মত, তেলুগু কানাড়ী মালয়ালম্ তমিলের মত, উচ্চভাবের প্রায় তাবৎ শব্দ মধ্য-এশিয়ার খোতনী ভাষা ও তোখারী ভাষা আবশ্যক মত সংস্কৃত হইতেই গ্রহণ করিত (এ বিষয়ে সুগ্‌দ বা শুলিক ভাষা একটু স্বতন্ত্র ছিল, এই ভাষা ছিল সমৃদ্ধ পহ্লবী ভাষার ভগিনী. এইজন্য সংস্কৃত হইতে শব্দ ধার করার রীতি ইহাতে ততটা প্রবর্তিত হয় নাই) ; এবং মোন্ ও খ্মের ভাষা, চম্পার চাম ভাষা, পরবর্তী কালে বর্মী ও শ্যামী ভাষাদ্বয়, মালাই ভাষা ও বিশেষ করিয়া যবদ্বীপীয়, সুন্দা-ভাষা, মদুরী ও বলিদ্বীপীয়, সংস্কৃত শব্দ আত্মসাৎ করিয়া নিজ পুষ্টিসাধন-বিষয়ে ভারতীয় ভাষাগুলিরই শামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সিংহলের সিংহলী ভাষা তো ভারতের আর্য্য ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত—গুজরাট হইতে যে প্রাকৃত খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে সিংহলে নীত হয়, তাহাই পরে সিংহলী ভাষাতে পরিণত হয়,—প্রথম হইতে সংস্কৃত ও আর্য্য সংস্কৃতির সঙ্গে ইহার অবিচ্ছিন্ন যোগ ছিল, এবং এখনও আছে।

সেরিন্দিয়া বা চীন-ভারত, অর্থাৎ এখনকার দিনের সোভিয়েট মধ্য-এশিয়া ও সিন্-কিয়াঙ্ বা চীনা-তুর্কীস্থান ; ইন্দিয়া-মিনোর (ইণ্ডিয়া-মাইনর) বা লঘু-ভারত বা অগ্র-ভারত, অর্থাৎ এখনকার দিনের আফগানিস্থান ; ইন্দোচীন বা ভারত-চীন, অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দোচীন ; মালায়া বা মালয় উপদ্বীপ, এবং ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারত ;—এই-সমস্ত দেশ লইয়া, এশিয়ার এই বিরাট অংশে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি, প্রায় সমস্ত পণ্ডিত লোকে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এবং ব্রাহ্মণেরা, সংস্কৃত জানিত, সংস্কৃত বুঝিত। দ্বীপময় ভারতের একজন যবদ্বীপীয় ও মধ্য-এশিয়ার একজন তোখারী ভিক্ষু তখন অক্লেশে সংস্কৃতের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন, এবং এই আলাপে কচিৎ একজন চীনা ভিক্ষুও যোগদান করিতে পারিতেন। তিব্বত ও চীন, এবং চীনের শিষ্য কোরিয়া ও জাপান

এবং তোঙ্-কিঙ্ ও আনাম—এ কয়টী দেশ নিজ নিজ স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল ; এই দেশগুলি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিলেও, ভারতীয় রীতিনীতি এ-সব দেশের স্বকীয় ও প্রাচীন রীতিনীতির উপরে ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতির উপরে সম্পূর্ণ-রূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান ও তোঙ্-কিঙ্-আনাম-কে ঠিক 'বৃহত্তর ভারত' বলা যায় না। কোরিয়া, জাপান, তোঙ্কিঙ্ আনামকে বরং 'বৃহত্তর চীন' বলা যায়।

চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম পহুঁছিয়াছিল প্রথমটা মধ্য-এশিয়ার খোতন ও তুষার (তোখারী) রাজ্যের লোকেদের মারফৎ ; পরে ভারতের সঙ্গে চীনের যোগ ঘটে, এবং ভারত হইতে মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়া ও জল-পথে যবদ্বীপ হইয়া, ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারক ও ধর্মগুরুগণ চীনে যাইতে আরম্ভ করেন ; চীন হইতে উত্তরের স্থল-পথে ও দক্ষিণের জল-পথে বৌদ্ধ শ্রমণ তীর্থ-যাত্রীরাও ভারতে আসিতে আরম্ভ করেন। যে-সব ভারতীয় ধর্মগুরু, পণ্ডিত ও প্রচারক চীনে গিয়াছিলেন, চীনাদের সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন এবং চীন-ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও জীবনী বহু স্থলেই চীনদেশে রক্ষিত হইয়া আছে ; ইহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ করিয়া করিতে হয়—মধ্য-এশিয়ার তুষার-জাতীয় পণ্ডিত কুমারজীব (ইহার পিতা কুমার ছিলেন কাশ্মীরীয়, এবং মাতা জীবা ছিলেন তুষার দেশের কুচী-নগরীর রাজ-কুমারী, পিতা ও মাতার নাম মিলাইয়া পুত্রের নাম হয় 'কুমারজীব'), এবং দক্ষিণ-ভারতের যোগী বোধি-ধর্ম। চীন-দেশীয় পণ্ডিত ও ভারত-যাত্রীদের মধ্যে ফা-হিয়েন (সংস্কৃত নাম—মোক্ষ-দেব), হিউয়েন্-ৎসাঙ্ (মহাযান-দেব) এবং য়ী-ৎসিঙ্ (পরমার্থ-দেব) সুপরিচিত। চীনা অনুবাদের প্রচার কোরিয়া, জাপান ও তোঙ্-কিঙ্-আনামেও হয়, কারণ ঐ দেশগুলির সভ্যতা ছিল মুখ্যতঃ চীনেরই সভ্যতা। চীনারা খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে সংস্কৃতের চর্চা করিত ; এবং সংস্কৃত-চীনা অভিধানও কতকগুলি প্রণীত হয় ; এই অভিধানগুলির সাহায্যে কোরিয়াতে এবং জাপানেও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাঝে-মাঝে সংস্কৃত পাঠ করিবার প্রয়াস করিতেন। এইরূপ দুইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে সঙ্কলিত হয়, ও অষ্টাদশ শতকে প্রাচীন পুঁথি হইতে কাঠে খোদাই করিয়া জাপান হইতে এইরূপ দুইখানি অভিধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিছুকাল হইল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই দুইখানি অভিধান, মূল জাপানী সংস্করণের ছায়া-চিত্র প্রতিলিপি করিয়া ও ফরাসী ভাষায় নানা মূল্যবান্ টীকাটিপ্পনী দিয়া, পারিস হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন—এই বই, ও ডাক্তার বাগচী-রচিত চীন-দেশে বৌদ্ধ শাস্ত্রের

অনুবাদের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া লিখিত দুই খণ্ডের বিরাট্ পুস্তক, আধুনিক যুগে ভারতীয়দের মধ্যে চীন-ভাষার চর্চার প্রথম ফল। অভিধান দুইখানিতে প্রথম দেওয়া আছে চীনা শব্দ, তাহার নীচে সপ্তম শতকের ভারতীয় অক্ষরে (যাহার সহিত ঐ যুগের ও পরবর্তী যুগের চীনারা ও জাপানীরা পরিচিত ছিল) সংস্কৃত শব্দটী (চীনা লিপির পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত শব্দের অক্ষরগুলি উপর হইতে নীচে দেওয়া হইয়াছে), সংস্কৃত শব্দের পাশে চীনা অক্ষরের সাহায্যে প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণ নির্দেশ—এইভাবে অভিধান রচিত হইয়াছে। একটী চীন-শব্দের একটী করিয়া মাত্র সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে।

ভোট বা তিব্বতীরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের সুবিখ্যাত রাজা স্রোঙ্-ব্ৎসন্-স্গম্-পো-র রাজত্বকালে। ঐ সময়ে ভোট পণ্ডিত থোন্-মি-সম্ভোট ভারতবর্ষে আসিয়া প্রাচীন কাশ্মীরী লিপির আধারে ভোট বা তিব্বতী লিপির গঠন করেন। ভোট-ভাষায় সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয়, এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র ব্যতীত অনেক অন্য সংস্কৃত গ্রন্থও ভোট-ভাষায় অনূদিত হয়। ফলে, ভোটদের মধ্যে নিজ ভাষায় একটী বিরাট্ বৌদ্ধ সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চীনাদের লিপি, ধ্বনি-নির্দেশক নহে; ইহা মুখ্যতঃ বস্তু-চিত্রময় ও ভাব-নির্দেশক বর্ণ-সমূহের সমষ্টি। বিদেশী ভাষার ধ্বনি চীনারা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিত না, এবং তাহাদের লিখন-রীতি ধ্বনি-নিরপেক্ষ হওয়ায়, চীনারা বিদেশী নামেরও যথাসম্ভব অনুবাদ করিয়া নিজ ভাষার শব্দ করিয়া লইবার প্রয়াস করিত; বিদেশী ভাষার শব্দের তো কথাই নাই। এইজন্য বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত অল্প কতকগুলি সংস্কৃত নাম ও শব্দ যথাযথ সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা দেখা গেলেও, সাধারণতঃ তাবৎ সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্দ চীনাতে অনূদিত হইয়াছে। 'বুদ্ধ' এই শব্দটী প্রাচীন চীনারা 'বুধ্' এই রূপে গ্রহণ করে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে; এবং একটী বিশেষ বর্ণ বা চিহ্ন দ্বারা এই 'বুধ' শব্দের নির্দেশ তাহারা করিত। বর্ণ বা চিহ্নটী অপরিবর্তিত রহিল, কিন্তু শতকের পর শতক ধরিয়া তাহার উচ্চারণ বা ধ্বনি পরিবর্তিত হইতে লাগিল, এবং সেই-সব পরিবর্তন ধরিবার কোনও উপায় তখনও ছিল না, এখনও নাই; বিশেষ গবেষণা করিয়া এখন তাহা স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছে। খ্রীষ্টীয় ৫০০-র দিকে 'বুধ্' শব্দের চীনা উচ্চারণ 'ভ্যুঅদ্' বা 'ভ্যুৎ' হইয়া যায়; পরে 'ভুৎ', এবং 'ভ্বাৎ, ভুর্' প্রভৃতি বিভিন্ন রূপান্তর ঘটে; এবং আজকাল চীনের বিভিন্ন প্রান্তে এই শব্দ 'ফু, ফো, ফাৎ, ফ্বাৎ' প্রভৃতি রূপে

উচ্চারিত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে চীনাদের কাছ থেকে বর্মীদের পূর্ব-পুরুষগণ ব্রহ্মদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থান-কালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, তখন বুদ্ধ-বাচক চীনা শব্দ 'ভুর' তাহারা শিখিয়া লয়; খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে যখন বর্মী-ভাষা ভারতীয় লিপিতে প্রথম লিখিত হয়, তখন বর্মীরা ইহা 'ভুরাঃ' রূপে লেখে; এখনও বর্মীতে ঐ বানানই প্রচলিত আছে, তবে উচ্চারণ বদলাইয়াছে—আরাকানে 'ভুরাঃ' উচ্চারিত হয় 'ফরা' রূপে ও ব্রহ্মের অন্যত্র 'ফয়া' রূপে। এইভাবে সংস্কৃত শব্দটীর বিকার, চীনাদের মধ্যে, ও চীনাদের কাছ থেকে ইহাকে লওয়ার পরে বর্মীদের মধ্যে, ঘটিয়াছে। চীনাতে যে অল্প কয়েকটী সংস্কৃত নাম গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির আধুনিক উচ্চারণে প্রায়ই এইরূপ বিকার দেখা যায়; যেমন, 'ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা' (বা ব্রাহ্মণ)= প্রাচীন চীনা উচ্চারণে 'ব্রম্' বা 'বম্', আজকাল 'ফান্', জাপানীদের মুখে 'বোন্' বা 'বোঙ্', 'যক্ষ (=যক্‌খ)', আধুনিক চীনায় 'য়াৎ-সেন্' (চীনা জন-নায়ক সুন্ য়াৎ-সেন্-এর ব্যক্তি-গত নামে এই সংস্কৃত শব্দটীই দেখা যায়—'সুন্'-বংশীয় 'য়াৎ-সেন্' বা 'যক্ষ' অর্থাৎ 'দেব'); 'সংঘ'='স্যঙ্'; 'অমিতবুদ্ধ' (অমিতাভ)='ও-মি-তো-ফু'; 'ব্রাহ্মণ'=প্রাচীন চীনা 'বা-লা (বা রা)-মন্'=আধুনিক 'পো-লো-ম্যান্'; 'ধ্যান' (প্রাকৃত 'ঝাণ')=আধুনিক উচ্চারণে 'ছান্' ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ সংস্কৃত শব্দ সংখ্যায় অতি অল্প; চীনাদের চেয়ে বরং জাপানীরা পরে আরও সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, এখনও করিতেছে। চীনারা নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীদের নাম পাঠ করে; এইজন্য শত-শত অনূদিত সংস্কৃত নাম ও শব্দ চীনা ভাষায় প্রচলিত থাকিলেও, সেগুলি আত্মগোপন করিয়া থাকে। 'অশ্ব-ঘোষ'-কে 'না-হেঙ্' (অর্থাৎ 'ঘোড়ার হ্রেষা') বলিলে, 'তথা-গত'-কে 'ঝু-লাই' (অর্থাৎ 'সেই-পথে যিনি-গিয়াছেন') বলিলে, 'অবলোকিত-স্বর (=অবলোকিতেশ্বর)'-কে 'কুআন্-য়িন্' (অর্থাৎ 'যিনি কণ্ঠস্বরের দিকে অবলোকন করেন'), 'ধর্ম-সিংহ'-কে 'ফা-শিঃ', অথবা 'ক্ষিতি-গর্ভ'-কে 'তী-ৎসাঙ্' বলিলে, সংস্কৃতজ্ঞ কাহারও পক্ষে চীনা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ধরা সম্ভবপর নহে। এই প্রাচীন রীতি—নামের অর্থের অনুবাদ, নামের ধ্বনি-নির্দেশ নহে—ধরিয়াই রবীন্দ্রনাথের চীনা-নামকরণ হইয়াছিল 'চূ চেন্-তান্' ('চূ' অর্থাৎ 'থিয়েন্-চূ'='সিন্ধু'-দেশ, India, ভারতবর্ষ; 'তান্' অর্থাৎ সূর্য্যোদয় বা প্রভাতসূর্য্য=রবি; 'চেন্' অর্থাৎ বজ্র, বজ্রের দেবতা= ইন্দ্র)।

জাপান ও কোরিয়ার ভাষা এবং তোঙ্-কিঙ্-এর ভাষা চীনা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, কিন্তু চীনা হইতে সহস্র সহস্র শব্দ এই তিন ভাষায় গৃহীত হইয়াছে,

এবং চীন হইতে গৃহীত ভারতীয় (সংস্কৃত) শব্দ অথবা শব্দানুবাদ, এই তিন ভাষায় আগত এই-সমস্ত চীনা শব্দেরই অন্তর্গত। জাপানী ও কোরিয়ান ভাষায় ও তোঙ্-কিঙের ভাষায় এই শব্দগুলির উচ্চারণ আবার অন্য ধরণের হইয়া গিয়াছে। এইরূপ শব্দের খুঁটিনাটি বিচারের আবশ্যকতা নাই। তবে জাপানীরা নূতন করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা আরম্ভ করিবার ফলে এবং নূতন করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করায়, আজকাল কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সরাসরি সংস্কৃত হইতে জাপানীতে আসিয়া গিয়াছে। জাপানে দেবনাগরী অক্ষরে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, প্রধান-প্রধান উপনিষদ্ ও ভগবদ্-গীতারও অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত নামগুলির যথাসম্ভব প্রাচীন চীনা অনুবাদই ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন 'ধৃতরাষ্ট্র' = 'জি-কোকু' (= 'যিনি রাজ্যকে ধারণ বা রক্ষা করেন', চীনাতে 'তি-কুও')। আধুনিক জাপানীতে প্রচলিত কতকগুলি নবীন ও প্রাচীন কালে আগত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত —'বুদ্ধ' = প্রাচীন চীনায় 'বুধ্,' 'ভ্যুৎ', তাহা হইতে প্রাচীন জাপানীতে 'বুতু', আধুনিক জাপানীতে, উচ্চারণে 'বুৎসু' Butsu, লেখায় কিন্তু Butu 'বু-তু'; 'ব্রাহ্মণ' = 'বারামোঙ্'; 'বসিষ্ঠ' = 'বাশী'; 'যম' = 'য়েমা'; 'দুন্দুভি' = প্রাচীন জাপানীতে 'তুহুমি', আধুনিকে tsudzumi 'ৎসুদ্‌জুমি'; 'বৈরোচন' = 'বিরুশানা'; 'বৈদূর্য্য' = 'রুবি' (= 'লুরি', 'বেলুরি, বেলুরিয়' হইতে); 'সূত্র' = 'সুতারা'; 'বোধি' = 'বোদাই'; 'সঙ্ঘারাম' = 'গারাঙ্'; 'প্রজ্ঞা' = প্রাচীন জাপানীতে 'পান্‌ন্যা,' আধুনিকে 'হান্‌ন্যা'; 'ভিক্ষু, ভিক্ষুণী' = 'বিকু, বিকুনি'; 'সঙ্ঘ' = 'সো' (অর্থ, 'পুরোহিত'); 'বেদ' = 'বিদা'; 'মণ্ডল' = 'মান্দারা, মাদারা' (অর্থ—'বর্ণ-মণ্ডল, বিভিন্ন রঙ্গের সমাবেশ'); 'সমাধি' = 'সাম্মাই'; 'শ্রমণ' = 'শামোঙ'; 'পুণ্ডরীক' = 'হুন্দারিকে'; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই-সব শব্দ ও নাম বেশীর ভাগ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবতা ও ভাবাবলী সম্পর্কীয় শব্দ।

দ্বীপময় ভারতের যবদ্বীপীয়, বলিদ্বীপীয়, মালাই প্রভৃতি ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ স্থান করিয়া লইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দ, যথা শার্দূলবিক্রীড়িত, শিখরিণী, বসন্ততিলক প্রভৃতিও, যবদ্বীপীয় ও বলিদ্বীপীয় ভাষায় বিশেষ প্রচলিত, বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যে। খ্রীষ্টীয় এগারোর শতকের প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় মহাভারতের গদ্যানুবাদের আরম্ভ এইরূপ; ইহা হইতে প্রাচীনকালে যবদ্বীপে সংস্কৃতের প্রভাব অনুমান করা যাইবে—

হন প্‌য় মঙ্কে বুবুসেন্, ইকঙ্ কাল তন্ হন্ আদিত্য চন্দ্র নক্ষত্র বায়ু আকাশাদিক, প্রলয় রি বেকস্ সংহারকল্প, প্রাপ্ত হ্বঙ্ সর্গকাল প্রতিনিয়ত মিজিল্

স-প্রকার-এঙ্‌ ঙুনি ইচ্ছা সঙ্‌-হ্যঙ্‌ তিনুংঞান্‌ হন কতেকান্‌ শব্দ সংহারধর্ম, সঙ্‌-হ্যঙ্‌ শঙ্কর অতঃ কারণ-ঞান্‌ হন লাবন্‌ ভট্টারী দেহার্ধ, কারণ নির মপিসন্‌ লাবন্‌ ভট্টার ত্রিনেত্র শির, অন্‌ মুঙ্‌গ্‌ হি ঙ্‌ কৈলাশ-শিখর সদৃশ উত্তুঙ্গ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠ, সাক্ষাৎ মণ্ডলম্‌ স-ভুবন ইকা তঙ্‌ পর্যঙন্‌ স্থান সঙ্‌-হ্যঙ্‌।

দ্বীপময় ভারতে প্রাচীন ও আধুনিক কালে সংস্কৃতের প্রচলন ও প্রভাবের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি, আমার ‘দ্বীপময় ভারত’ পুস্তকে (যবদ্বীপ-বলিদ্বীপ ভ্রমণের কথায়) এ বিষয়ে উল্লেখ ও উদাহরণ মিলিবে। আমাদের দেশে হিন্দীর মত, মালাই-ভাষা দ্বীপময় ভারতে বহু-প্রচলিত। মালাই-জাতির লোকেরা এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে—আর তাহারা সংস্কৃত হইতে প্রাচীন কালের মত শব্দ গ্রহণ করে না, সংস্কৃতের চর্চা তাহাদের মধ্যে আর নাই, তাহারা এখন আরবী ফারসী, ইংরেজী, ওলন্দাজ প্রভৃতি সব ভাষা হইতে শব্দ লইয়া থাকে; তথাপি সংস্কৃত শব্দ মালাই ভাষাতে ভূরি-ভূরি এখনও ব্যবহৃত হয়; এমন কি, ‘আমি’-অর্থে যে শব্দ মালাই ভাষায় আজকাল প্রচলিত সেই saya ‘সায়া’ শব্দটী সংস্কৃত ‘সহায়’ শব্দের বিকার (‘আমি’ অর্থাৎ ‘আপনার সহায় বা আপনার দাস,’—এই বিনয়-প্রদর্শন হইতে ‘সহায়’ অর্থে ‘আমি’, যেমন ‘আমি’ না বলিয়া ‘দাস’ বলিয়া নিজেকে উল্লেখ করা)। মালাই-ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত—‘আগম (=ধর্ম), অল্প (গাফিলতি অর্থে), অংকার (=অহংকার, অর্থ—জবরদস্তী, অত্যাচার), আন্তারা (=অন্তর, পার্থক্য), আতাউ (=অথবা), বাহাসা, বাসা (=ভাষা), ব্যাক্তি (=ভক্তি, অর্থ—সুকৃতি, সেবা), বাংসা (=বংশ, জাতি), বিয়াসা (=অভ্যাস), বিজাক্‌সানা (=বিচক্ষণ, অর্থাৎ পণ্ডিত, জ্ঞানী), বিনাসা (=বিনাশ), বুতা (=ভূত), বুদি (=বুদ্ধি), বুমি (=ভূমি), চাহায়া (=ছায়া, অর্থ—তেজ, দীপ্তি), চেক্রাবালা (=দিক্‌-চক্রবাল), চিন্তা, চিন্তামানি (=চিন্তামণি, একরকম সাপ), চুকু (চুক্র=সিরকা), দক্‌সিনা (=দক্ষিণ দিক্‌), দেন্দা (=দণ্ড, জরিমানা), গেন্তা (=ঘণ্টা), হার্‌গা (=অর্ঘ, মূল্য), হাস্তা (=হস্ত, দৈর্ঘ্যের পরিমাণ), জেন্তেরা (=যন্ত্র), জেল্‌মা (=জন্ম), কারনা (=কারণ), কের্জা (=কার্য্য), কোসা (=অঙ্কুশ), মাহা (=মহান্‌), মাংসা (=মাংস), মেলাতি (=মালতীফুল), নাদি (=নাড়ী), নামা (=নাম), পাপা (=দরিদ্র, পাপ), পুতেরী (=পুত্রী, রাজকুমারী), রাজা, রূপা (=রূপ), সাক্‌সী (=সাক্ষী), সাক্‌তি (=শক্তি, ঐশী শক্তি), সেগেরা (=শীঘ্র), সেম্পুর্‌না (=সম্পূর্ণ), সেমুআ (=সমূহ), সেঞ্জাতা (সংজাত=অস্ত্র), সুর্গা (=স্বর্গ), উপায়া (=উপায়, পথ), ইত্যাদি।

ইন্দোচীনের মোন্ ও খ্মের এবং বর্মী ও শ্যামী ভাষায় ঐ প্রকার সংস্কৃত শব্দের আধিক্য দেখা যায়। দ্বীপময় ভারতের মতন এ অঞ্চলেও হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ) ধর্ম ভারতবর্ষেরই মত জনগণের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; রাজারা সংস্কৃত নাম গ্রহণ করিতেন, রাজার অনুশাসন সংস্কৃতে হইত, দেশ ব্রাহ্মণের আদর্শে পরিচালিত হইত। মোন্ ও খ্মের জাতি প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করে, পরে বর্মী ও শ্যামীরা ইহাদের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হয়। মোন্ ও খ্মের ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে, কিন্তু এগুলি প্রায় সব সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত অবস্থায়। প্রাচীন মোন্ ভাষা হইতে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের উদাহরণ দিতেছি; আধুনিক মোন্ ভাষায় এগুলি আরও বিকৃত হইয়া গিয়াছে ; যথা—'কাল' = 'কাল্'; 'শাস্ত্র' = 'সাস্'; 'আরাধনা' = 'রাধনা'; 'প্রতিসন্ধি' = 'পতিসন্'; 'শীল' = 'সীল্'; 'ইন্দ্র' = 'ইন্'; 'উদ্যান' = 'উদ্যা'; 'ব্রাহ্মণ' = বুংনঃ'; 'মনুষ্য' = 'মনিস্'; 'নারদ' = 'নার্'; 'ধর্ম্ম' = 'ধর্'; 'মাণিক্য' = 'মনিক্'; 'রত্ন, রতন' = 'রৎ'; 'নগর' = 'নগির', আধুনিক মোন্ 'নাগোও'; 'দোষ' = দোস্'; 'অভিষেক' = 'বিসেক্'; 'শঙ্খ' = 'সং', ইত্যাদি। কম্বোজের খ্মের ভাষার সংস্কৃত শব্দের কতকগুলি দৃষ্টান্ত, যথা; 'ইন্দ্র' = 'ইন্, এইন্', 'গর্ভ' = 'কের্', 'অঙ্গ' = 'অং', 'দেবতা' = 'তেপ্‌দা', 'পুরুষ' = 'প্রোস্,' 'বংশ' = 'বং', 'লোভ' = 'লোপ্', 'শাসন' (ধর্ম-অর্থে)' = 'সাস্', 'স্বর্গ' = 'স্বর্', 'বাক্' = 'পেআক্', 'নগর' = 'অঙ্কর', 'কাব্য' = 'কাপ্', 'শ্বেতচ্ছত্র' = 'স্বেতছৎ', পালি 'অসসম' (আশ্রম) = 'অসম্', ইত্যাদি।

শ্যামী বা থাই জাতির লোকেরা বৌদ্ধ, জাপানীদের হাতে যাওয়ার পূর্বে সেদিন পর্য্যন্ত ইহারা স্বাধীন ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশ ভ্রমণ-কালে সেখানকার একজন রাজপুরুষ আমায় বলিয়াছিলেন—'জাতিতে বা রক্তে আমরা চীনাদের জাতি, কিন্তু ধর্মে ও সভ্যতায় আমরা ভারতীয়। শ্যাম-রাজ্যের সমস্ত কার্য্যে এখনও ভারতের ছাপ, সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। কম্বোজের খ্মের জাতির মধ্যেও তাই। ভৌগোলিক নাম বর্মা হইতে কাম্বোদিয়া পর্য্যন্ত অধিকাংশই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। বর্মী ও শ্যামী এবং মোন্ ও খ্মের ভাষায় এখনও উচ্চভাবের শব্দ সমস্তই প্রায় সংস্কৃত ও কচিৎ পালি হইতে লওয়া হয়। বর্মীদের প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকার নাম 'সূর্য্য' (পালি 'সুরিয়', বর্মী উচ্চারণে 'থুয়িয়া'); জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের 'গালোন্' অর্থাৎ 'গরুড়' নামে অভিহিত করে। শ্যামী বা থাই জাতির রাজাদের নাম সংস্কৃত; 'আনন্দ মহীদল' 'প্রজাধিপক', 'বজ্রায়ুধ', 'চূড়ালঙ্করণ', 'মহামুকুট'; রাজবংশের নাম 'মহাচক্রী' বংশ। রাজ্যের নানা বিভাগের

পদবী সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত—'রথচারণপ্রত্যক্ষ' (=রেল-বিভাগের ট্রাফিক-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্), 'বারিসীমাধ্যক্ষ' (=জলসেচ-বিভাগের পরিদর্শক), 'বিজিতরাজ-ভৃত্যাধিকার' (রাজার খাস বিভাগের কর্মচারীর খেতাব)। সাধারণ বহু বস্তুর নামও সংস্কৃত—'আকাশযান' (উচ্চারণে 'আগাৎ-ছান্') =বিমান বা হাওয়াই জাহাজ, 'দূরশব্দ' (উচ্চারণে 'থুরা-সাপ্') =টেলিফোন, 'শতাংশ' (উচ্চারণে 'সিতাঙ্') = 'সেণ্ট' নামে মুদ্রা, টিকল্ বা বাৎ অর্থাৎ শ্যামী টাকার শতভাগের এক ভাগ। এই সব সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ-বিকৃতির জন্য কানে শুনিয়া ধরা মুশ্কিল হয়, কিন্তু শ্যামী বর্ণমালায় লিখিত রূপ দেখিয়াই এগুলি কোন্ ভাষার তাহা সহজে বুঝা যায়। 'অরণ্য-প্রদেশ'-কে 'আরাঞ্-পাথেৎ,' 'সমুদ্র-প্রাকার'-কে 'সমুৎ-বাথান', 'ব্রজপুরী'-কে 'ফেচাবুরী', 'রাজপুরী'-কে 'রাৎবুরী' রূপে উচ্চারণ করায়, এই শব্দগুলির স্বরূপকে লুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। শ্যামদেশে বিদেশী (ইউরোপীয়) পারিভাষিক শব্দাবলীর জন্য শ্যামী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত হইতে নূতন করিয়া পারিভাষিক শব্দ আবশ্যক-মত গঠন করিয়া শ্যামী ভাষায় প্রয়োগ করিতেছেন। এইরূপ কতকগুলি শব্দ আমাদের দ্বারায়ও বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতিতে গৃহীত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, 'এক শ্যামী বিদ্যার্থী' রচিত প্রবন্ধ, কলিকাতার 'বিশাল ভারত' নামক হিন্দী পত্রিকার ১৯৪১ সালের জুন মাসের সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয় ; পরে কাশীর 'নাগরী প্রচারিণী সভা পত্রিকা'র শ্রাবণ ১৯৯৮ সংবতের, ৪৬ খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায়, এই প্রবন্ধ আলোচিত হইয়াছিল।

সিংহলের সিংহলী ভাষা আমাদের বাঙ্গালা হিন্দী গুজরাটী মারাঠীর মতই আর্য্যভাষা ; ইহাতে বরাবরই ভারতীয় সংস্কৃত ও পালি এবং সংস্কৃতের প্রভাব অব্যাহত ছিল। সিংহলী ভাষার উচ্চ ভাবের প্রায় তাবৎ শব্দ সংস্কৃতের। প্রাচীন মধ্য-এশিয়ার তোখারী ভাষা ও খোতনী ভাষা, সংস্কৃতের মত ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্য ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সংস্কৃতের জ্ঞাতিই ছিল। এই দুইটিতে ভারতবর্ষীয় লিপি ব্যবহৃত হইত, সেইজন্য সংস্কৃত শব্দের আগমন সহজ ছিল। কিন্তু এগুলিতেও সংস্কৃত শব্দ, স্থানীয় উচ্চারণ-মত বিকৃত হইত। খ্রীষ্ট-জন্মের পরে কয়েক শতক ধরিয়া উত্তর-ভারতে সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের যে উচ্চারণ ছিল, তৎসম্বন্ধে, খোতনী ও তোখারী ভাষায় বর্ণ-বিন্যাস-রীতি এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের পরিবর্তনের ধারা বিচার করিয়া, আমরা কতকটা আভাস পাইতে পারি। খোতনের পূর্বে 'ক্রোরৈন' নামে একটী রাজ্য ছিল ; এখানে, এবং খোতনে, উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে আগত হিন্দুদের উপনিবেশ ছিল ; সেইজন্য তাহাদের ভাষা—উত্তর-

পশ্চিমের প্রাকৃত—এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং খরোষ্ঠী বর্ণমালায় লিখিত রাজকীয় দলিল-পত্রে সরকারী ভাষা হিসাবে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের এবং পরের কয়েক শতক ধরিয়া এই প্রাকৃত পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে তুর্কী-ভাষী লোকদের প্রসারের ফলে মধ্য-এশিয়ায় তোখারী, খোতনী এবং উত্তর-পশ্চিমীয় প্রাকৃত—এই তিনটী আর্য্য ভাষার বিলোপ ঘটে। এখন কেবল প্রাচীন নগর-সমূহের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত এই-সব ভাষায় লিখিত কাগজ-পত্রে ও লেখা-সমূহে প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় ভাষার (বিশেষ করিয়া সংস্কৃতের) প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যায়।

তিব্বত মধ্য-এশিয়ারই অংশ, কিন্তু তিব্বতের ভাষা চীনের ভাষার সহিত সম্পৃক্ত, ইহা অনার্য্য ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষা। তিব্বতীরা ভারতীয় বর্ণমালা গ্রহণ করায়, ইহাদের ভাষাতে সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় শব্দের প্রবর্তন সহজ-সাধ্য ছিল। কিন্তু জ্ঞাতি চীনাদের প্রদর্শিত পথেই তিব্বতীরা চলিল ; ইহারা সংস্কৃত শব্দ ও নাম গ্রহণ না করিয়া, চীনাদের মতন এই শব্দ ও নাম-সমূহের তিব্বতী অনুবাদই ব্যবহার করিতে লাগিল। বড়-বড় এবং কঠিন-কঠিন সংস্কৃত বই, পূরাপূরি নিজেদের শব্দ দিয়া, একটিও সংস্কৃত শব্দ ধার না করিয়া, ইহারা অনুবাদ করিতে লাগিল। ভাব লইল, ভাষা লইল না। তিব্বতীদের মধ্যে সম্ভবতঃ মুখে-মুখে গান, গাথা বা গদ্য-কাব্য প্রচলিত ছিল, একটা জাতীয় সাহিত্য ও সুনির্দিষ্ট শব্দ-গঠন-রীতি তাহাদের ছিল। সেইজন্য হয় তো ইহারা বিদেশী সংস্কৃতের শব্দ ধার করা আবশ্যক মনে করে নাই। এই হেতু চীনাদের মত ইহাদের মধ্যেও ভারতীয় নাম-সমূহ অনুবাদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। যেমন—'বুদ্ধ' এই নামটিকে ইহারা অনুবাদ করিল 'সঙ্‌স্‌-গ্য্যল্‌' অর্থাৎ 'জাগ্রত (=বুদ্ধ) রাজা' (আজকালকার উচ্চারণে 'সেঙ্‌-জে' রূপে এই শব্দটী বলা হয়) ; 'প্রজ্ঞাপারমিতা' = 'শস্‌-রব্‌-ক্‌-রোল্‌-তু' ; 'অমিতাভ' = 'ঃওদ্‌-দ্‌পগ্‌-মেদ্‌' (আজকালকার উচ্চারণে 'ও্য-প্যা-মে') ; 'বিষ্ণু' = 'খ্যব্‌-জুগ্‌' ; 'ভারত' = 'গ্য-গর্‌' ; 'সরস্বতী' = 'দ্‌ব্যঙ্‌স্‌-চন্‌-ম' ; 'অবলোকিতেশ্বর' = 'স্প্যন্‌-রস্‌-গ্‌জিগ্‌স্‌' (আধুনিক = 'চেন্‌-রে-সি'), 'তারা' = 'স্‌গ্রোল্‌-ম' (= 'ডোল্‌-মা') ; ইত্যাদি। কিন্তু এত করিয়া ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিলেও, 'গ্য-গর্‌-স্কদ্‌' অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার মোহে ইহারা বেশ পড়িয়াছিল ; তিব্বতীদের পূজা-পাঠে সংস্কৃত মন্ত্র কিছু-কিছু ব্যবহৃত হয়, এবং 'ওঁ মণি পদ্মে হুং' মন্ত্রটীকে তো তিব্বতী বৌদ্ধদের সর্বত্র এবং সর্বজন-কর্তৃক ব্যবহৃত জাতীয় মন্ত্র বলা চলে।

মোঙ্গোল ও তুর্করাও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে; তুর্করা এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মোঙ্গোলদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় ধর্ম বজায় আছে, তবে তাহারা তিব্বতীদের কাছ হইতে এই ধর্ম পায় বলিয়া, তাহাতে সংস্কৃত অপেক্ষা ভোট-ভাষা বা তিব্বতীর প্রভাবই বেশী। তুর্কীদের প্রাচীন ভাষাতে দুই-চারিটা মাত্র সংস্কৃত শব্দ ও নাম পাইয়াছিল, তাহারা তিব্বতীদের ও চীনাদের মত শব্দ ধার-করার চেয়ে শব্দ সৃষ্টি-করার দিকেই বেশী ঝুঁকিত। তুর্কীদের ভাষাতে আগত দুইটি সংস্কৃত শব্দ পারস্য-দেশ ঘুরিয়া ফারসী শব্দ রূপেই ভারতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে; একটী সংস্কৃতের 'ভগধর' শব্দ, 'ভাগ্যবান' বা 'শ্রেষ্ঠ পুরুষ' ও পরে 'বীরপুরুষ' অর্থে; তুর্কীতে ইহার 'বগদির্', 'বগাদির্' প্রভৃতি বিকার ঘটে, ও শেষে ঈরানে ইহা 'বহাদুর' শব্দে পরিণত হয়; আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় আমরা ফারসী হইতে ইহাকে 'বাহাদুর' রূপে গ্রহণ করিয়াছি। আর একটী শব্দ হইতেছে 'ভিক্ষু' শব্দ; তুর্কী ও মোঙ্গোল ভাষায় ইহার একটী রূপ হয় 'বাক্শী'। আগে নিরক্ষর যাযাবর তুর্কী ও মোঙ্গোলদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন হইতেন, এবং গতিকে তাঁহারাই সরকারী হিসাব-পত্র রক্ষার জন্য (বিশেষতঃ ফৌজের কাজে) নিযুক্ত হইতেন। ক্রমে শব্দটীর অর্থ দাঁড়াইয়া গেল, 'হিসাব-নবীশ', এবং ফারসীতে ইহার বিশেষ অর্থ দাঁড়াইল, 'সৈন্যদলের খাজাঞ্চী'। (ইংরেজী clerk অর্থাৎ কেরানী শব্দের উৎপত্তিও অনুরূপ—ইহা মূলে cleric অর্থাৎ 'সাধু বা সন্ন্যাসী' শব্দ হইতে।) ফারসীতে এই শব্দ 'বখ্শী' রূপ ধারণ করিল, এবং 'বখ্শী' হইতে আমাদের বাঙ্গালা পদবী 'বক্শী' বা 'বক্সী'।

মধ্য- ও উত্তর-এশিয়ায় এবং পূর্ব- ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তথা দ্বীপময় ভারতে যে ভাবে সংস্কৃত ভাষা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বাহন হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ইন্দোচীন, দ্বীপময় ভারত ও সিন-কিয়াঙে যে ভাবে সংস্কৃত প্রায় দেব-ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, ঈরানে (পারস্যে) সে ভাবে সংস্কৃতের প্রসার বা প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। সংস্কৃতের মাতৃস্থানীয়া ইন্দো-ঈরানীয় বা আর্য্যভাষা প্রথমটায় উত্তর-ইরাকে ও এশিয়া-মাইনরের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ও পরে স্থানীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, একথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ভারতে সংস্কৃতের প্রতিষ্ঠার পরে, ভারতীয় আর্য্যদের নিকট জ্ঞাতি ঈরানীরা, Akhaimenes বা হখামনীষীয়-বংশের সম্রাট্দের সময়ে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র দিকে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজা হইয়া বসে; রাজার ভাষা বলিয়া তাহাদের ভাষার প্রভাব, ভারতের ভাষা প্রাকৃতের উপরে কতকটা পড়িয়াছিল; কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব প্রাচীন পারসীকে

বা অবেস্তার ভাষায় বিশেষ করিয়া পড়ে নাই।

তাহার পরে গ্রীকদের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয়—দিগ্‌বিজয়ী গ্রীকসম্রাট্ আলেক্সান্দরের অধীনে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র স্থাপন করে, গ্রীক রাজারা কয়েক শতক ধরিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বাহ্লীকে এবং ঈরানে রাজত্ব করেন; তখন গ্রীক ভাষা ও ভারতীয় ভাষার মধ্যে লেন-দেন চলিয়াছিল—কিছু-কিছু গ্রীক শব্দ আমাদের প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে আসে, এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ গ্রীকেও যায়। তবে গ্রীকদের কাছ থেকে, পশ্চিম হইতে আমদানী কতকগুলি জিনিসের নাম ছাড়া, জ্যোতিষের কতকগুলি শব্দ সংস্কৃতে আসিয়াছিল; কিন্তু ভারত হইতে পশ্চিমে রপ্তানী হইত এমন কতকগুলি বস্তুর নাম ছাড়া, কোনও দর্শন বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শব্দ গ্রীকেরা সংস্কৃত হইতে লয় নাই। কস্তীর (=টিন, গ্রীকে 'কাস্‌সিতেরোস্'), মুষ্ক (=কস্তুরী, মৃগনাভি, গ্রীকে 'মোস্‌খোস্'), শর্করা (গ্রীকে 'সাক্‌খারোন্'=প্রাকৃত সক্করা'), তমালপত্র (গ্রীকে 'মালাবাথ্রোন'), 'কটুকফল' (গ্রীক 'কারুওফুল্লোন্', প্রাকৃত 'কডুঅফল')' 'ব্রাহ্মণ' (গ্রীকে 'ব্রাখ্‌মানেস্') প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ মাত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ শর্করার দেশ; আখ হইতে রস বাহির করিয়া তাহা হইতে গুড় ও চিনি তৈয়ার করা ভারতবর্ষই প্রথম আবিষ্কার করে, এবং পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ভাষায় চিনি ও মিসরীর নাম ভারতের 'শর্করা' ও 'খণ্ড' এই দুইটি সংস্কৃত শব্দের বিকার হইতে জাত (যেমন ইংরেজী sugar-candy, ফারসী 'শকর-কন্দ'='শর্করা-খণ্ড'); কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আমরা ভারতের এই দুই নিজস্ব বস্তুকে বিদেশী বস্তু বলিয়া অভিহিত করি—'চিনি' অর্থে চীনদেশ-জাত বস্তু,—চীনী', এবং 'মিসরী' অর্থে 'মিসরদেশ-জাত'।

খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম সহস্রকে ভারতের সঙ্গে ঈরানের ঘনিষ্ঠ যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দুই দেশের মধ্যে অব্যাহত ছিল। ইহার পরে মুসলমান যুগে ফারসী ও আধুনিক পারসীক ভাষা, তুর্কী ও ঈরানী বিজেতার সরকারী ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল; তখন ফারসীই নিজে উত্তর-ভারতের ভাষাসমূহের উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম সহস্রকে এবং তাহার পরে সংস্কৃত ও প্রাকৃত তথা আধুনিক ভারতীয় ভাষার শব্দ ফারসীতেও গৃহীত হইয়াছে—বিশেষ করিয়া ভারতীয় বস্তুর নাম, যে-সব বস্তু ভারতের পশ্চিমে রপ্তানী হইত। ফারসীতে নীত এইরূপ ভারতীয় অথবা সংস্কৃত শব্দের নমুনা—'শকর্'=শর্করা, 'কির্‌বাস্'=কার্পাস, 'বুৎ'=মূর্তি, 'বুদ্ধ'-মূর্তি, 'নারগীল' (নারিকেল), 'শমন্' (শ্রমণ, বৌদ্ধ পুরোহিত), 'বরহ্‌মন' (ব্রাহ্মণ),

'সমন্দর্' (সমুদ্র), 'চন্দন', 'লক্' (=লাক্ষা, গালা), 'নীল্', 'ববর্' (=ব্যাঘ্র), 'শত্রঞ্জ্, চত্রঙ্গ্' (=চতুরঙ্গ), 'শাঘল্' (=শৃগাল), 'রায়্' (=প্রাকৃত রাঅ, রায়=রাজা), ইত্যাদি। আবার এইরূপ শব্দ দুই-চারিটা আরবীতেও গিয়া পহুঁছিয়াছে, যেমন 'নারজীল' (=ফারসী নারগীল্=নারিকেল), 'শকর' (=শর্করা), 'কাফূর' (=কর্পূর), 'সন্দল' (=চন্দন), 'মিস্ক' (=মুষ্ক, মৃগনাভি), 'জনজাবীল' (=আদা, সংস্কৃত 'শৃঙ্গবের'), ইত্যাদি। গণিতে ও জ্যোতিষে এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় ভারতবর্ষ মধ্য-যুগের ঈরান ও আরবের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু যদিও ভারতীয় (সংস্কৃত) পুস্তক-সমূহ পহ্লবী ও আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল, ভারতীয় শব্দ তেমন পহ্লবী ও আরবীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ক্বচিৎ ভারতীয় নাম বিকৃত অবস্থায় আরবী ও ফারসীতে স্থান পাইয়াছে, ইহা সত্য বটে; যেমন 'করটক-দমনক', পহ্লবীতে 'কললগ্-দমনগ্', আরবীতে 'কলিলহ্-দিম্নহ্'; 'বিদ্যাপতি' (প্রাকৃত বিদ্দাপই)='বিদ্পয়্, বিদ্বয়্'; 'সিদ্ধান্ত ='সিন্দ্হিন্দ', 'চরক'='স্বনক্ক', ইত্যাদি। মুসলমান ধর্মের গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সূফী সাধকগণের সাধনা, দর্শন ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সূফী মতবাদের উৎপত্তিতে একদিকে যেমন আরবের 'তৌহীদ' অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর সাধনা ভিত্তি-স্বরূপ ছিল, তেমনি অন্য দিকে গ্রীসের দার্শনিক প্লাতোন্-এর চিন্তা ও তদনুবর্তী নব্য-প্লাতোনীয়দের মতবাদ ইহার মধ্যে দার্শনিকতা আনিয়া দেয়; এবং ইহার বিশিষ্ট কথা, Pantheism বা সর্বভূতে-ব্রহ্ম-বাদ, বিশ্বপ্রপঞ্চ-মধ্যে ব্রহ্মসত্তা সদা ক্রীড়মাণ, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম মূলে এক, বিশ্বসৃষ্টি পরব্রহ্মের লীলা মাত্র, এইরূপ উপলব্ধি, ভারতের ব্রাহ্মণ্য চিন্তার দান, অথবা ব্রাহ্মণ্য চিন্তার বেদান্তের প্রভাবের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে অনুরঞ্জিত। কিন্তু এই-সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব (অন্ততঃ আংশিক ভাবে) ভারত হইতে সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন খ্রীষ্টীয় ৯০০-র পরে প্রসারিত হয়, তখন সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলী আরবী ও ফারসী ভাষাতে গৃহীত হয় নাই। আরবী ভাষা বাহিরের শব্দ সিরীয়, ফারসী (পহ্লবী) ও য়ুনানী (গ্রীক) হইতে প্রচুর পরিমাণে লইয়াছে; কিন্তু মাঝে ফারসীর ব্যবধান থাকায়, সংস্কৃত শব্দ সোজাসুজি আরবীতে স্থান লাভ করিতে পারে নাই; আর ফারসী তখন সম্পূর্ণ রূপে আরবীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার প্রসাদোপজীবী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং মধ্য-যুগে, ভারতের পশ্চিমে ভারতের বিজ্ঞান ও দর্শন অল্প-বিস্তর প্রসৃত হইলেও, ভারতের ভাষা সংস্কৃত সেরূপে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই; আরবী ও ফারসীর পৃষ্ঠপোষক মুসলমান তুর্কী ও ঈরানীদের ভারত-

বিজয়ের ফলে সংস্কৃত ভাষা, বিজিত, মূর্তিপূজক ও বিজেতার চোখে হেয় হিন্দু জাতির ভাষা বলিয়া, ঈরানী তুর্কী ও আরবের কাছে আর তাহার যোগ্য সমাদর পায় নাই। (অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ অল্-বীরূনীর মত দুই-চারিজন উদার-হৃদয় পণ্ডিতের কথা আলাদা।) এই হেতু, পূর্ব এশিয়ার মত পশ্চিম-এশিয়ায় সংস্কৃতের জয়জয়কার ঘটিতে পারে নাই।

এইরূপে তিন হাজার বৎসর ধরিয়া সংস্কৃতের গতি এশিয়া-খণ্ডে চলিয়াছিল। শ্রেষ্ঠ সভ্যতার ভাষা হিসাবে, মৌলিক দৃষ্টি ও চিন্তার ভাষা হিসাবে, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অবলোকন ও প্রকাশের ভাষা হিসাবে, পৃথিবীতে তিনটী ভাষার স্থান আছে—সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা। আরবী মুখ্যতঃ গ্রীক সভ্যতা এবং গ্রীক দৃষ্টি ও চিন্তার বাহন; আরবীতে নিহিত আধ্যাত্মিক অবলোকন ও প্রকাশ, জগতে নূতন বস্তু ছিল না। এই হিসাবে সংস্কৃত ভাষা সভ্যতার ও সচ্চিন্তার পোষণে সহায়তা করিয়াছে; ও ইহাতে ভারতের মর্য্যাদার বৃদ্ধি করিয়াছে। সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়া চীনারা নিজ ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়া দেয়, প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে; সংস্কৃতের বর্ণমালা দেখিয়া কোরিয়ান ও জাপানীরা নিজেদের ভাষার জন্য ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণমালার উদ্ভাবন করে। সংস্কৃতের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় বর্ণমালা মধ্য-এশিয়ায়, ইন্দোচীনে ও দ্বীপময় ভারতে বহু জাতি কর্তৃক গৃহীত হয়।

আজকাল নূতন করিয়া ইউরোপে এবং অন্যত্র সংস্কৃতের ও সংস্কৃত বিদ্যা, সংস্কৃত চিন্তার আলোচনার ফলে, সংস্কৃত দার্শনিক ও অন্যবিধ শব্দ এখন বিশ্বমানবের ভাষার সাধারণ ভাণ্ডারে উপনীত হইতেছে। আধুনিক কালে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার চর্চার প্রথম ফল—আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের উদ্ভব, আর্য্য জাতির পরিকল্পনা। 'গুণ, বৃদ্ধি, স্বরভক্তি, সন্ধি, সমাস, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ' প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাকরণের শব্দ এখন আন্তর্জাতিক হইয়া গিয়াছে। রুষ রসায়নবিৎ Mendelyef মেন্দেল্যেফ তাঁহার আবিষ্কৃত Periodic Law বা 'পর্য্যায়-সূত্র' নামক বিশেষ সূত্রে সংস্কৃতের 'এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ' প্রভৃতি সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। 'ধর্ম', 'কর্ম', 'সংসার', 'অহিংসা', 'বুদ্ধ', 'নির্বাণ', 'বোধি', 'ব্রহ্মা' ও 'ব্রহ্মন্', 'শিব', 'নটরাজ', 'শক্তি', 'অবতার', 'আত্মন্', 'স্বরাজ', 'স্বস্তিক', 'স্বদেশী', 'মহাযান', 'হীনযান', 'বেদ', 'বেদান্ত, 'উপনিষদ্' প্রভৃতি শব্দ, পৃথিবীর সর্ব-জাতির শিক্ষিত-সমাজে সুপরিচিত হইতেছে। সেদিন একখানি জাপানী 'নূতন শব্দের অভিধানে' (A Dictionary of New Terms)-এ আমাদের 'স্বরাজ, স্বদেশী, সত্যাগ্রহ,

বন্দে-মাতরম্' শব্দগুলিও স্থান পাইয়াছে দেখিলাম। এ-সমস্ত শব্দ আজকাল পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মারফৎ বিশ্বজনের সমক্ষে গিয়া পড়িতেছে। এই প্রকার আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ ছাড়া, ভারতীয় (সংস্কৃত ও অন্য) অপর বহু শব্দ গত ৪৫০ বৎসর ধরিয়া, পোর্তুগীস ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজদের মারফৎ ইউরোপে নীত হইয়াছে ; সেগুলির বিষয় এই প্রসঙ্গে বিচার্য্য নহে ॥

[কার্ত্তিক ১৩৫০]

দ্রাবিড়

'দ্রাবিড়' শব্দটী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—[১] সঙ্কুচিত অর্থে, 'দ্রাবিড়' (বা 'দ্রবিড়' অথবা 'দ্রমিড়') শব্দ 'তমিল্'-শব্দ-বাচী, এই অর্থে উহা কেবল দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের তমিল ভাষা ও তমিল জাতিকে বুঝাইয়া থাকে ; আর [২] প্রসারিত অর্থে, 'দ্রাবিড় (দ্রবিড়, দ্রমিড়)' শব্দ দ্বারা দক্ষিণ- ও মধ্য- এবং পশ্চিম-ভারতে অবস্থিত একটী বিশাল ভাষা-গোষ্ঠী ও সেই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা-সমূহ যাহারা বলে, তাহাদের বুঝায়। সংস্কৃত সাহিত্যে 'দ্রাবিড় (দ্রবিড়, দ্রমিড়)' শব্দ সঙ্কুচিত অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়—দক্ষিণ-ভারতের চারিটী সুসভ্য দ্রাবিড়-ভাষী জাতি, তেলুগু, কানাড়ী, তমিল, মালয়ালী, সংস্কৃতে যথাক্রমে 'অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড়, কেরল' নামে পরিচিত। সংস্কৃতে 'পঞ্চ-দ্রাবিড়' বলিলে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পাঁচটী আর্য্য ও অনার্য্য ভাষী বড়-বড় জাতিকে বুঝায়—দ্রাবিড় বা তমিল-মালয়ালী, অন্ধ্র, কর্ণাট, গুর্জর, মহারাষ্ট্র। এই 'পঞ্চ-দ্রাবিড়' শব্দ, উত্তর-ভারতের 'পঞ্চ-গৌড়' শব্দের যেন দক্ষিণী প্রতিরূপ। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে, পৃথিবীর আর সমস্ত ভাষাগুলির মত এই ভাষাগুলিও দেবভাষা সংস্কৃতের বিকারে জাত ; 'দ্রাবিড়' বলিয়া, সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর কল্পনা তাঁহাদের মনে আসে নাই। এখনও দ্রাবিড়-দেশে তেলুগু -কানাড়ী-তমিল-মালয়ালম্ প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী পণ্ডিত দুইচারিজন মনে করেন যে, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন একটী দক্ষিণ-ভারতীয় সুপ্রাচীন যুগের প্রাকৃত হইতেই দ্রাবিড় ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। এই মত প্রমাণের জন্য ইংরেজীতে ইহারা পুস্তক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত করিয়াছেন ; কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ এই মত গ্রহণ করেন নাই।

সংস্কৃত, প্রাচীন-ঈরানীয়, গ্রীক, লাতীন, গথিক্, প্রাচীন-আইরিশ, হিত্তী, প্রাচীন-স্লাব, প্রভৃতি ভাষার তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যার পত্তন করিলেন। আদিম বা মূল আর্য্য ভাষার প্রকৃতি ও রূপ তাঁহাদের হাতে ধীরে ধীরে সুনির্ধারিত হইল। বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি-গত ঐক্য বা সাম্য অথবা অনৈক্য বা বৈষম্য বিচার করিয়া, পৃথিবীর তাবৎ প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাকে কতকগুলি পৃথক্-পৃথক্ ভাষা-গোষ্ঠীতে বা ভাষা-গোত্রে বিভক্ত করার আবশ্যকতা স্বীকৃত হইল। কতকগুলি বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীতে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার বর্গীকরণের চেষ্টা হইল। ইহার ফলে, ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি-আর্য্য, শেমীয়, হামীয়, ও তৎসঙ্গে উরাল-আল্‌তাই, ভোট-চীন, শুদ্ধ-নিগ্রো, বাণ্টু-নিগ্রো প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা-গোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যায় কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। বিগত খ্রীষ্টীয় উনিশের শতকের মাঝামাঝি, ভারতবর্ষের দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী-ও সুনির্ধারিত হইল—Dravidian বা 'দ্রাবিড়' শব্দটী তখন ভারতের একটী বিশিষ্ট শ্রেণীর ভাষাবলীর নাম হিসাবে ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ রবার্ট কাল্‌ড্‌ওয়েল তাঁহার সুবিখ্যাত 'দ্রাবিড় ভাষাবলীর তুলনা-মূলক ব্যাকরণ' পুস্তক প্রকাশিত করিলেন, ইহাতে দ্রাবিড় ভাষাতত্ত্ব বিশিষ্ট রূপ লইয়া দেখা দিল।

তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার ফলে ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, আদি আর্য্য ভাষা সুপ্রাচীন কালে ভারতের বাহিরে কোনও দেশে কথিত হইত,—যদিও সেটী কোন্ দেশ, এবং সেই কাল কত প্রাচীন, তাহা অবিসংবাদিত রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই; তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিশেষজ্ঞগণের অধিকাংশের মত এই যে, মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোনও অংশে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০০ বর্ষের দিকে এই আদি-আর্য্য-ভাষা প্রতিষ্ঠিত ছিল,—এবং পরে আর্য্য-ভাষী জনগণ তাহাদের আদিম পিতৃভূমি হইতে প্রসৃত হইয়া উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে এবং পশ্চিম এশিয়ায় গমন করে, এশিয়া-মাইনর হইয়া ঈরান ও ভারতবর্ষে আগমন করে। প্রথমটা ইউরোপের ভাষাতাত্ত্বিক ও অন্য পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, মধ্য-এশিয়া-ই ছিল আদিম আর্য্যদের পিতৃভূমি, সেখান হইতেই ঈরান ও ভারতে এবং পশ্চিমে ইউরোপের নানা দেশে ইহারা ছড়াইয়া পড়ে। তখনকার দিনে, অর্থাৎ এখন হইতে ৮০।১০০ বৎসর পূর্বে, যখন এই মত প্রতিষ্ঠিত হয় তখন, মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে খবর বেশী জানা না থাকায়, সে-দেশ লইয়া নানা কল্পনা চলিত; কিন্তু এখন নানা নূতন তথ্যের আবিষ্কারের ফলে, মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে অনেকেই আর আস্থাবান্ নহেন; পৃথিবীর অন্য কোনও অংশকেই আর্য্য পিতৃভূমি বলিয়া স্বীকার

করিবার সঙ্গততর কারণ দেখা দিয়াছে। যাহা হউক, আগেকার জ্ঞান-গোচর এবং কল্পনা-মতে, মধ্য-এশিয়া হইতে আর্য্যেরা ভারতে আসিল; তাহারা সুসভ্য শ্বেতকায় জাতি, উচ্চ সভ্যতা ও মনোভাব লইয়া, ভারতে আদিম অধিবাসী অসভ্য কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া এদেশে রাজা হইয়া বসিল। আর্য্যেরা অনার্য্যদের অনায়াসেই নিজেদের অধীন করিয়া লইল; অনার্য্যেরা বিজিত হইয়া আর্য্য প্রভুদের দাসত্ব স্বীকার করিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণের লোকেরা আর্য্য-বংশ-জ, আর বিজিত অনার্য্যেরা হইল শূদ্র। হিন্দু সভ্যতা মুখ্যতঃ বৈদিক আর্য্যদেরই সৃষ্টি; হিন্দু জাতির মধ্যে যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, সাধু, সৎ, ও শাশ্বত তাহার প্রায় সমস্তই আর্য্যজাতির দান; এবং যাহা-কিছু নিকৃষ্ট, কুৎসিত, অসাধু, অসৎ ও ক্ষণস্থায়ী, তাহার সবটাই অনার্য্য-মনোভাব-জাত। আধুনিক কালে যেভাবে আর্য্যভাষী শ্বেতকায় ইউরোপীয়গণ এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়া, সেই-সব দেশের লোকেদের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদের নিজ সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত করে, সেই ভাবেই তাহাদের এবং ভারতের উচ্চবর্ণের লোকেদের আদি-পুরুষ প্রাচীন আর্য্যগণ বিভিন্ন স্থানে অনার্য্যদের উপরে অধিকার এবং প্রভাব বিস্তার করে। ভারতে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ সহজেই এইরূপ মতবাদ মানিয়া লয়—ইহাতে প্রবল ইউরোপীয়গণের সহিত দূর-গত স্বাজাত্য-বোধ-জনিত একটু প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদ হয় তো বিদ্যমান ছিল, সে আত্মপ্রসাদটুকু স্পষ্টতঃ স্বীকার করাও হয় তো লজ্জার বিষয় ছিল। যাহা হউক, এইভাবে বিজিত অনার্য্য জাতির সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অপকর্ষ এবং বিজেতা আর্য্য জাতির সর্ববিধ উৎকর্ষ একরকম মানিয়া লওয়াই হইল। যে-সকল অনার্য্য আর্য্যদের বশ্যতা স্বীকার করিল না, তাহারা বিতাড়িত হইয়া পাহাড় ও জঙ্গল অঞ্চল আশ্রয় করিল,—এখনও সেখানে তাহাদের বংশধরেরা কোল ভীল সাঁওতাল ওরাওঁ গোঁড় প্রভৃতি জাতি রূপে, আর্য্যদের বংশধরদের তুলনায় নিতান্ত অসভ্য অবস্থায়, জীবন-যাপন করিতেছে।

কিন্তু উপরে বর্ণিত এই মতবাদ এখন ধীরে ধীরে পরিবর্তন করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছে। ভারতে আজকাল চারিটী বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষার প্রচলন দেখা যায়; প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই চারিটী ভাষাবর্গ এদেশে বিদ্যমান। [১] Austric অস্ট্রিক গোষ্ঠী, [২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী, [৩] ভোট-চীন গোষ্ঠী, ও [৪] আর্য্য-গোষ্ঠী। [১] অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অধীনে আসে—বর্মার মোন বা তালৈঙ, এবং পালৌঙ, ওয়া প্রভৃতি দুই চারিটী ভাষা; আসামের খাসিয়া; আর ভারতের

কোল (বা মুণ্ডা) শ্রেণীর ভাষাবলী—সাওঁতালী, মুণ্ডারী, হো, কোরওয়া, খাড়িয়া, কুরকু, জুয়াঙ্, শবর। অস্ট্রিক-ভাষী জাতি এই শ্রেণীর ভাষা লইয়া, এক মতে উত্তর-ইন্দো-চীন হইতে আসামের পথ দিয়া, অন্য মতে ভারতের পশ্চিম হইতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে প্রবেশ করে ; ভারতের অস্ট্রিক ভাষাবলীর সমশ্রেণিক বা জ্ঞাতি-স্বরূপ ভাষা ভারতের বাহিরে বলা হয়—কম্বোজের খ্মের, মালাই যবদ্বীপীয় প্রভৃতি দ্বীপময় ভারতের ভাষা, এবং মেলানেসীয় ও পলিনেসীয় দ্বীপাবলীর ভাষা-সমূহ। [২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী লইয়া পরে আলোচনা করা যাইবে। [৩] ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষা—হিমালয়ের সানুদেশে—কাশ্মীরে, নেপালে, আসামে এবং ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে ও ব্রহ্মদেশে কথিত হয়। [৪] আর্য্য ভাষাবলী—প্রাচীন আর্য্যজাতির ভাষা (বৈদিক যুগের কথিত ভাষা) হইতে উৎপন্ন হিন্দুস্থানী বাঙ্গালা মারাঠী পাঞ্জাবী সিন্ধী গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলি এখন প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের কতক অংশে প্রচলিত। এক সময়ে, আর্য্য-ভাষার আগমনের পূর্বে, সমগ্র উত্তর-ভারতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা প্রচলিত ছিল ; আর্য্য-ভাষা আসিয়া এগুলিকে বিতাড়িত অথবা কোণ-ঠেসা করিয়াছে।

অস্ট্রিক (কোল বা মুণ্ডা), দ্রাবিড়, ও ভোট-চীন—এই তিন বিভিন্ন শ্রেণীর অনার্য্য এক দিকে, আর আর্য্য ভাষা আর এক দিকে। শেষটা উত্তর-ভারতে জয় হইল আর্য্য ভাষার, অনেকটা আর্য্যদেরই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের ফলে। দক্ষিণ-ভারতে কিন্তু দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর অনার্য্য ভাষাগুলি, আর্য্য ভাষার নিকট সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হয় নাই ; সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের আর্য্যভাষার দ্বারা নানাভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও, তেলুগু কানাড়ী তমিল মালয়ালম্ এখনও মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ভারতবর্ষের প্রায় এক পঞ্চমাংশ লোক এখনও দ্রাবিড়-জাতীয় অনার্য্য ভাষা বলিয়া থাকে।

অনুমান হয়, উত্তর-ভারতে—গঙ্গাতটে, বাঙ্গালা দেশে, উড়িষ্যায়, এবং অনেকটা মধ্য-ভারতে—অস্ট্রিক-ভাষী লোকেদেরই বসবাস বেশী করিয়া ছিল। দ্রাবিড়-জাতীয় লোকেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রবল ছিল। দক্ষিণ ভারতে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য এখনও বজায় আছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বাঙ্গালা দেশে ও উড়িষ্যাতেও দ্রাবিড়েরা ছিল বলিয়া অনুমান হয় ; তবে বোধ হয়, সংখ্যায় ইহারা অস্ট্রিকদের মত এত প্রবল ছিল না। ভোট-চীন-ভাষী লোকেরা সর্বশেষে ভারতে আগমন করে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে ভারতের

সীমান্তে ইহাদের আগমন ঘটে। ক্রমে হিমালয়ের এপারে নেপালে, উত্তর-পূর্ব বঙ্গে এবং আসামে ইহাদের উপনিবেশ হয়। উত্তর-বঙ্গের জনগণের মধ্যে ইহাদের অস্তিত্ব মিশিয়া গিয়াছে; অন্যত্র নেপালে, ভোটানে, আসামে—বহুস্থানে ইহাদের পৃথক্ সত্তা এখনও বিদ্যমান। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট-চীন, আর্য্য—এই চারিটী ভাষা-গোষ্ঠীই ভারতে প্রচলিত।

সম্প্রতি Vilmos Hevesy ভিল্‌মোশ্‌ হেভেশি (ইংরেজীতে William Hevesy) নামে জনৈক হঙ্গেরীয় বিদ্বান্ এই চারিটী ছাড়া আর একটী—অর্থাৎ পঞ্চম একটি—ভাষা-গোষ্ঠীর ভারতে আগমনের এবং প্রতিষ্ঠিত হওনের সম্ভাব্যতা অনুমান করিয়াছেন। ইঁহার মতে, উরাল-আল্‌তাই শ্রেণীর একটী ভাষা (এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, একদিকে তুর্কী, মোঙ্গোল, মাঞ্চু, অন্যদিকে Magyar মজর বা হঙ্গেরীয়, ফিন্‌লাণ্ডের Finn ফিন্, এস্তোনিয়ার Est এস্ত্, লাপ্‌লাণ্ডের Lapp লাপ্, এবং রুষদেশে প্রচলিত কতকগুলি ভাষা, Ostyak ওস্ত্যাক্, Vogul ভোগুল্, Chermes চের্মেস্ প্রভৃতি) প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে আনীত হয়; এবং কোল (বা মুণ্ডা) শ্রেণীর ভাষাগুলি হইতেছে এই উরাল-আল্‌তাই গোষ্ঠীরই একটী শাখার অন্তর্ভুক্ত—খাসিয়া, মোন্, খ্‌মের, মালাই প্রভৃতির সহিত সম্পৃক্ত নহে। অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠী হইতে এগুলিকে হেভেশি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চাহেন। হেভেশি যে-সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সে-সমস্ত যুক্তি এখনও ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা হয় নাই; বিচার-সহ হইলে, সে-সমস্ত যুক্তি দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের সহিত উত্তর-এশিয়ার একটা জাতি-গত ও ভাষা-গত যোগ-সূত্র প্রমাণিত হইবে।

যাহা হউক, প্রাচীন যুগের, আর্য্যদের আগমনের সময়ের, দ্রাবিড়-জাতির সম্বন্ধে আমাদের খবর পাইবার উপায় কি? এই জাতি কোথা হইতে আসিল? আচারে ব্যবহারে, সংস্কৃতিতে, ইহারা প্রাচীন কালে কি অবস্থায় ছিল? ভারতের সভ্যতায়, হিন্দু সংস্কৃতির গঠনে, ইহাদের আহৃত উপাদান কি? এতাবৎ—বর্তমান বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত—প্রাচীন দ্রাবিড়দের সম্বন্ধে জানিবার একমাত্র উপায় ছিল, দ্রাবিড় ভাষাগুলি। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলি এক দিকে; অস্ট্রিক ভাষাগুলি এবং ভোট-চীন ভাষাগুলি এক এক দিকে; এবং দ্রাবিড় ভাষাগুলি আর এক দিকে। আর্য্য, অস্ট্রিক (কোল, মুণ্ডা), ভোট-চীন—এগুলি হইতে দ্রাবিড়ের মৌলিক পার্থক্য দেখিয়া, দ্রাবিড় ভাষা ও দ্রাবিড়-ভাষী মূল জাতিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ স্থান দিতে হয়।

বেলুচিস্থানে, ঈরানীয় আর্য্য-ভাষী বেলুচ ও পাঠান এবং ভারতীয় আর্য্য সিন্ধী-ভাষীদের মধ্যে ব্রাহুই-জাতি বাস করে; ইহাদের ভাষা দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এক সময়ে, আর্য্য ভাষার প্রসারের পূর্বে, বেলুচিস্থানে ও সন্নিকটস্থ সিন্ধু প্রদেশেও, ব্রাহুইয়ের মত দ্রাবিড় ভাষা চলিত। মহারাষ্ট্র-দেশে মারাঠী আজকাল প্রচলিত,—মারাঠী সংস্কৃত-জাত আর্য্যভাষা; কিন্তু মহারাষ্ট্র-দেশের অনেকটা জুড়িয়া কানাড়ীর মত দ্রাবিড় ভাষা যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি কারণে এরূপ অনুমান করা যুক্তিযুক্ত হইবে যে, এক সময়ে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত—এবং মধ্য-ভারতের অনেকটাও—দ্রাবিড়-ভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। বৈদিক যুগে (খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের দ্বিতীয় সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধে ও প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধে) উত্তর ভারতে যে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষী অনার্য্যদেরই সঙ্গে আর্য্যদের সংঘর্ষ ও সংস্পর্শ ঘটে, তাহা বেদের ভাষায় দ্রাবিড় ও কোল হইতে গৃহীত কতকগুলি শব্দ হইতে অনুমিত হয়। এইরূপ দ্রাবিড়-মূল বৈদিক শব্দের উদাহরণ, যথা,—'অণু, অরণি, কপি, কর্মার, কলা, কাল, কিতব, কুট, কুণার, গণ, নানা, নীল, পুষ্প, পুষ্কর, পূজন, ফল, বিল, বীজ, রাত্রি, সায়ম্; অটবী, আড়ম্বর, খড়্গ, তণ্ডুল, মটচী, বলক্ষ, বল্লী।' আর্য্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির উদ্ভব ও প্রসার, প্রাচীনকালে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব হইতে জাত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ দুই চারিটী অনুমান-মাত্র আমাদের সম্বল ছিল। আর্য্য-ভাষায় রচিত বৈদিক সাহিত্য সুপ্রাচীন;—অন্ততঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের গোড়ায় এই সাহিত্য লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থ-নিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় রচিত কোনও সাহিত্যের অত প্রচীন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমাদের আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলির (বাঙ্গলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটী প্রভৃতির) একমাত্র মূল-স্থানীয় বৈদিক ভাষা আমরা পাইয়াছি, তাহার ও পরবর্তী লৌকিক সংস্কৃতের এবং প্রাকৃতের সাহায্যে আমরা এই-সকল আধুনিক ভারতীয় ভাষার উৎপত্তির কথা ও পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বুঝিতে পারি। কিন্তু তমিল, তেলুগু, কানাড়ী প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাগুলির মূল-স্বরূপ একটী সুপ্রাচীন 'আদি দ্রাবিড়' ভাষার কোনও নিদর্শন নাই।

আধুনিক দ্রাবিড় ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা আমরা বিভিন্ন দ্রাবিড় ভাষার পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার সূত্র কতটা নিকট বা কতটা দূর, তাহার একটা আভাস পাইতেছি; নিম্নলিখিত রূপে এগুলির সম্পর্ক নির্ধারিত হইয়াছে। যেমন,—অজ্ঞাত ও অধুনা-লুপ্ত আদি-দ্রাবিড় ভাষার [১] দক্ষিণ-ভারতীয় শাখা—

ইহা হইতে উৎপন্ন, প্রাচীন তমিল ও প্রাচীন-কানাড়ী ; তুলু ; কোড়গু বা কুর্গের ভাষা (প্রাচীন তামিল হইতে আধুনিক তমিল ও মালয়ালম্, এবং প্রাচীন-কানাড়ী হইতে আধুনিক-কানাড়ী ও তোডা এবং কোটা উদ্ভূত হইয়াছে) ; [২] মধ্য-ভারতীয় শাখা—ইহার মধ্যে পড়ে প্রাচীন ও আধুনিক তেলুগু ; কোলামী ; কুই বা খন্দ ; গোণ্ড ; এবং কুড়ুঁখ বা ওরাওঁ, ও মাল্‌তো বা মাল-পাহাড়ী ; এবং [৩] পশ্চিম-ভারতীয় শাখা—বেলুচিস্থানের ব্রাহুই ইহার অন্তর্গত। কিন্তু অজ্ঞাত আদি-দ্রাবিড়ের কোনও পাত্তা পাওয়া যায় নাই। তেলুগু, কানাড়ী, তমিল, মালয়ালম্-এর লক্ষণীয় সাহিত্য আছে ; কিন্তু এই-সব সাহিত্য খুব প্রাচীন নহে। তেলুগু সাহিত্যের বয়স এখন হইতে মাত্র ৯০০ বৎসর—সবচেয়ে প্রাচীন তেলুগু বই নন্নয়-কৃত মহাভারতের আংশিক অনুবাদ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের ; কানাড়ী সাহিত্যের নিদর্শন কতকগুলি প্রাচীন অনুশাসনে পাওয়া যায়, এগুলির তারিখ খ্রীষ্টীয় ৫০০-র দিক্ হইতে আরম্ভ ; ইহার পূর্বে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে লিখিত ও মিসরে প্রাপ্ত একখানি গ্রীক নাটকের ছিন্ন পত্রে ভারতীয় ভাষা-বিশেষের নমুনা-রূপে কয়েক ছত্র প্রাচীন কানাড়ী গ্রীক অক্ষরে লিখিত পাওয়া গিয়াছে—ইহাই হইতেছে দ্রাবিড় ভাষার সব-চেয়ে পুরাতন সামসময়িক নিদর্শন ; তমিল ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন প্রাচীন-তমিল সাহিত্যে পাওয়া যায়—এই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু আনুমানিক যীশু খ্রীষ্টের ১০০।১৫০ বৎসর পরেকার সময়ের হইলেও, ইহাতে খ্রীষ্টাব্দ ৫০০-র পূর্বেকার ভাষা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া অনুমান হয় (খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা কতকগুলি শিলা-লিপি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির ভাষার সম্পূর্ণ উদ্ধার এখনও হয় নাই, তবে মনে হয়, হয় তো সেগুলি প্রাচীন তমিলে লেখা ; এই অনুমান সত্য হইলে, খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে তমিল গিয়া পঁহুছে) ; মালয়ালী ভাষা প্রাচীন-তমিলের বিকারে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে উদ্ভূত হয়। কাজেই, খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সহস্রকের নিদর্শনের মধ্যে নিবদ্ধ দ্রাবিড় ভাষাবলী হইতে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রক বা দ্বিতীয় সহস্রকের মূল দ্রাবিড় ভাষার বা সভ্যতার ধারণা করা একটু কঠিন হইয়া পড়ে।

আর্য্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে যে একটা উচ্চদরের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এতদিন ধরিয়া আমাদের সে বিষয়ে কোনও ধারণা ছিল না। কতকগুলি পণ্ডিত কেবল এইটুকুই দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ মূলে দ্রাবিড়-ভাষা-জাত। Kittel কিটেল-এর বিখ্যাত কানাড়ী অভিধানের ভূমিকায় এইরূপ ৪৫০ শব্দের আলোচনা আছে। লোকের মনে আলোচনা ও

বিচার দ্বারা ক্রমে এইরূপ ধারণাও দাঁড়াইতেছে যে, হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার অনেক উপাদান, যাহা বেদ-বিরোধী ও বৈদিক-জগতের বহির্ভূত, তাহা দ্রাবিড়দের নিকট হইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, যে ভাবে বিভিন্ন আর্য্যভাষার শব্দাবলী লইয়া, সেগুলিকে আধার করিয়া, আর্য্য-ভাষী জাতির সভ্যতা, তাহাদের ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধারের চেষ্টা হইয়াছে, সেই দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন বলিয়া যেটীকে মনে করা হয়, সেই প্রাচীন তমিলের শুদ্ধ তমিল বা দ্রাবিড় শব্দ ধরিয়া, কাল্ড্ওয়েল সাহেব আদি-দ্রাবিড়দের সভ্যতার একটা চিত্র খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত এই আদি দ্রাবিড় সভ্যতার কথা, আধার-স্বরূপ শুদ্ধ দ্রাবিড় শব্দগুলিকে " " এইরূপ উদ্ধার-চিহ্নের মধ্যে দিয়া, ও একটু অদল-বদল করিয়া নীচে দেওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত এই সব প্রাচীন তমিল শব্দের দীর্ঘ-এ-কার এবং দীর্ঘ ও-কারের জন্য 'এ' এবং 'ও' বর্ণ দ্বিত্ব করিয়া দেওয়া হইতেছে; 'ব'-এর উচ্চারণ w, ঝ-এর zh, (ঘোষবৎ 'য') এবং ৱ হইতেছে মূর্ধন্য ল।

দ্রাবিড়দের "কোো" বা "েরেস্তন্" অথবা "মন্নন্" অর্থাৎ 'রাজা' থাকিতেন; রাজারা "কোট্টৈ" বা "অরন্" অর্থাৎ 'সুরক্ষিত বাটী'তে বাস করিতেন; তাঁহারা "নাটু" অর্থাৎ 'প্রদেশের' উপর রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের "পুল্বন্" অর্থাৎ 'কবি' অথবা 'চারণ' থাকিতেন; "কোণ্টাট্টম্" অথবা "তিরবিঝ" অর্থাৎ 'উৎসবের দিনে' কবিরা "চেয়্যুল্" অর্থাৎ 'কবিতা' গান করিতেন। দ্রাবিড়েরা "এঝুত্তু" অর্থাৎ 'লিখন'-কার্য্যের সহিত পরিচিত ছিল; "ইরকু" অর্থাৎ 'লেখনী' দিয়া তালপত্রে তাহারা "বরৈ" অর্থাৎ 'লিখন-কার্য্য' করিত। কতকগুলি লিখিত তালপত্র দিয়া তাহারা "এটু" বা 'বই' তৈয়ারী করিত। নানা দেবতার পূজা তাহাদের মধ্যে থাকিলেও, তাহারা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বা এক ঈশ্বরেরও পূজা করিত—সেই ঈশ্বরের নাম ছিল "কোো" বা 'রাজা,' এই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাহারা "কোো-ইল্" ("কোয়িল্" বা "কোবিল্") অর্থাৎ 'রাজপ্রাসাদ' বা 'মন্দির' বানাইত। তাহাদের মধ্যে লোক-ব্যবহার ও আইন-কানুন ("কট্টলৈ, পঝক্কম") ছিল, কিন্তু বিচারপতির বা ব্যবহারজীবীর কথা পাওয়া যায় না। ধাতুর মধ্যে তাহারা "পোন্" বা 'সোনা', "বেল্লি" বা 'রূপা', "চেম্পু" বা 'তামা', এবং "ইরুম্পু" বা 'লোহা'র ব্যবহার জানিত, কিন্তু টিন, শীশা ও দস্তা তাহাদের জানা ছিল না। বুধ ও শনি ব্যতীত অন্য দিনগুলির নামকরণ তাহারা করিয়াছিল ("বেল্লি" = 'শুক্র', "চেব বয়্" = 'মঙ্গল', "বিয়াঝম্" = 'বৃহস্পতি')। তাহাদের

"উর্" অর্থাৎ 'নগর' ছিল ; "তোণী, ওটম্, বল্লম্" অর্থাৎ নানা প্রকারের 'নৌকা', এমন কি "কপ্পল্" ও "পটবু" অর্থাৎ 'জাহাজ' করিয়া তাহারা সাগর-গমন করিত। কিন্তু প্রাচীন কালে তাহারা কোনও দ্বীপের সহিত পরিচিত হয় নাই, দ্বীপবাচক কোনও শুদ্ধ দ্রাবিড় শব্দ নাই—অতএব বুঝা যায় যে, তাহারা সুদূর দেশ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে নাই। কৃষি-কার্য্যে তাহারা বিশেষ দক্ষ ছিল ("এএর্" = 'লাঙ্গল', "বেলন্মৈ = 'কৃষি')। এবং বিশেষ যুযুৎসু জাতিও তাহারা ছিল, যুদ্ধে "বিল্" অর্থাৎ 'ধনু', "অম্পু" অর্থাৎ 'শর', "বেল্" অর্থাৎ 'বর্শা', "বাল্" অর্থাৎ 'তরবারী'—এই-সব অস্ত্র ব্যবহার করিত। সাধারণ অনেকগুলি বৃত্তি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; যথা—সুতা-কাটা, কাপড়-বোনা, কাপড় রঙ-করা, হাঁড়ীকুড়ী গড়া প্রভৃতি। কাল্ড্‌ওয়েলের পরে, তমিল ভাষার আধারে এই ধরণের অনুসন্ধান খুব খুঁটি-নাটির সঙ্গে করেন পরলোকগত অধ্যাপক P. T. Srinivas Iyengar শ্রীনিবাসিয়েঙ্গর্; ইঁহার রচিত Pre-Aryan Tamil Culture—Lectures delivered under the auspices of the University of Madras, 1930, এ সম্বন্ধে অতি উপযোগী ও মূল্যবান্ পুস্তক।

১৯২০ সালে যখন পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিলেন, এবং তাহার পরে যখন দক্ষিণ-পাঞ্জাবের হড়প্পায় ও সিন্ধুপ্রদেশের মোহেন-জো-দড়ো ও অন্যত্র এক বিরাট্ নাগরিক সভ্যতার বহু নিদর্শন বাহির হইতে লাগিল, তখন বিশেষজ্ঞগণ এই সভ্যতাকে বেদ-বর্ণিত জগৎ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক্ দেখিয়া ভারতের আর্য্য-পূর্ব যুগের জাতিদের সঙ্গে ইহার সংযোগ অনুমান করিতে লাগিলেন। আবার ওদিকে দেখা গেল যে, প্রাচীন ঈরান ও মেসোপোতামিয়া, এমন কি এশিয়া-মাইনর ও পূর্ব ভূমধ্য-সাগরের Crete ক্রীট প্রভৃতি দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের সহিত ভারতের এই প্রাচীন আর্য্য-পূর্ব কালের সভ্যতার মিল রহিয়াছে। সুতরাং ভারতের যে আর্য্য-পূর্ব জাতি মোহেন-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানের নাগরিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ভারতের পশ্চিমের অধিবাসী জাতিদের যোগ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হইল। ভারতের এই আর্য্য-পূর্ব জাতি কোন্‌টী—অস্ট্রিক, না দ্রাবিড়, না ভোট-চীন?

নানা দিক্ দিয়া বিচার করিয়া মনে হয় যে, আদিম দ্রাবিড় জাতিই ভারতের সুপ্রাচীন যুগের, আর্য্যদের আসিবার পূর্বের কালের এই সভ্যতার স্রষ্টা ছিল; 'স্রষ্টা' জোর করিয়া বলিতে না পারি—তাহাদের মধ্যেই এই সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, এ কথা বলিতে পারি। দুই চারিজন নৃতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকের মতে, দ্রাবিড় জাতি

ভারতে আসিয়াছিল পশ্চিম হইতে, সম্ভবতঃ পূর্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে। দুই একটী ভাষাতাত্ত্বিক ও অন্য বিষয় আলোচনা করিয়া বর্তমান লেখকেরও সেইরূপ অনুমান হয়। কি করিয়া এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহার খুঁটি নাটি ইতিহাস না বলিয়া, দ্রাবিড়দের উৎপত্তি ও আগমন সম্বন্ধে আমার অনুমান বলিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

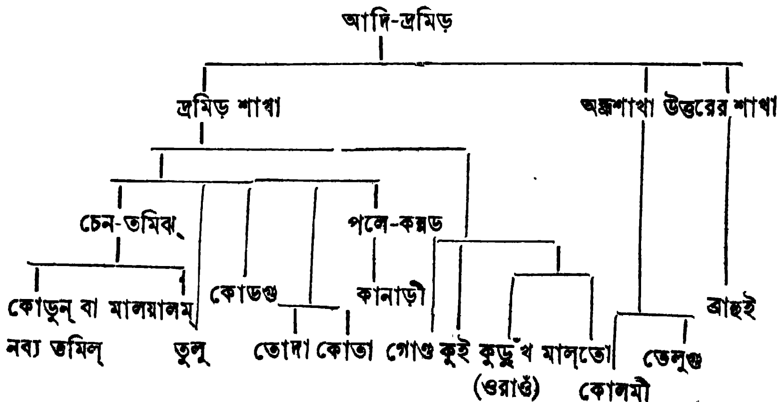
খ্রীষ্ট-জন্মের ৩০০০ বৎসর আগে, পূর্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে Crete ক্রীটে ও Lycia লিসিয়া (প্রাচীন গ্রীকে লুকিয়া) প্রভৃতি এশিয়া-মাইনরের দক্ষিণ অঞ্চলের দেশে, আদি দ্রাবিড়দের অর্থাৎ আদি-দ্রাবিড়-ভাষীদের বাস ছিল। ইহাদের জাতীয় নাম ছিল সম্ভবতঃ *Drmil-'*দৃমিল্' অথবা *Drmmizh-'দৃম্মিঝ্'- ; পরবর্তী কালে লুকিয়া বা লিসিয়ার লোকেরা এই নাম Trmmili 'তৃম্মিলি' রূপে লিখিত, এবং খ্রীঃ-পূঃ পঞ্চম শতকে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতস্ এই নাম Termilai 'তের্মিলাই' রূপে লিখিয়া গিয়াছেন। এই জাতির লোকেরাই কোনও সময়ে, আর্য্যদের আগমনের বহু পূর্বে, ইরাক ঈরান ও বেলুচিস্থান আফগানিস্থান হইয়া, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হয়; এবং সেখান হইতে রাজপুতানা মহারাষ্ট্র হইয়া এই জাতি, ইহাদের ভাষা ও সভ্যতা লইয়া দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হয়,—ইহারা গাঙ্গেয় উপত্যকাতেও বাস করিতে থাকে। ভূমধ্যসাগর-অঞ্চল হইতে ইহারা স্থানীয় নৌকা-গঠন-রীতি, স্থানীয় পুরুষ-প্রকৃতির পূজা (যাহা পরে ভারতবর্ষে শিব-উমার পূজামূলক পৌরাণিক ধর্মে পরিণত হয়) প্রভৃতি লইয়া আসে। ভারতবর্ষে ইহাদের অন্যতম জাতীয় নাম সম্ভবতঃ প্রথমটায় *Dramizha-রূপে প্রচলিত হয়, আর্য্যেরা এই নাম সংস্কৃতে 'দ্রমিল' বা 'দ্রমিড়' অথবা দ্রবিড়' রূপে রূপান্তরিত করিয়া লয়। এই 'দ্রমিল' নাম পরে 'দমিলু' রূপে পরে আমরা পালি ও সিংহলী ভাষায় পাই (ইহা হইতে গ্রীকে Damirike = দমিল-দেশ); এবং খ্রীষ্ট-জন্মের পরেকার প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে এই নাম তমিল ভাষায় Tamizh অথবা Tamil (তমিঝ্, তমিল্) রূপ গ্রহণ করে।

প্রাচীন ভারতে, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ইতিহাসে যেমন যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইতেছিল, তেমনি মূল বা আদি-দ্রাবিড় হইতে এবং তাহার পরেকার পরিবর্তিত দ্রাবিড় হইতে, বিভিন্ন যুগের আর্য্যভাষায়, দ্রাবিড় শব্দ গৃহীত হইতেছিল; দ্রাবিড় ভাষাতেও তেমনি সংস্কৃত বা আর্য্য শব্দ আসিতেছিল। দ্রাবিড় হইতে আগত এইরূপ বহু শব্দের মধ্যে একটী শব্দ হইতেছে 'ঘোটক' বা 'ঘোট' শব্দ। আর্য্যেরা ঘোড়ার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিল বটে, কিন্তু ভারতে আসিয়া

তাহাদের নিজস্ব আর্য্য-ভাষার শব্দ 'অশ্ব' ক্রমে তাহাদের ভাষায় অপ্রচলিত হইল; দেশীয় অনার্য্য (দ্রাবিড়) শব্দ, 'ঘোটক' রূপে আর্য্য-ভাষায় গৃহীত হইল, এই 'ঘোটক' শব্দ এখন্ হইতে 'ঘোড়া, ঘোড়ো' প্রভৃতি রূপে সমস্ত আধুনিক বা নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষায় বিদ্যমান। অনুমান হয়, আদিম দ্রাবিড়ে এই শব্দের রূপ ছিল *'ঘুত্র' বা *'ঘোত্র', তাহা হইতে প্রাচীন কোনও প্রাকৃতে 'ঘোট' শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং এই 'ঘোট' শব্দ সংস্কৃতেও আসে। ওদিকে *'ঘোত্র' বা *'ঘুত্র' তমিলে এখন 'কুত্তিরৈ' রূপ ধারণ করিয়াছে, কানাড়ীতে 'কুদুরে,' ও তেলুগুতে 'গুর্রম্'। ঘোটকের সঙ্গে দ্রাবিড়দের কবে ও কোথায় পরিচয় হইয়াছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই; *"ঘুত্র" শব্দের প্রতিরূপ প্রাচীন মিসর-দেশেও htr রূপে পাওয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, এইরূপ নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা আদি-দ্রাবিড় ও আদি ভারতীয়-আর্য্যের সংঘাত, মিলন ও মিশ্রণের ইতিহাসের, অর্থাৎ ভারতের সভ্যতার পত্তনের ও প্রাথমিক ইতিহাসের, সন্ধানের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতের সভ্যতায় দ্রাবিড়ের আহৃত উপাদান আর্য্যের দানের চেয়ে অনেক বেশী বলিয়াই মনে হয়॥

৪৬ পৃষ্ঠায় যে দ্রাবিড় শব্দগুলি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি হইতেছে "চেন্-তমিঝ্" অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগের প্রাচীন তমিলের—আদি-দ্রমিড়ে এগুলির প্রতিরূপ কি ছিল তাহা নির্ধারিত হয় নাই। আধুনিক দ্রাবিড় ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়—



হিন্দু ধর্মের স্বরূপ

হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক্ সম্বন্ধে আমার মত শাস্ত্রহীন ভক্তিহীন প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির কিছু বলিবার নাই—জীবনে অনুভূতি ও উপলব্ধির অধিকারী যে ব্যক্তি হয় নাই, সে আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়ে কি বলিবে? আমি এই প্রবন্ধে হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আদর্শের বহিরঙ্গ ধরিয়া, হিন্দুর চিন্তা ও সমীক্ষা সম্বন্ধে অল্প একটু আলোচনা করিব মাত্র। হিন্দু ধর্মের ও চিন্তার প্রতিষ্ঠাভূমি কোন্ লক্ষণীয় বিষয়কে অবলম্বন করিয়া, সেই সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আমার বক্তব্য নিবেদন করিব। এখানে অধ্যয়ন, অবলোকন এবং বিচারের অবকাশ আছে; ঐতিহাসিক আলোচনা এখানে তথ্য-নির্ধারণে সহায়তা করিবে। বাহ্য দৃষ্টিতে, হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কি, তাহা নিজ জ্ঞান-গোচর মত বলিবার চেষ্টা করিব।

যদি সূত্রাকারে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষত্বগুলি বলিতে হয়, তাহা হইলে সেগুলিকে নঞ্-মূলক ও সন্-মূলক রূপে, অর্থাৎ নাস্তি এবং অস্তি এই উভয় দিক্ দিয়া, ইহার নিম্ন-লিখিত সংজ্ঞাগুলি ধরিয়া দিতে পারা যায়। হিন্দু ধর্ম হইতেছে—[১] অ-ব্যক্তিবিশেষ-নিষ্ঠ; [২] বিশেষ-আম্নায়মন্ত্র-নিষ্ঠতা-বিহীন; [৩] জ্ঞানানুভূতিলব্ধ-শাশ্বতসত্তা-নিষ্ঠ [৪] বিশ্বাত্মানুভূতি-মূলক; [৫] দুঃখনিবৃত্তি-চেষ্টাময়; এবং [৬] বিশ্বম্ভর।

এখন একে একে এই সমস্ত সংজ্ঞা বা লক্ষণ সংক্ষেপে বিচার করিয়া দেখা যাউক্।

[১] হিন্দু ধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্য, ইহা অন্য কতকগুলি ধর্মের মত কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-কাহিনী অথবা জীবন-চরিত এবং তাঁহার প্রচারিত মতবাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত নহে। যেমন যীশু খ্রীষ্টকে বাদ দিয়া খ্রীষ্টান ধর্মের অস্তিত্বের কল্পনাই করা যায় না, জরথুশ্ত্র ও বুদ্ধদেব ছাড়া জরথুশ্ত্রীয় ও বৌদ্ধ ধর্ম যেমন হয় না, মোহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা যেমন ইস্লাম বা মোহম্মদীয় ধর্মের অন্যতর প্রধান প্রতিষ্ঠা, হিন্দু ধর্মে সেরূপ কোনও একজন-মাত্র অবতার বা তত্ত্বজ্ঞ বা ধর্মগুরুর সর্বগ্রাহিতা নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষ দেশে এবং বিশেষ কালে বিদ্যমান কোনও একজন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া এই অন্য ধর্মগুলি নিজ শাশ্বতত্ত্ব প্রচার করিতেছে। দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ মনুষ্য-চরিত্রের সীমার মধ্যে হিন্দু ধর্ম তাহার স্বীকৃত তত্ত্বগুলিকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহে নাই। হিন্দু ধর্মকে প্রাচীন মিসর,

আসিরিয়া-বাবিলন, প্রাচীন গ্রীস, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের ধর্মের মত একটী Natural Religion বা 'স্বভাবজ ধর্ম' বলা যাইতে পারে; কারণ মানুষের অভিব্যক্তির সঙ্গে তাল রাখিয়া এইরূপ ধর্মের বিকাশ হয়, এবং জীবনের নানামুখিতার মতই এইরূপ স্বভাব-জাত ধর্ম নানামুখ। এই সমস্ত স্বভাব-জাত ধর্মকে, যেগুলি কোনও বিশেষ আচার্য্যের শিক্ষাময় শাস্ত্রের মধ্যে নিবদ্ধ নহে, যেগুলি 'কেতাবী ধর্ম' নহে, যাহা বিশ্বপ্রপঞ্চের ও মানব-জীবনের পরিচালনাকারী কতকগুলি বিধি মানে, সেই ধর্মগুলিকে প্রাচীন কালে ইউরোপে খ্রীষ্টানরা Pagan অথবা 'জানপদ' ধর্ম বলিত। হিন্দু ধর্মও এইরূপ Pagan ধর্ম; ইহাই ইহার প্রধান গৌরবের কথা, ইহার সার্থকতা এখানেই। সমগ্র মানব-সমাজের গ্রহণের জন্য কল্পিত কতকগুলি বিশেষ মতবাদেই (হিন্দুধর্মের মতে) মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিসমাপ্তি নহে। খ্রীষ্টান ধর্ম, মোহম্মদীয় ধর্ম প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম, এক-একটী বিশেষ প্রকারের সাধনাকে, এক-একটী বিশেষ প্রকারের আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উপলব্ধিকে, মোক্ষ-সাধনের একমাত্র অদ্বিতীয় মার্গ বা উপায় বলিয়া মনে করে; এই শ্রেণীর ধর্ম অন্য সকল প্রকারের অনুষ্ঠান ও মতবাদকে ভ্রান্ত বা মিথ্যা বলিয়া, মানব-সমাজে সেগুলির উদ্ভবকে শয়তানের কারসাজী বলিয়া মনে করে, এবং নানা উপায়ে নিজ ধর্ম কর্তৃক অননুমোদিত এই সকল সাধন-পথকে বিনষ্ট বা দূরীভূত করিবার চেষ্টায় থাকে। "আমার সাধন-মার্গ ই একমাত্র সাধন-মার্গ", অথবা "আমার ধর্ম-সংস্থাপক গুরু বা মহাত্মার নির্দিষ্ট সাধন-মার্গ ই একমাত্র পারমার্থিক পথ—এইরূপ ধারণার অবকাশই হিন্দুর মনে হইতে পারে না, কারণ হিন্দু-ধর্মের মধ্যে, অর্থাৎ হিন্দু-জাতির মধ্যে উদ্ভূত মতবাদগুলির মধ্যে, সাধারণ এবং ব্যাপক ভাবে, কোনও একটী বিশেষ মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। মানব-জাতি যুগ যুগ ধরিয়া নব নব অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে। অদৃষ্ট সত্তার পূর্ণ প্রকাশ যে কোনও বিশেষ দেশে বিশেষ একজন মহাপুরুষের কাছে ঘটিবে, সেই প্রকাশ যে ভাবে ইঁহার কাছে হইয়াছে তদতিরিক্ত অন্যবিধ ঐশ্বরিক প্রকাশের আর সম্ভাবনা নাই—একটু বিচার করিয়া দেখিলেই, এইরূপ মনোভাবের অন্তর্নিহিত ভাবটী যে ঈশ্বরীয় শক্তিকে কতখানি খর্ব করে, তাহা বুঝা যাইবে। এই কারণে, অন্ধ ভাবে মত-বিশেষের প্রতি নিষ্ঠা দ্বারা আধ্যাত্মিক ও আনুষ্ঠানিক জীবনে যে ধরণের গোঁড়ামি ও পরমতা-সহিষ্ণুতা আসিয়া যায়, হিন্দু ধর্ম তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দু কেবল একথা বলিয়া নিজের উদারতায় নিজেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে না, যে, সকল ধর্মেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে; হিন্দু বলে যে, বিভিন্ন প্রকারের

ধর্ম বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি ও উপলব্ধির পথ—ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকাশ যেমন অনন্ত, তেমনি মানুষের অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রকারও অনন্ত; সকল প্রকার অনুভূতিরই একটা সার্থকতা আছে;—সুতরাং অনুভূতি-লাভের বিভিন্ন প্রকারের পথ, বিভিন্ন প্রকারের সাধন-মার্গ, অথবা বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম, সবই সত্য পথ, সত্য সাধন-মার্গ। ইহার মধ্যে কেবল একটা কথা আছে—ব্যবহারিক দিক্ হইতে সেটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়; যতক্ষণ না অপরের উপরে হস্তক্ষেপ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সাধন-মার্গকেই, প্রত্যেক ধর্মকেই, পুরুষার্থ-লাভের উপায় বলিয়া মানিতে হইবে,—মানা যুক্তি-সঙ্গত, এবং মানা সভ্য মানবের উপযোগী। এই জন্যই আধুনিক কালে হিন্দু সাধন-মার্গের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ তাঁহার পরিচিত সমস্ত ধর্মের সাধনকে নিজের জীবনে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার পরিচিত সকল ধর্মের বিশিষ্ট অনুভূতি ও উপলব্ধির আস্বাদন করিয়াছিলেন, এবং পূর্ণ বিশ্বাসের ও উপলব্ধির সহিত বলিয়াছিলেন, "যত মত, তত পথ।"

স্বামী বিবেকানন্দ যেন কোনও জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, বিভিন্ন ধর্ম হইতেছে যেন বিভিন্ন ভাষা। এই উপমাটী অতি সুন্দর ও সার্থক। সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্য্য যাহা, তাহা গ্রীক বা চীন বা আরবী ভাষার নহে; আবার আরবী বা চীনা ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্যকেও উপেক্ষা করা চলে না। একটী জিনিসকে, একটী বিশেষ গুরুর প্রচারিত মতকে সমগ্র হিন্দু সমাজ অন্ধ-ভাবে আঁকড়াইয়া ধরে নাই—বহু গুরুর বা ধর্মদেষ্টার বহুবিধ মতের মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান হিন্দু ধর্মে আছে; সেই হেতু হিন্দুর পক্ষে একটা ভদ্র ও সভ্য-জনোচিত মনোভাবের অধিকারী হওয়া সহজ হইয়াছে। ধর্ম বিষয়ে হিন্দুর (এবং হিন্দু বলিতে ভারতে উদ্ভূত বৌদ্ধ জৈন শিখ প্রভৃতি ধর্ম বা সম্প্রাদায়কেও বুঝায়) পরমত-সহিষ্ণুতা একটী অতি অদ্ভুত বস্তু; এবং এই পরমত-সহিষ্ণুতার অভাব ঘটিলে মানুষকে সভ্য অথবা সংস্কৃতি-যুক্ত বলা চলে না। অন্যমতাসহিষ্ণু মুসলমান ও খ্রীষ্টান মনোভাবের প্রতিক্রিয়া বা প্রভাবের ফলে, আধুনিক যুগে হিন্দু সমাজেও দুই একটী অসহিষ্ণু ও অনুদার মতবাদ বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল; এই নবীন সম্প্রদায়গুলি হিন্দুর দেব-বাদ প্রতিমা-পূজা প্রভৃতি দুই-একটী ধার্মিক আচার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিত, বা করিয়া থাকে; কাল-ধর্মের প্রভাবে এই সকল নবীন মতের অনুদার ভাব এখন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ধর্ম-বিষয়ে হিন্দু বরাবরই সমন্বয় করিবার চেষ্টায় ছিল ও আছে; এবং এই ব্যাপারটী হিন্দুর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে এই হেতু যে, হিন্দু একটী বিশেষ মতের উপরে জোর দেয় নাই। যীশুর পিতৃরূপে কল্পিত ঈশ্বরের প্রতি

প্রেম, ও ভ্রাতৃরূপে কল্পিত মানুষের প্রতি দয়া ; মোহম্মদের ঈশ্বরের সত্তায় একাগ্র বিশ্বাস ও ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা ; জরথুশ্ত্রের ঈশ্বর অর্থাৎ সত্যের পক্ষ গ্রহণ-পূর্বক পাপ-পুরুষের বা মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া ; বুদ্ধদেবের সংসারে ও কর্মে নিবৃত্তির উপদেশ এবং সব জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা ; মহাবীর স্বামীর জীব-দয়া এবং জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা ;—এ সবই হিন্দুর নিকট গ্রাহ্য। বিশেষ ব্যক্তির মতের প্রতি একান্ত ও সর্বগ্রাহী নিষ্ঠার অভাব, ও সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত মহাপুরুষের কৃতিকে ঈশ্বরের অংশ বা বিভূতি বলিয়া স্বীকার করা—ইহাই হিন্দুর প্রথম বৈশিষ্ট্য। ইহা ঋতম্ভর ; বিশেষ ব্যক্তি বা মানব অথবা মহাপুরুষের বিচার বা ধারণা হইতে নিরপেক্ষ শাশ্বত সত্তার যে পরিচালনী শক্তি, বিশ্ব-প্রপঞ্চকে ধরিয়া রহিয়াছে যে ঋত, সেই ঋতকে ইহা বহন করিতেছে।

[২] মুসলমান ধর্মের creed বা ধর্ম-বীজ আছে, ইসলামের কল্‌মা-মন্ত্র—"লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ্ ; মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্"—"আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত",—এই creed বা কল্‌মা না মানিয়া মুসলমান হওয়া যায় না ; সকল মুসলমানকেই ইহা মানিতে হইবে, ইহাতে সায় দিতে হইবে। সেইরূপ খ্রীষ্টানদেরও creed আছে—সেটী মানা চাই, নহিলে খ্রীষ্টান হওয়া ঘটে না ; খ্রীষ্টান ধর্ম-বীজ, মুসলমান ধর্ম-বীজের মত অতটা সরল নহে, তাহা সকলের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টসাপেক্ষ ; কিন্তু তাহাতে subscribe করা চাই, তাহা স্বীকার করা চাই। হিন্দু ধর্মের মধ্যে নানা দার্শনিক মত আছে ; নিজের জ্ঞান ও রুচি মত যে-কোন মত গ্রহণ করিতে পারা যায় : এগুলি ঈশ্বরে পহুঁছিবার ঋজু বা কুটিল নানা পথ মাত্র। হিন্দু ধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেই এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সহজেই আসে। হিন্দু ধর্মের creed নাই ; সেই জন্য কেহ-কেহ ইহাকে ধর্ম বলিয়াই মানিতে চাহে না। বাস্তবিক, সমগ্র মানব-জীবনের একটা creed, একটা সংজ্ঞা যেমন এক কথায় দেওয়া যায় না, হিন্দু ধর্মের সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। Creed না মানিলে দল পাকাইতে পারা যায় না ; এখানেই creed না থাকায় হিন্দুর সংঘ-বদ্ধতার অভাব ঘটে, এখানেই সামাজিক জীবনে হিন্দুর দৌর্বল্য। কিন্তু creed-এর বালাই নাই বলিয়া, পরমার্থ-সাধনের পথে হিন্দু মুক্ত।

[৩] প্রায় সব ধর্মের মতন হিন্দু এক শাশ্বত সত্তাকে মানে। সংক্ষেপে এই শাশ্বত সত্তার স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব। উঁহার প্রকাশ নানা ভাবে হয়। এই প্রকাশকে ধরিবার জন্য হিন্দু দুইটী মুখ্য পথকে স্বীকার করে—এক, জ্ঞানের পথ ; আর দুই, ভক্তির পথ ; যুক্তি ও তর্ক বা বিচারের পথ, এবং অনুভব বা অনুভূতির

পথ। হিন্দুদের মধ্যে কোনও-কোনও মতে একটীর দিকে বেশী করিয়া ঝোঁক দেওয়া হয়; যেমন শৈব চাহেন জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে, শাশ্বত সত্তাকে বুঝিতে; বৈষ্ণব চাহেন, ভক্তির দ্বারা ইহাকে আস্বাদন করিতে। সাধারণ হিন্দু আদর্শে দুইটীকেই রাখা হয়—জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি, বা ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান। এই দুই পথ পৃথক্, কিন্তু পরস্পরের পরিপূরক। এই দুই পথেরই সার্থকতা হিন্দু মানিয়া থাকে। সে হিসাবে, খ্রীষ্টান ধর্মকে কেবল ভক্তি-মূলক বা বিশ্বাস-মূলক ধর্ম বলা চলে।

[৪] বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ঐশ্বরিক সত্তা বা শক্তি বিদ্যমান. "খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে,"—ঐশী শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে বা বিশ্ব-প্রকৃতিতে লীলা করিতেছেন; মানব-দেহে মানব-প্রকৃতিতেও লীলা করিতেছেন; শক্তি-রূপে, কাম-রূপে, দুঃখ-রূপে, সুখ-রূপে মানুষের জীবনে এই শক্তি অদৃশ্য-ভাবে বিরাজমান, আবার জড় জগতের গতি ও অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এই শক্তি ক্রিয়মাণ। যেমন যজুর্বেদের শতরুদ্রীতে বলা হইয়াছে,—"হে রুদ্র-শিব, তুমি পাতায় আছো, তোমাকে নমস্কার; তুমি পাতার ঝরাতেও আছো, তোমাকে নমস্কার।" নিজের জীবনে এই শক্তিকে অনুভব করা, এবং এই শক্তির নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে তাল রাখিয়া জীবনকে চালানো; নিজের আভ্যন্তর নৈতিক জীবন এবং বাহ্য চরিত্রকে এই শক্তির সহজ ও সুষ্ঠু প্রকাশ-ক্ষেত্র করিয়া লওয়া—এইখানেই জীবনে ভগবানের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। হিন্দু ধর্মের ন্যায় সমস্ত স্বভাব-জাত ধর্মে, সমস্ত pagan ধর্মে, এই বিশ্বাত্মানুভূতি বিশেষ-ভাবে বিদ্যমান; এবং এই বিশ্বাত্মানুভূতি আছে বলিয়া, এই-সমস্ত ধর্ম, পরমেশ্বর বা শাশ্বত সত্তাকে নিজের ধর্মের বা সম্প্রদায়ের খাস সম্পত্তি বলিয়া ধরিবার ধৃষ্টতা কখনও মনে আনিতে পারে না। প্রাচীন গ্রীক ধর্ম, জাপানের শিন্তো ধর্ম, চীনের তাও ধর্ম,—এ-সমস্তই, এই দিক্ হইতে দেখিলে বোঝা যায় যে এগুলি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে এক পর্য্যায়ের। সর্ব জীবের প্রতি সহানুভূতি এই বিশ্বাত্মানুভূতির একটী প্রথম ও প্রধান সুফল; এই ধারণার অনুসারে, বিশ্ব প্রপঞ্চের মধ্যে মানুষ তাহার স্থান বুঝে, এবং দম্ভ-ভরে নিজেকে বিশ্বের সম্রাট্ বলিয়া মনে করে না, ঘোষণা করে না। সমস্ত বস্তু ও ধর্মের—বস্তুর স্বকীয় গুণ ও ক্রিয়ার—পিছনে সর্বব্যাপী শক্তির বা আত্মার প্রণিধান, এইরূপ মনোভাব ইহাতে সহজ হয়।

[৫] দুঃখনিবৃত্তি-চেষ্টাময়। মানুষের জীবনের জটিলতার এবং তাহার চির-বিদ্যমান অসামঞ্জস্যের সমাধানের পথও হিন্দু ধর্ম-চিন্তায় প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়া আছে। জীবনে দুঃখ আছে—এই দুঃখকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দুঃখ দূর করিয়া নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল বা কল্যাণ লাভের উপায় কি?

সেই প্রকার কল্যাণ লাভ করা যায় কি না? নানা ভাবে মনীষিগণ এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমষ্টি-গত ভাবে সেই সমস্ত উত্তরেরই আবশ্যকতা ও কার্য্যকারিতা আছে। ঈশ্বরকে মানিয়া অথবা না মানিয়াও এই উত্তরদানের চেষ্টা হিন্দু জাতির মধ্যে হইয়াছে। প্রত্যেক উত্তরের যে একটা স্থান আছে, তাহা হিন্দু ধর্ম মানিয়া লয়। এই জন্য, ব্রহ্ম, মোক্ষ, নির্বাণ, সারূপ্য, সাযুজ্য, সান্নিধ্য, সালোক্য প্রভৃতি অবস্থায় পহুঁছিয়া দুঃখ-মূল সংসার বা কর্ম হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, নিজ নিজ জীবনে ইহা উপলব্ধি করিয়া ভারতের মনীষীরা জন-সমাজে এই সমস্ত মুক্তি-মার্গ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম প্রভৃতি দুঃখ-শান্তির পথের সাধন; এই সাধনগুলির পিছনে আছে, অহিংসা, আত্মদান, মৈত্রী, করুণা, তিতিক্ষা, প্রভৃতি নৈতিক বা চারিত্রিক গুণ। দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্টা নানা প্রকারের হইবেই, কারণ বিভিন্ন মানুষের মনে দুঃখের সম্বন্ধে ধারণা নানা প্রকারের, এবং মুক্তির স্বরূপও নানা প্রকারের। কিন্তু মানুষের জীবনের সব দিক্ হইতে দুঃখকে তো দূর করিবার প্রয়াস করিতেই হইবে—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, সব প্রকারের দুঃখ। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতারা এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইয়া, যুক্তি ও তর্কের সঙ্গে বিচার করিয়াছেন, এবং স্ব স্ব মানসিক প্রবণতা অনুসারে ও শিক্ষা এবং রুচি অনুসারে, বিভিন্ন পথ বা সাধন, বিভিন্ন আদর্শ আমাদের সামনে ধরিয়া গিয়াছেন। পথ এক নহে, বহু; আমরাও নিজ নিজ রুচি, শিক্ষা ও শক্তি অনুসারে এই সমস্ত পথের একটা ধরিয়া লইতে পারি; অথবা যদি নূতন পথ, যাহা শাশ্বত সত্তার সঙ্গে যোগ হারায় না, আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহাতেও আপত্তি নাই, কারণ হিন্দুধর্মের মত স্বভাব-জাত ধর্মে বিবর্তন অপেক্ষিত—কোথাও শেষ কথা বলিয়া full stop দিবার বা দাঁড়ি টানিবার হুকুম নাই।

[৬] হিন্দুধর্ম বিশ্বঙ্কর; ইংরেজীতে যাহাকে বলে all-inclusive, সেই গুণ হিন্দু ধর্মে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। বিশ্বাত্মানুভূতি হইতেই ধর্মের বিশ্বঙ্করত্ব। 'ধর্ম' অর্থে হিন্দু কেবল অজ্ঞাত শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া মনে করে না। 'ধর্ম' অর্থে— যাহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে; সমস্ত বস্তুর গুণ ও কর্ম, ধর্ম-শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয়। মানুষের জীবনের সমস্ত কার্য্য ধর্ম দ্বারাই পরিচালিত, 'ধর্ম' দ্বারাই দেশিত; কেবল বাহ্য লৌকিক আচারকে লইয়া হিন্দু ধর্ম নহে; আচার এবং লৌকিক বিধি-নিষেধ, দেশ-কাল-পাত্রভেদে অবস্থাগতিকে সমাজ-রক্ষার, সামাজিকগণের সুখ-সুবিধার জন্য গঠিত; ব্যবহারিক-ভাবে এগুলিকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হয়: কিন্তু "এহ বাহ্য";—এই সকল লৌকিক ধর্মের পিছনে বা এগুলির প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ

যে "নিত্য-ধর্ম", যে-সকল নৈতিক ধর্ম বিদ্যমান, সেইগুলির উপরই প্রথম ও প্রধান ঝোঁক দেওয়া হয়। বাহ্য নাম ও রূপ,—এগুলি হইতেছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শাশ্বত সত্তার বিবিধ বাহ্য বিকার; এগুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিরোধ নাই—সকল জাতির মধ্যে উদ্ভূত সর্বপ্রকারের ধর্ম-চেষ্টাকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে; কারণ হিন্দু জানে যে, "যাহা আছে তাহা এক; পণ্ডিতেরা বহু ভাবে তাহার বর্ণনা করেন"; অতএব কোনও কিছুকে, কি জীবনে, কি ধর্মবিশ্বাস-সম্বন্ধীয় মতবাদে, হিন্দুধর্ম বাধা দেয় না—সেই হেতু হিন্দুধর্ম বিশ্বজনীন।

ইহার উপরে আরও কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করা যায়; সেগুলিরও ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে করা হয়। যেমন "অহিংসা"; ব্রাহ্মণ এই অহিংসার এক রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জৈন আর এক রকম, বৌদ্ধ আর এক রকম; কিন্তু বিশ্বাত্মানুভূতি হইতে অহিংসা-বৃত্তির উদ্ভব; ইহার মূল প্রেরণা এই ধরণের মনোভাব—"প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা, ভূতানামপি তে তথা। আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ ॥"[১] অর্থাৎ 'নিজের প্রাণ যেমন নিজের কাছে প্রিয়, অন্য প্রাণীদেরও তাহাই; এইজন্য সাধুগণ নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া করেন।' অহিংসার অন্তর্নিহিত মনোভাবে এখনও পৃথিবীর বহু বহু জাতি পঁহুছায় নাই। খামখা রক্তপাতে জুগুপ্সা, সকলের সঙ্গে ভদ্র-ভাবে মিলিয়া চলা,—এইরূপ সভ্য আদর্শ যতক্ষণ না জগতের লোকে গ্রহণ করিতেছে, ততদিন অহিংসার আদর্শ সমগ্র মানব-সমাজে স্বীকৃত বা আদৃত হইবে না। "অহিংসা" ছাড়া,—শাশ্বত বস্তুর আকর্ষণে ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসকে হিন্দুধর্মে দার্শনিক আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস খ্রীষ্টান ধর্মেরও আদর্শ, অন্য ধর্মেও আছে; কিন্তু হিন্দুধর্মানুমোদিত ত্যাগের আদর্শ একটু বৈশিষ্ট্যময়, একটু অন্তর্মুখী।

স্বভাব-জাত, শাশ্বত, স্বতন্ত্র ও বিশ্বজনীন ধর্ম এই হিন্দু ধর্মে আবার বিশেষ করিয়া দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ ভারতের সভ্যতার রঙও যথেষ্ট লাগিয়াছে। যেমন আর্য্য ও অনার্য্যের চিন্তাধারার ও অনুষ্ঠানের মিলন ও মিশ্রণের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই ইহার উদ্ভব ও বিকাশ; অনার্য্যের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত আর্য্যের ভাষা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ইহার প্রধান বাহন; আর্য্য-অনার্য্যের ধর্মানুষ্ঠান হোম যোগ ও পূজা প্রভৃতিতে ইহার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। কিন্তু সকলেই জানেন, এগুলি বহিরঙ্গ; ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপে বা প্রকাশে, বিশেষ ভাষা, বিশেষ ধরণের সাধন-পথের অপেক্ষা নাই। আবাঙ্‌মনোগোচর, ভাষাতীত, মানব-জীবনের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য

সমস্ত পার্থিব জ্ঞানের ঊর্ধ্বে বিদ্যমান যে সত্তা, তাহা যে কোনও লৌকিক অবস্থার সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে যুক্ত নহে,—হিন্দু যতটা জোরের সঙ্গে একথা বলিয়াছে, যতটা গভীর ভাবে ইহার অনুভব করিয়াছে, এমন আর কোনও ধর্মের লোকে নহে। সেই জন্য, সুদূর বৃহৎ-ভারতের এক অংশ, যবদ্বীপের পূর্বে অবস্থিত বলিদ্বীপে অনেক স্থানীয় রাজা, হিন্দুধর্মাবলম্বী বলিয়া নিজের পরিচয় সগর্বে যিনি দিয়া থাকেন, তিনি, পূজা, দেবার্চনা, দেবতা-বাদ, শ্রাদ্ধ, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়া এবং কথা কহিয়া, শেষে প্রশ্ন করেন, "মানুষের জীবনে লক্ষ্য কি ?" এবং নিজেই যে উত্তর দেন, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে এই রূপ দাঁড়ায়—"নামরূপ দ্বারা সীমিত লৌকিক ধর্ম, ও তাহার অনুষ্ঠান পালন করা, ইহা জীবনের লক্ষ্য নহে, সত্য 'ধর্ম' নহে ; লক্ষ্য হইতেছে—নির্বাণের সাধন, পরম সত্তার সাক্ষাৎকার।" ইহাই হিন্দুধর্মের সার এবং শেষ কথা। লৌকিক ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা, নিচের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ; সার সত্য, মানুষের পরমার্থ হইতেছে ইহাই—বিশেষ কোনও ধর্মমতের অতীত শাশ্বত সত্যের লাভ ॥

[আশ্বিন, ১৩৫০]

হিন্দু আদর্শ ও বিশ্ব-মানব

কোনও আদর্শ বা মানোভাব একটী বিশেষ কোনও জাতির বা জনসংঘের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। প্রচার ও শিক্ষার ফলে ইহাকে সর্বজন-গ্রাহ্য করিয়া তুলা যায়, ইহা তখন বিশ্ব-মানবের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে জাতির বা যে জন-সমাজের মধ্যে আদর্শটী বা মনোভাবটী সাধারণ্যে পালিত, অনুসৃত বা স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেই জাতি বা জন-সমাজের নামের সঙ্গে ইহাকে জড়িত করিয়া রাখিতে আপত্তি না হইতে পারে, এবং আপত্তি হওয়া উচিতও নহে। ভারতের হিন্দু জনসংঘের মধ্যে বিদ্যমান কতকগুলি আদর্শ ও মনোভাব বিশ্বজনের গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হয় ; কিন্তু সেই আদর্শ বা মনোভাবগুলি এখনও পৃথিবীর তাবৎ জনগণের মধ্যে ব্যাপক-ভাবে গৃহীত নাই। উপস্থিত সেই আদর্শ বা ভাবগুলিকে আমরা 'হিন্দু আদর্শ' এবং 'হিন্দু ভাব'-ই বলিব ; এক কথায়, 'হিন্দুত্ব' বলিব। হিন্দুত্বের লক্ষণ কি, এবং

বিশ্ব-মানবের পক্ষে ইহার উপযোগিতা বা উপকারিতা কতদূর, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

হিন্দুত্বের সংজ্ঞা বা লক্ষণ নির্দেশ করিবার প্রয়াস অনেকে করিয়াছেন। এ বিষয়ে যথোচিত অধ্যয়ন, অভিনিবেশ ও উপলব্ধি, এ তিনেরই অভাব আমার আছে; তথাপি আমিও এই অনধিকার-প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছি, এ বিষয়ে আমার অভিমত প্রকাশ করিয়াছি; আমার এই ধৃষ্টতার একমাত্র কারণ, হিন্দুত্বকে আমি যে ভাবে বুঝিয়াছি তাহাতে তাহার প্রতি আমার আন্তরিক আকর্ষণ ও অনুরাগ। আমার মনে হয়—হিন্দুত্বের লক্ষণ বা সংজ্ঞা বা প্রতিষ্ঠা এই ভাবগুলিকে লইয়া: (১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে একটী শাশ্বত সত্য বিদ্যমান আছে, এই আস্থা বা বিশ্বাস বা উপলব্ধি,—সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই সত্তার অপরিহার্য্য গুণ বা লক্ষণ; মানুষ নিজ জীবনে জ্ঞান অথবা অনুভূতি দ্বারা এই সত্তার পরিচয় লাভ করিতে পারে। (২) পৃথিবীতে, বিশেষ করিয়া মানব-জীবনে, যে দুঃখ আছে, তাহার নিরসনের পথ নির্ণয়ের চেষ্টা। (৩) মানব এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ শাশ্বত সত্তার সহিত সংযুক্ত, মানব বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন বস্তু বা পদার্থ নহে, সে বিশ্বেরই অংশ, যে বিশ্বের মধ্যে পরমাত্মা বা শক্তি বা ঋত অর্থাৎ শাশ্বত সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে, উহার মধ্যে কার্য্য করিতেছে। (৪) শাশ্বত সত্তার উপলব্ধি মানবের পক্ষে একমাত্র পুরুষার্থ, এবং এই পুরুষার্থের সাধনের উপায় বা পথ এক নহে, বহু; শাশ্বত সত্তা বহুপ্রকাশময়। একটী বিশেষ প্রকারের উপলব্ধি বা অনুভূতি, শাশ্বত সত্তায় বা পরম সত্যে পহুঁছিবার একমাত্র উপায় নহে। হিন্দুত্ব একটী বিশিষ্ট ধর্ম্মমতকে আশ্রয় করিয়া নহে; 'যত মত, তত পথ', ইহাই হইতেছে ইহার এক লক্ষণীয় আদর্শ। মানব নিজের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা পায়, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে; সব মানুষকে একটী বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের অধীনে আসিতেই হইবে, ঈশ্বর বা শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে একটী নির্দিষ্ট ধারণা তাহাকে পোষণ করিতেই হইবে, অন্যথা তাহার মুক্তি নাই—হিন্দুত্ব এরূপ বিচার স্বীকার করে না, বরং এইরূপ বিচারকে অশ্রদ্ধেয় এবং অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করে।

হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আরও দুই-একটী কথা আমাদের জানিয়া রাখা চাই। ধর্ম-মাত্রেই মানুষের নৈতিক জীবন বা নৈতিক চরিত্রের একটা উচ্চ আদর্শ আছে। হিন্দুধর্মেও তাহাই। এই-সব চরিত্র-নীতি, যাহা ধর্মের নিত্য প্রতিষ্ঠা, যাহা দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ নহে, যেমন সত্য অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি, এগুলিকে হিন্দুধর্মে 'নিত্য

ধর্ম' বলে। ইহার পরে আসে 'লৌকিক ধর্ম', যাহা দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ। এ ছাড়া, হিন্দুর সম্বন্ধে আরও দুইটী বড় কথা আছে। এক—এটী হইতেছে সহজ বা প্রকৃতিজ ধর্ম, ইংরেজীতে যাহাকে natural religion বলে। এই ধর্ম, মাত্র একজন বিশিষ্ট অবতার বা ঋষি বা চিন্তানেতার উপদিষ্ট নহে, ইহা স্বাভাবিক-ভাবে একটী সমগ্র জন-সমাজের চিন্তানেতাদের বহুযুগব্যাপী সাধনা ও চিন্তার ফলে ধীরে-ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য ইহা সমগ্র জীবনের মত সর্বঙ্কর। আর, দুই—ইহার সহিত জড়বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নাই। পঞ্চেন্দ্রিয় সাহায্যে অবলোকন ও অনুশীলন করিয়া বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞান যে এত বিস্ময়কর তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার সহিত হিন্দুধর্মের সাধারণ attitude অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গীর বা ব্যবহারের একটা সহজ সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। ঐশী শক্তি বা শাশ্বত সত্তা 'খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে', বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে লীলায়িত, আবার মানুষের দেহপিণ্ডে অর্থাৎ দেহ ও দেহাশ্রয়ী ধর্মসমূহেও লীলায়িত ; এই এক শক্তির বিশ্বগ্রাহিতা-সম্বন্ধে দরদ বা বোধ, হিন্দুত্বকে সত্যই in tune with Infinity—বৈজ্ঞানিক অর্থে যে Infinity ধরা যায়, যে অনন্তকে ও বিশ্বরূপকে ধরা যায়, তাহার সহিত এক সুরে বাঁধিয়া দিয়াছে। এ সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী Romain Rolland রোমঁ্যা রোলঁ্যা যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিয়া দিবার মতন (শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমারস্বামীর বিখ্যাত পুস্তক The Dance of Siva-র ফরাসী অনুবাদের ভূমিকায় রোলঁ্যা যাহা লিখিয়াছেন তাহার ইংরেজী অনুবাদ) :—But after having allowed myself to be swept away by the powerful rhythm of Brahmin thought, along the curve of life, with its movement of alternating ascent and return, I come back to my own century, and while finding therein the immense projections of a new cosmogony, offspring of the genius of Einstein, or deriving freely from his discoveries, I yet do not feel that I enter a strange land. For, in the journey of the spirit across stellar space, even to the deeps of the planetary void, amid the Islands of the Cosmos, the nebular spirals, the countless Milky ways, and through the millions of creations which sweep along down Space-and-Time, that endless, limitless arc, the rays of whose suns, revolving eternally, could light up phantom,

insubstantial worlds, I yet can hear resounding still the cosmic symphony of all these planets which for ever succeed each other, are extinguished and once more illumined, with their living souls, their humanities, their gods—according to the law ot the eternal To Become, the Brahmin Samsara – I hear Siva dancing, dancing in the heart of the world, in my own heart.

এই সুন্দর উক্তির বাঙ্গালা অনুবাদ দিবার চেষ্টা করিব না। সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ্য চিন্তার পরিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে এই আইনষ্টাইন্ প্রমুখ মনীষীদের আবিষ্কৃত দেশ-কালাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে পুনরাগমন করিলে, আমার মনে হয় না যে আমি কোনও সম্পূর্ণ বিপরীত ও নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। আধুনিক বিজ্ঞান যেভাবে এখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কে দেখিতেছে, তাহা ব্রাহ্মণ্য চিন্তায় 'সংসার' অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েরই অনুরূপ একটা কিছু ; এই বিশ্ব-সংসারের গতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য চিন্তার দ্বারা কল্পিত বা উপলব্ধ সেই নটরাজ শিবেরই নৃত্যচ্ছন্দ আমি শুনিতে পাইতেছি— কেবল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নহে, আমার অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যেও।

প্রাচীন ও মধ্য যুগে হিন্দু চিন্তা (হিন্দু অর্থে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, সবই) মানব-জাতির উন্নয়নের জন্য সমগ্র এশিয়া-খণ্ডে ও আংশিকভাবে পূর্ব-ইউরোপে যাহা করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের কথা, সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না। হিন্দু দর্শনের গভীরতম তথ্যগুলি হইতেছে মানুষের আভ্যন্তর জীবনের আশা-আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া। সেগুলির সামাজিক মূল্য বা কার্য্যকারিতা হইতেছে পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নহে। কোনও জড়-বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিরোধ নাই এবং কোনও মানবের সহিত ইহার বিরোধ নাই,—এই দুইটীই হইতেছে হিন্দু আদর্শের বা হিন্দুত্বের সব চেয়ে বড় মানসিক এবং সামাজিক বা ব্যবহারিক দিক্ এবং এইখানেই বিশ্ব-মানবের কাছে হিন্দুত্বের একটা মস্ত যুগোপযোগী বাণী আছে। সাধারণতঃ মূসাঈ বা ইহুদী ধর্ম, ঈসাঈ বা খ্রীষ্টান ধর্ম ও মোহম্মদীয় বা ইসলামী ধর্ম, এই তিনটীতে যে মনোভাব দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক তাবৎ natural religion অর্থাৎ সহজ বা প্রকৃতিজ ধর্মে দেখা যায় না—যেমন প্রাচীন অসুর-বাবিলনের ধর্মে, মিসরীয় ধর্মে, গ্রীক ধর্মে, চীনা ধর্মে, আমেরিকা ও আফ্রিকার ধর্মে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপময় জগতের ধর্মে। আমার ধর্মের প্রতি ঈশ্বরের অথবা শাশ্বত শক্তির একটা পক্ষপাতিত্ব আছে, অথবা আমার কল্পিত বা

অনুভূত ঈশ্বরই হইতেছেন সত্য, অপরের কল্পিত বা অনুভূত বা উপলব্ধ ঈশ্বর ঝুটা,—এরূপ মনোভাবকে সভ্য বা সংস্কৃতিপূত মানবের মনোভাব কোনও কালে কেহ বলিবে না। হিন্দু জাতির মধ্যে এরূপ অসহিষ্ণু মনোভাব যে কখনও দেখা দেয় নাই, একথা বলা চলে না; কিন্তু হিন্দু সমাজ বা হিন্দু জাতি, ব্যাপক ভাবে সে মনোভাবে সায় দেয় নাই,—যাহাদের মধ্যে এরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব আসিয়াছে, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-নিবদ্ধ হইয়াই রহিয়াছে। অপর পক্ষে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যেও যে উদারতার ও পরমত-সহিষ্ণুতার অভাব ছিল, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বহু খ্রীষ্টান ও মুসলমান সাধক নিজ চিন্তায় ও আচরণে ঈশ্বরানুভূতির অনন্ত স্বরূপের কথা স্বীকার করিয়াছেন; ইহুদী জাতির মধ্য হইতে আধুনিক কালে চিন্তার স্বাধীনতার আবাহনকারী বড়-বড় মনীষী উদ্ভূত হইয়াছেন। ইস্‌লামের মধ্যে বিশেষ করিয়া সূফী অনুভূতি ও দর্শন যে বিশ্বমানব-গ্রাহ্য সর্বন্ধর উদার মনোভাবে পহুঁছিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর, পুলকাবহ; হিন্দুত্বের সঙ্গে তসওউফ বা সূফী অনুভূতি এখানে হাত-ধরাধরি করিয়া চলিতে পারে, উভয়ে মিলিত ভাবে বিশ্বমানবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু natural religion-এর প্রতিষ্ঠার উপরে দণ্ডায়মান বলিয়া হিন্দু অনুভূতি ও পরমত-সহিষ্ণুতা যেখানে একটী সহজ ও স্বাভাবিক বস্তু হইয়া দেখা দিয়াছে, এবং ব্যাপক ভাবে হিন্দু জাতি কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, সূফী মনোভাবকে সেখানে সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে, পরমতাসহিষ্ণুতার সঙ্গে, 'সত্য আমারই আয়ত্তাধীন, আর কাহারও নহে' এইরূপ মনোভাবের সঙ্গে, এবং 'আমার কল্পিত সত্য যাহারা না মানে, তাহারা সত্যের শত্রু, ঈশ্বরের শত্রু, অতএব তাহাদের বিনাশ ঈশ্বরের অভিপ্রেত' এইরূপ ব্যবহারের সঙ্গে, বহু বিরোধ করিয়া তবে নিজ স্থান করিয়া লইতে হইয়াছে; সমাজের একটা বড় অংশে স্থান করিয়া লইতে পারিলেও, সূফী-মতের বিরোধী সঙ্কীর্ণতা এখনও দূরীভূত হয় নাই। যাঁহারা এবিষয়ে একটু আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই এই উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন।

আমরা বিরোধের দিকে জোর দিব না, বিরোধকে আমরা অস্বীকার করিব। যেখানেই আমরা হিন্দু আদর্শের সঙ্গে আপনাকে খাপ খাওয়াইতে পারে, এমন উদার মনোভাব দেখিব, সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইব। পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির মানুষ একই সার সত্যের পথে যাত্রী; এই যাত্রাপথে পরমত-সহিষ্ণু হিন্দু আদর্শ যতটা সহায়ক হইতে পারিবে, পরমতকে না বুঝিয়া তাহাকে 'ন-স্যাৎ' করিয়া বর্জন বা বিনাশ করিবার মতন আদর্শ বা মনোভাব ততটা পারিবে না;

কেবল তাহাই নহে, ইহা বিভেদ ও বিরোধিতা আনিবে। আজকাল Imperialism-এর দিন চলিয়া যাইতেছে, Totalitarianism-এ কেহ সায় দিবে না ; ধর্ম-জগতেও সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বগ্রাসিতা বা সর্বধ্বংসিতার কাল আর নাই। Discord বা বিবাদ না আনিয়া, Harmony বা সংবাদের সাহায্যে, এক নূতন বিশ্ব-সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার কথা সকল দেশের মনীষীরা চিন্তা করিতেছেন। হিন্দু আদর্শ—অর্থাৎ, নিজ মূল প্রকৃতিতে বা অবস্থানে অথবা স্বরূপে, এক, অখণ্ড এবং অদ্বিতীয় শাশ্বত সত্য যে প্রকাশে বহুরূপ ও বহুমুখ, এবং এইহেতু নানাভাবে ইহার উপলব্ধি যে সম্ভব, এই বোধ—বিশ্বসংস্কৃতি গঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য বিশ্বমানবের সেবায় 'হিন্দু' মনোভাবের একটা বিশেষ মূল্য আছে ॥

[কার্ত্তিক, ১৩৫০]

ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্তর-ভারত

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কবি Rudyard Kipling র‍্যাডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙ কোথায় বলিয়াছেন—He knows not England who only England knows, অর্থাৎ যে খালি ইংলাণ্ডকেই জানে, সে সত্যকার ইংলাণ্ডকে জানে না। কথাটী খুব খাঁটী। পরিধি বা বৃত্ত হইতে না দেখিলে, নিজ প্রতিষ্ঠায় বা কার্য্যকারিতায় কেন্দ্রকে ঠিক বুঝা যায় না ; এবং কোনও ক্রিয়ার মূল্য বা উপযোগিতা নির্ধারণ করিতে হইলে, তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখা আবশ্যক। কিপ্‌লিঙ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ইংলাণ্ডের কার্য্যাবলীর সার্থকতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন বলিয়াই এ কথা লিখিয়াছিলেন—যদি ইংলাণ্ডের অধিবাসী ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চায়, তাহা হইলে দেখ, বাহিরের নানা জাতির মধ্যে গিয়া ইংলাণ্ডের লোকেরা কত বড় সব কাজ করিয়াছে ও করিতেছে।

মানুষকে সভ্য এবং মানবোচিত পদে উন্নীত করিবার জন্য পৃথিবীতে যে-সমস্ত মনোভাব ও চেষ্টা কার্য্যকরী হইয়াছে, ভারতের সংস্কৃতি সেগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রায় সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের বৃহত্তর অংশের মধ্যে উচ্চ কোটির আধ্যাত্মিক জীবন বলিতে, ভারতবর্ষের জ্ঞানী ও ধর্মাত্মাদের দ্বারা আবিষ্কৃত, শৃঙ্খলিত এবং মানবের উপযোগী করিয়া প্রতিষ্ঠিত শাশ্বত ভাবাবলীর আহ্বানে

এশিয়া-খণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ কিভাবে সাড়া দিয়াছিল, মুখ্যতঃ তাহাকেই বুঝায়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এশিয়া-খণ্ডের বহু পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে সর্ব-প্রধান সংস্কৃতি-বাহক শক্তির আগমন ভারতবর্ষ হইতেই হইয়াছিল। একজন ফরাসী লেখক, খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রারম্ভ হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার বছর ধরিয়া, ভারতবর্ষে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার পর হইতে ভারতে তুর্কী-বিজয় পর্য্যন্ত, এশিয়া-মহাদেশে ভারতের সভ্যতার প্রসারের কথা বিচার করিয়া ভারতকে L' Inde Civilisatrice অর্থাৎ India the Civiliser, 'সংস্কৃতিবাহী ভারতবর্ষ' এই আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন ; এই আখ্যা ভারতের পক্ষে খুবই সমীচীন। এই দুই হাজার বছরের মধ্যে আমরা এক দিকে যেমন ভারতবর্ষের মধ্যে সারা দেশের জনগণকে একই সংস্কৃতির বাঁধনে অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা হইতে দেখিতেছি, তেমনি অন্যদিকে সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক দিগ্‌বিজয় সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে, আফগানীস্থানে ও মধ্য-এশিয়ায়, শ্যাম, কম্বোজ ও চম্পায়, মালয় উপদ্বীপে ও দ্বীপময় ভারতে—সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতিতে—বিস্তৃত হইতেছে, ইহাও দেখিতেছি ; এবং এই যুগের মধ্যে বিশেষ করিয়া ইহার দ্বিতীয়ার্ধে, ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাশক্তির সহিত সংস্পর্শে আসিয়া সুসভ্য চীনের সংস্কৃতিতে এক অপূর্ব পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিতেছি। চীনের শিষ্য কোরিয়া ও জাপান এবং তোঙ্‌-কিঙ্‌ ও আনামও ভারত-ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত এক অভিনব সংস্কৃতিতে এই যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখিতেছি। ওদিকে মুসলমান জগতেও ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতের সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে কার্য্য করিতেছে, এবং ভারতের দর্শন—বেদান্ত—পরোক্ষভাবে সুফী অনুভূতি-মূলক দর্শনকে গড়িয়া তুলিতে ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কিন্তু ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি, অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতি, কেবল একটী সামান্য বা সাধারণ সভ্য জগৎ মাত্র ছিল না। এশিয়ার বহু পশ্চাৎপদ জাতির কাছে উচ্চ ধরণের সামাজিক রীতি-নীতি এবং জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও সঙ্গে-সঙ্গে সব প্রকারের শিল্প ও কলা এবং মানসিক শিক্ষা তখনই প্রথম উদিত হইল, যখন তাহাদের মধ্যে ভারতীয় বণিক্ আসিয়া পহুঁছিলেন, এবং বণিকের সঙ্গে-সঙ্গে আসিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পুরোহিত ; এই ব্যাপার খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্ব হইতেই, সম্ভবতঃ বুদ্ধ-জন্মেরও পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল : বৌদ্ধ ধর্মের পরে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুও আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাদের আগমনে এই সকল পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত

জাতির লোকেরা—যেমন, ইন্দোচীনের ও দ্বীপময় ভারতের অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং অস্ট্রোনেসীয় জাতি, ইন্দোচীনের এবং তিব্বতের ভোট-চীন গোষ্ঠীর দৈ বা থাই অর্থাৎ শ্যামী জাতি, ম্রন্-মা বা ব্যন্মা অর্থাৎ বর্মী জাতি এবং বোদ্ অর্থাৎ ভোট বা তিব্বতী জাতি, মধ্য-এশিয়ার অত্যুন্নত ঈরানী জাতি (শূলিক বা সোগ্‌দীয় এবং কুস্তন বা খোতানী) এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ঋষিক বা তুষার অথবা কুচী জাতি, তথা মধ্য ও উত্তর-এশিয়ার তুর্কী ও মোঙ্গোল জাতি—কেবল যে পার্থিব সভ্যতায় উন্নত হইয়াছিল, তাহা নহে ; ভারতের চিত্ত এবং চর্য্যার সোনার কাঠির স্পর্শে ইহাদের সুপ্ত মানসিক ও অন্যবিধ শক্তি প্রাণ পাইয়া জীয়ন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই-সকল জাতির লোকেরা এই স্পর্শলাভের ফলে, কোনও প্রকার বাধা-গ্রস্ত না হইয়া তাহাদের শক্তির সম্পূর্ণ স্ফুরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; তাহাদের চিত্তের এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক বিকাশের পথে, ভারতের সহিত সংস্পর্শের ফলে কোনও অসহিষ্ণু ও বিপরীত-ধর্মা মনোভাবের সহিত সংঘাত ঘটে নাই ; ভারতীয় মনোভাব এমন ছিল না যে এইসব জাতির চিন্তা-রীতির এবং অনুভূতির আধার-ভূমির বৈশিষ্ট্যকে অনুকম্পা-বিহীন দৃষ্টিতে দেখিয়া অস্বীকার করিবে ; অথবা উড়াইয়া দিতে চাহিবে। কারণ, ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা নিজেই একটী বিরাট্ সমন্বয় ও সর্বগ্রাহিতা বা সর্বস্বরত্বের ভিত্তির উপরে স্থাপিত ; এই সমন্বয় ও সর্বগ্রাহিতা মানব-সংক্রান্ত কোনও কিছুকে তাহার নিজ সত্তায় ঈশ্বরের কাছে অথবা অন্য মানবের কাছে অগ্রাহ্য অথবা জুগুপ্সার যোগ্য বলিয়া মনে করে না। ভারতের মধ্যে এবং ভারতের বাহিরে যে-সকল জাতি ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহাদের আত্ম-সম্মানের কোনও হানি না করিয়া, ভারতীয় হিন্দু চিত্তের এই মৌলিক উদারতা তাহাদের সভ্য মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল ; তাহারা এই সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত গভীর এবং বিস্তৃত জীবনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের নিজেদের আহৃত ও স্বকীয় বিশিষ্ট উপাদান-সম্ভারের দ্বারা, এই সংস্কৃতিকে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে আরও পরিবর্ধিত ও বিশ্বমানবের পক্ষে আরও উপযুক্ত করিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দু বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের মূলমন্ত্র ছিল, সকল প্রকার চিন্তা ও চর্য্যার সমন্বয়—একটী বিশিষ্ট বা বিশেষ শাস্ত্রানুসারী অথবা বিশেষ-সংঘ-নিয়ন্ত্রিত মতবাদের দ্বারা আর সমস্ত চিন্তা ও চর্য্যার দূরীকরণ, অপসারণ, অবনমন বা বিনাশ নহে। এই জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির কৃতিত্ব কেবল একটী বিশিষ্ট পার্থিব সভ্যতা বা সভ্য ও সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠাতেই নিবদ্ধ ছিল না। অবশ্য, ভারতীয় সংস্কৃতি তাহার নিজের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট আদর্শ ও ভাবরাজি অন্য

জাতির লোকেদের সমক্ষে আনিয়া দিয়াছিল, একথাও সত্য; কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটা বড় কাজ করিয়াছিল—অন্য জাতির স্বকীয় আদর্শ ও ভাবরাজিকে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিয়া এ কার্য্য করে নাই, বা বিনাশ করিবার চেষ্টা করে নাই। চীনের মত সুপ্রাচীন ও সুসভ্য জাতির পক্ষে (এশিয়া-মহাদেশে ভারত এবং চীন কেবল এই দুই দেশেই, অন্য জাতির মানুষকে সভ্য করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল এমন সংস্কৃতি, স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল), ভারতীয় চিন্তা ও চর্য্যার সহিত সংস্পর্শ তাহার স্বকীয় সভ্যতার পরিপূরণ করিতে এবং সেই সভ্যতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাইতে সহায়ক হইয়াছিল। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম চীনদেশে আসার ফলে, এই সুধী এবং কৃতী জাতির নিকটে মানব-জীবনের অস্তিত্বের এবং মানবের কর্ম-চেষ্টার মূল তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন করিয়া প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিয়াছিল, এবং এই প্রশ্ন সমাধানের আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিয়াছিল। বহু পূর্বে চীনা ঋষি লাও-ৎসি এইরূপ গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্ন চীনাদের মধ্যে উত্থাপন করেন; বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্মুখিতা দেখিয়া তিনি নিশ্চয়ই খুশী হইতেন; কিন্তু তাঁহার সময়ে চীনারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীরতার ধার ধারিত না; স্বয়ং খুঙ্-ফু-ৎসি, যিনি আধ্যাত্মিকতার বা রহস্যবাদের কথা বুঝিতেন না (এবং এইজন্য যিনি স্থূলদৃষ্টি, ভাব অপেক্ষা কর্মপ্রিয় চীনা জাতির গুরু বা চিন্তানেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন), তিনি লাও-ৎসি-প্রোক্ত নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম, বিশ্ব-নিয়ন্তৃ বিশ্বাত্ম-স্বরূপ 'তাও' বা ঋত এবং তাহার বাহ্য প্রকাশ বিশ্বজগতের ক্রিয়া, এইসব বিষয়ে লাও-ৎসির গভীর তত্ত্বকথা ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু উত্তর কালে ভারতের বৌদ্ধধর্ম আসিয়া চীনের মনে গভীরতর চিন্তার জ্যোতির্ময় স্পন্দন আনিয়া দিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে ভাবাবেগের প্রবল বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল; এবং এইভাবেই ভারতের সহিত মিলনে চীন যেন নিজ গভীরতম প্রকৃতিকে খুঁজিয়া পাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন যেখানেই গিয়াছিল, সেখানে ধ্বংস করিতে যায় নাই, গিয়াছিল পূর্ণতা আনিয়া দিতে। বিভিন্ন দেশে ইহা প্রাণদানকারী বর্ষাবারির মত আসিয়াছিল, ইহার আগমন একেবারেই মরুভূমির লু-বায়ুর-মত, অথবা ধ্বংসকারী মারীর মতন ছিল না। মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা ও পেরু দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি যেভাবে রোমান-কাথলিক স্পেনের স্বর্ণ-গৃধ্নুতা, কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধ বর্বরতার হাতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে একটা বিক্ষোভ না আসিয়া পারে না। সহৃদয় ও কল্পনা-শক্তি-যুক্ত যে-কোনও সজ্জনের মনে, স্পেনীয়গণ কর্তৃক আমেরিকার এই-সব প্রাচীন সুসভ্য জাতির জন্য, এক

ধ্বংস-তাণ্ডবের মতই লাগিবে—এই ধ্বংস-কার্য্যের মধ্যে একটুখানিও মঙ্গলের আভাস নাই,—এক মেক্সিকো ও মধ্য-আমেরিকার জনগণের মধ্যে নরবলি-প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া; কিন্তু এই নরবলি বন্ধ করিয়া যেটুকু মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, তাহার পরিবর্তে স্পেনীয়েরা Inquisition অর্থাৎ ধর্মের নামে নিষ্ঠুর-ভাবে প্রাণবধের রীতি এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ক্রীতদাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। তাহাদের হাতে কয়েকটী সমগ্র জাতির নরনারীর কয়েক-শত-বর্ষব্যাপী ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, মানসিক ও আত্মিক অবনতি ঘটিতে থাকে—এখনও সর্বত্র সে অবনতির শেষ হয় নাই। আমেরিকার Aztec আস্তেক, Maya মায়া, Inca ইঙ্কা প্রভৃতি জাতির পক্ষ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে, স্পেনীয় বিজয় আসিয়াছিল যেন ইহাদের উপরে ঈশ্বরের অভিশাপ-রূপে; স্পেনের তথাকথিত 'উচ্চকোটি'র খ্রীষ্টান ইউরোপীয় সভ্যতা এইসব কৃতী ও সভ্য জাতির মধ্যে যে-ভাবে কার্য্য করিয়াছিল, তাহার ফলে ইহারা সব দিক্ দিয়াই বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইতে থাকে;—তাহাদের নিজেদের অবিনশ্বর প্রাণধর্মের ও প্রাণশক্তির সহায়তায় এবং নূতন যুগের কালধর্মের ফলে, মেক্সিকোতে তাহারা এখন এতদিন পরে এই অবস্থা কাটাইয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। আমেরিকার এইসব সুসভ্য আদিম জাতির লোকেদের পরমতাসহিষ্ণু স্পেনীয় রোমান-কাথলিক চিন্তা ও চর্য্যার অনুগামী করিয়া গড়িয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টার ফলে, ইহাদের জীবনের ও ইহাদের সংস্কৃতির যাহা নষ্ট হইয়াছে, অথবা নির্বোধ স্বার্থের ও ধর্মান্ধতার হাঁড়িকাঠে যাহাকে বলি দেওয়া হইয়াছে, তাহার অভাবে বিশ্বমানব-সংস্কৃতির ভাণ্ডার চিরকাল ধরিয়া অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমেরিকার আস্তেক, মায়া ও ইঙ্কা সভ্যতার সর্বোচ্চ কৃতিত্বের ও নানা গুণের কথা মনে করিয়া, আমরা তদ্‌বিষয়ে একটা আকুলতা অনুভব করিয়া থাকি; এবং এই সভ্যতাগুলির পক্ষে, ক্রমোন্নতির পথ ধরিয়া নিজ-নিজ বিশিষ্ট, আরও উচ্চ শিখরে আরোহণ করার সুযোগ বা অবাধ গতি স্পেনীয়দের আগমনের ফলে আর যে মিলিল না, এবং সেই হেতু মানব-জাতি যে এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া রহিল, একথা স্মরণ করিয়া আমরা বিষাদগ্রস্ত না হইয়া পারি না।

স্পেনীয় বিজেতাদের সঙ্গে মেক্সিকো বা পেরুর সংযোগ যদি কখনও না ঘটিত, তাহা হইলে তাহার জন্য দুঃখের কি থাকিতে পারে? কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত সংস্পর্শের ফলে, জীবনের এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক নানাবিধ অভিজ্ঞতার যে ঐশ্বর্য্য, সাহিত্য, শিল্পকলা ও ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে,

এবং তাহাদের মনের ও আত্মার যে বিস্ময়কর ও পুলকাবহ বিকসন ঘটিয়াছে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন যবদ্বীপ বা শ্যাম, চীন বা জাপানের কল্পনাও কি আমরা করিতে পারি? আজকাল আমেরিকার বিশেষ করিয়া মেক্সিকোর, এ-পর্য্যন্ত ক্রীতদাসের অবস্থাতে অবনীত আদিম জনগণের মধ্যে এক পুনর্জ্জাগৃতির কথা আমরা পাঠ করি; এই পুনর্জ্জাগৃতির ফলে, মেক্সিকোর প্রাচীন আস্তেক দেবতা Quetzalcoatl কেৎসাল্‌কোআৎল্‌ বা Tlaloc ৎলালোক আবার সম্মানের সহিত পুনরুজ্জীবিত হইতেছেন এবং স্পেনীয়দের দ্বারা আমদানী করা রোমান-কাথলিক Saint নামধারী ঠাকুরদের স্থানে ইহাদের অংশতঃ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন চলিতেছে। স্পেনীয়দের আগমনের পূর্বে ইহাদের মধ্যে যে ধরণের গভীর ধর্মভাব ও অনুষ্ঠান ছিল, যে প্রাচীন পূজানৃত্য ও বিশেষ ধরণের নৈবেদ্য-অর্পণের রীতি ছিল, সে সব রোমান-কাথলিক ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হইয়া এখনও বিদ্যমান; সেই ধর্মভাব Guadalupe Hidalgo 'গুয়াদালুপে হিদাল্‌গো' নামক স্থানের গির্জায় রক্ষিত যীশু-মাতা মেরি বা মারিয়া-মাতাকে মেক্সিকোর আদিম জাতির রক্ষয়িত্রী জননীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এইরূপ নানা উপায়ে মেক্সিকোর আদিম জনগণ এতদিন পরেও অন্ধ-ভাবে জাতীয় প্রকৃতির ও মানসিক প্রবণতার পথ ধরিয়া নিজ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; যে রোমান-কাথলিক ধর্ম তাহাদের সংস্কৃতির ঘাড়ের উপরে চড়িয়া বসিয়াছে, যাহা তাহাদের চিন্তা ও চর্য্যাকে না বুঝিয়া কেবল নির্বোধ-ভাবে ও নিষ্ঠুর-ভাবে ধ্বংস করিবার প্রয়াসই করিয়াছে, তাহার অনুমোদিত আত্মপ্রকাশ তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই ও হইতেছে না। স্পেনীয়দের শিক্ষায় এতাবৎ আমেরিকার প্রাচীন জাতিগুলি নূতন কিছুরই সৃষ্টি করিতে পারে নাই—পুরাতনকে হারাইতে তাহাদের বাধ্য করা হইয়াছে, এবং তাহার স্থানে নূতনকে আপনার করিয়া লইবার শক্তিও তাহাদের বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশ ভারত হইতে যাহা পাইয়াছিল, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহা আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছে; ভারতের রামায়ণ ও মহাভারত এবং প্রাচীন যবদ্বীপ ইতিহাসের উপাখ্যান লইয়া তাহারা তাহাদের বিশিষ্ট কৃতিত্ব ছায়ানাটক এ নৃত্যনাটক সৃষ্টি করিয়াছে; শ্যাম, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে শিল্পকলা বিষয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। চীনদেশের কবিতায় ও চিত্রে, ভাস্কর্য্যে ও অন্য শিল্পে, বৌদ্ধ প্রভাব ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত; এবং জাপানের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। আমরা কি রামায়ণ-মহাভারত-বিহীন যবদ্বীপ, বুদ্ধচরিত-বিহীন শ্যাম, অমিতাভ-অবলোকিতেশ্বর-মৈত্রেয়-বিহীন চীন ও জাপানের

কথা ভাবিতে পারি? এমনি ভাবেই ভারত এই-সব দেশে নিজের সত্তাকে ইহাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। এই ব্যাপারের সঙ্গে একমাত্র ইউরোপে খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রসারের কথা তুলিত হইতে পারে; এই প্রসার সম্ভবপর হইয়াছিল এই জন্যই যে, ইহুদী-মূল খ্রীষ্ট-ধর্ম বরাবরই আপস করিয়া চলিয়াছিল—প্রথমটায় গ্রীক দর্শন ও ইতালীয় বহুদেব-বাদের সঙ্গে, পরে উত্তর-ইউরোপের জাতিসমূহের পূজাপার্বণ ও ধার্মিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে; এবং খ্রীষ্টান ধর্মের বিকাশ ও প্রসার কোনও জাতি-বিশেষের একার কৃতিত্বের ফল নহে—সমগ্র ইউরোপের জাতিবর্গ মিলিয়া ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, রূপে ও রসে ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

২

দেশ-জয় অথবা বাণিজ্যের পথ ধরিয়া সভ্যতার প্রসারের কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইন্দোচীন ও দ্বীপময়-ভারতে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রসারও নিশ্চয়ই ভারত ও ঐ-সব দেশের মধ্যে বাণিজ্যের আদান-প্রদানের পথেই ঘটিয়াছিল। এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন) সভ্যতার ধারা, নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণের পূর্ব হইতেই—অনার্য্যদের সময় হইতেই—ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-ঘটিত যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ভারতের আর্য্য-পূর্ব যুগের অনার্য্য (দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক) উপাদান ও নবাগত আর্য্য উপাদান সম্মিলিত হইয়া, উত্তর-ভারতে পঞ্চনদ ও গঙ্গার দেশে, 'হিন্দু' সংস্কৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল ('হিন্দু' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্রাহ্মণ্য জৈন বৌদ্ধ সকলকেই বুঝাইতে ব্যবহার করা হইতেছে), খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শতক পূর্বে তাহার বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিল। আর্য্যদের ভাষা—সংস্কৃত ও প্রাকৃত—এই সভ্যতার বাহন হইল; এবং ইহার বাহ্য রূপ বা আকার এবং সংগ্রন্থন হইল আর্য্যজাতির ছাঁচ লইয়া। এই নব-সৃষ্ট সংস্কৃতি, বর্ষায় নদীর জল যেমন কূল ভাসাইয়া দেয় সেইভাবে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়া ভারতের সীমান্তের বাহিরের দেশগুলিতেও—ইন্দোচীন, দ্বীপময়-ভারত এবং মধ্য-এশিয়ার নানা দেশে—গিয়া পহুঁছিল, যেন অতি সহজ ভাবেই। মনে হয়, প্রথম প্রসারের সময়ে এই ব্যাপারে বড় একটা সচেতন চেষ্টা ছিল না। কিন্তু একথা বলিলে ঠিক হইবে না যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রসার, কোনও অন্ধ নৈসর্গিক শক্তির মত, কিংবা অজ্ঞান inertia বা জাড্যের মত, কোথাও বাধা পায় নাই বলিয়াই ঘটিয়াছিল। হিন্দু সংস্কৃতির প্রসারের পথে কোনও-না-কোনও প্রকারের বাধা যে আসিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ; চীনদেশে কখনও-কখনও বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল

আন্দোলন দেখা দিত, তিব্বতেও এরূপ বিরোধ একাধিকবার প্রকট হইয়াছিল ; অন্যত্রও নিশ্চয়ই হইয়াছিল, তবে তাহার তেমন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। কারণ, যেখানেই বাহির হইতে নূতন কোন চিন্তা বা রীতি আসে, সেখানেই স্থানীয় রক্ষণশীল ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। এই-সব আপত্তি কাটাইয়া উঠিয়া তবে হিন্দু সংস্কৃতিকে নিজ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে হইয়াছিল। যাঁহারা ভারতের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলেন এবং যাঁহারা ভারতের বাহিরে উহার প্রসার করেন, তাঁহারা নিজেদের চেষ্টায়, সচেতন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন ; এবং ভারতবর্ষের মাটিতে বসিয়া নিদিধ্যাসন ও অনুশীলন দ্বারা যে চারিত্র্যের এবং পুরুষার্থের আদর্শে তাঁহারা পহুঁছিয়াছিলেন, তাহার বাণী স্বদেশের বাহিরের মানবগণের নিকট শুনাইবার জন্য একটী সুবোধ্য আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার বশেই তাঁহারা বিদেশে-গমন করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত দর্শনের মূল হয় তো আর্য্যদের দেবতার সম্বন্ধে নৈসর্গিক কল্পনায় ও মানুষী ধারণায় এবং অনার্য্যদের বিশ্বচরাচরে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান ঐশী শক্তির সম্বন্ধে বিশ্বাসে গিয়া পহুঁছিবে ; ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে পূজা হয় তো মূলে বর্বরদের শস্য-উৎপাদনের বা প্রজা-প্রজননের জন্য অনুষ্ঠিত কোনও যাদু-বিদ্যার প্রক্রিয়াই হইবে ; কিন্তু যে-ভাবে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যে এগুলিকে হিন্দু ধর্ম-জীবনে আনা হইয়াছে, তাহাতে এগুলির রূপ বদলাইয়া দিয়া, একেবারে অন্য বস্তুতে উন্নীত করা হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উৎপত্তি ঘটিয়াছিল এক মহান্ অনুপ্রেরণার বাতাবরণের মধ্যে ; এই অনুপ্রেরণা হইতে জাত জীবনীশক্তি এখনও অমৃতরস-প্রবাহে প্রবাহিত। ভারতে এই মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তা-জগতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ দেখা দিল—উপনিষদ্, বৌদ্ধ দর্শন, হিন্দু ব্রহ্মবাদ ও দেববাদ, ভক্তিবাদ ; এবং, বিশিষ্ট-রূপে ভারতের ভারতীয়ত্ব এইখানে দেখিতে পাই—সর্ব-জীবের প্রতি অহিংসার ভাব, জীব-মাত্রেরই জীবন-ধারণের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়া ; জীবের অহিংস্যত্ব সম্বন্ধে এই বোধ, জৈন, বৌদ্ধ এবং পরে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় কর্তৃক বিশেষ-ভাবে গৃহীত হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অনুভূতির ক্ষেত্রে, গভীরত্বে এবং বিশ্বম্ভরত্বে ভারতের আহৃত এই সকল ভাব-সমুদ্রের কাছে পঁহুছিতে পারে, এরূপ কম বস্তুরই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণের সংযম ও তপস্যা, এবং জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধিৎসা, জৈন যতি ও বৌদ্ধ শ্রমণের সর্বজীবে করুণা ও মৈত্রীর সঙ্গে মিলিত হইল ; এবং প্রায় সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের জনগণের পক্ষে এই সকল ভাব ও কর্মধারা, তৃষিতের নিকট

প্রাণবারির মত আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের নিকট হইতে সাগ্রহে স্বাগত পাইল। মানবজাতির সহিত একটা আত্মীয়তা-বোধ, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই উদার মনোভাব, এবং সকল মানবের সুখ ও মোক্ষের জন্য তীব্রভাবে অনুভূত আকাঙ্ক্ষা—এই দুই মহাভাব এবং অনুপ্রাণনার বশে, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শিক্ষক ও প্রচারকগণ ঋষিদিগের ও বুদ্ধদেবের বাণী লইয়া সুদূর এবং দুরধিগম্য দেশসমূহের উদ্দেশে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। এই অনুপ্রাণনার বলে তাঁহারা এদিকে পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহে ও দ্বীপপুঞ্জে কতকটা স্থলপথে ও বেশীর ভাগ জলপথে প্রয়াণ করিলেন এবং মোন ও খ্মের এবং চাম, ও পরবর্তী কালের বর্মী ও শ্যামীদিগকে, ও তথা মালয় সুমাত্রা যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপাবলীর অস্ট্রিক বা ইন্দোনেসীয় জাতিসমূহকে, সভ্যতায় দীক্ষিত করিয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে একাঙ্গীভূত করিয়া দিলেন —ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ আধ্যাত্মিকতার বাণী, দর্শন ও চিন্তা এবং ইতিহাস ও উপাখ্যানাদি দিয়া—বুদ্ধ-চরিত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ দিয়া—তাহাদের বুদ্ধি ও কল্পনা উভয়ই জয় করিয়া লইলেন; ওদিকে তাঁহারা উত্তর-পশ্চিমের ও উত্তরের দুরারোহ ও বিপৎসংকুল হিমগিরি এবং মরুদেশ অতিক্রম করিয়া শক, শুলিক, কুস্তন, ঋষিক, কুচী প্রভৃতি জনগণের মধ্যে উপনীত হইলেন, তিব্বতে এবং মহাচীনে বা চীনদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দুই-চারিজন এমন কি কোরিয়া ও জাপানেও পঁহুছিলেন।

এইরূপে প্রাচীনকালে ভারত নিজে সত্যের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এবং সেই সাধনা ও সিদ্ধি জীবনে পরমার্থ বলিয়া, শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া অপরকেও বাঁটিয়া দিবার নিষ্কাম ইচ্ছায় বা অনুপ্রেরণায় জানা ও অজানা নানা দেশে নিজের ভাণ্ডার ছড়াইয়া দিয়াছিল। ভারত হইতে বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন দেশে, মধ্য-এশিয়ায়, চীনে, ঈরানে ও ইরাকে, এই ভাবে উচ্চ অধ্যাত্মিক আদর্শের ও সাধনার প্রচার, সচেতন ভাবেই ঘটিয়াছিল; এবং গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সাকাঙ্ক্ষ ও সাগ্রহ সহযোগিতার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

এ কথা সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় গুরুগণ বিজয়ী এবং বিদেশী শাসক জাতির মানুষ-রূপে ঐ-সব দেশে যান নাই—শাসক জাতির লোকের যে কতকগুলি সহজে স্বীকৃত ক্ষমতা বা অধিকার অথবা দাবী থাকে, তাহা তাঁহাদের ছিল না—তাঁহাদের আভিজাত্য বা শ্রেষ্ঠতা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ আসিয়াছিলেন প্রথমটায় ভারতীয় বণিক্‌দের সঙ্গে; যদিও কোনও-কোনও স্থানে এরূপ ঘটিয়াছিল যে, উপনিবিষ্ট বা আগত ভারতীয়দের দুই-একজন ঐ-সব

দেশের রাজনীতিতে যোগ দিয়া, কচিৎ স্থানীয় রাজবংশে বিবাহ করিয়া, নিজেদের একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিলেন ; তাহা হইলেও, বৃহত্তর-ভারতের দেশের লোকেরা যাহারা ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তাহারা স্থানীয় অ-ভারতীয় লোকই ছিল, তাহাদের রাজারা ও অভিজাত-জনও স্থানীয় ছিল, ভারত হইতে যায় নাই। ভারতীয় রাজশক্তি সৈন্য-সামন্ত লইয়া ঐ সব দেশ সংগ্রাম করিয়া বিজয় করিবার জন্য যায় নাই। একমাত্র খ্রীষ্টীয় এগারোর শতকে তমিল দেশ হইতে রাজেন্দ্র চোলের মালয় দেশ ও শ্যাম দেশ জয় ছাড়া, এবং তাহার বহু পূর্বে বৌদ্ধপুরাণ মতে গুজরাট হইতে সিংহলে বিজয়সিংহের অভিযানের কথা ছাড়া, এরূপ যুদ্ধের দ্বারা জয়ের আর সংবাদ আমাদের জানা নাই। স্থানীয় লোকদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়া, তাহাদের দেশ জোর করিয়া দখল করিয়া, বিজেতৃসুলভ নানা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া, তবে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। ভারতবর্ষ হইতে কখনও ভারতের বাহিরে কুরুষ বা কম্বুজিয়, আলেক্সান্দর বা যুলিউস্ কাএসার্, অত্তিলা বা গজনীর সুলতান মহ্‌মুদ্, চিঙ্গীজ্‌খান বা তৈমুরলঙ্গ, কোর্তেস, পিসারো অথবা নেপোলিয়নের মত, দিগ্‌বিজয়ী বীর বা যোদ্ধা ভারত-সংস্কৃতির বৈজয়ন্তীকে বহন করিয়া লইয়া যান নাই ; ভারতের দিগ্‌বিজয় ঘটিয়াছিল সত্য এবং ধর্মের সাহায্যে, অস্ত্রের সাহায্যে নহে ; রাজর্ষি অশোকের আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম-বিজয়ের আদর্শকেই ভারতের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানেই ভারতের অবিনশ্বর গৌরব ; ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে যে, কাষায়-চীবর পরিধান করিয়া বিনয়াবনত ভিক্ষু এবং কটিবস্ত্র মাত্র পরিহিত হইয়া ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত, চীন ও কম্বোজে, মধ্য-এশিয়া ও যবদ্বীপে গিয়া পঁহুছিয়াছিলেন, এবং এই-সকল দেশে ও অন্যত্র ভারতের প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া আসিয়াছিলেন। এই ভাবে তাঁহাদের চেষ্টায় একটী সত্যকার 'বৃহত্তর-ভারত' তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, যে বৃহত্তর-ভারত আধ্যাত্মিক বিষয়ে এবং ভৌতিক বা পার্থিব ব্যাপারে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মানুভূতি ও শিল্পকলায় ভারতবর্ষের একটী বিস্তৃতি-স্বরূপই ছিল।

যে-সকল ভারতবাসী আবার স্বজাতির মধ্যে সুপ্ত বা ম্রিয়মাণ শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে উৎসুক, বৃহত্তর-ভারতের ইতিহাস, এশিয়া-খণ্ডে ভারত-সংস্কৃতির প্রসারণের ইতিহাস তাঁহাদের এই কাজে বল দিবে, অনুপ্রাণনা যোগাইবে,—যাহার ফলে জাতিকে আবার দাঁড় করাইয়া দিতে সাহায্য পাওয়া যাইবে। ভারত প্রাচীনকালে সজ্ঞানে যাহা করিয়াছিল, তাহার আলোচনা,

বিচার ও অনুধ্যান হইতে আমরা আধুনিক কালে আবার নূতন আশা ও উৎসাহ লাভ করিতে পারিব, নূতন করিয়া আমাদের কার্য্যস্পৃহা আনিতে পারিব, এবং আমাদের উপস্থিত অযোগ্যতার জন্য আমাদের মনে আবশ্যক দীনতা-ভাব এবং নম্রতাও আনিব। আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা এই যে, ভারতের চিন্তাশীল ও শিক্ষিত সহৃদয়গণের দৃষ্টি বৃহত্তর-ভারতের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

প্রাচীনকালের ভারত নিজ জ্ঞান ও বিদ্যা এবং চিন্তা ও চর্য্যার কারণ এশিয়া-খণ্ডের বিভিন্ন জাতির মানুষের মনে ও অনুভূতিতে কতটা শ্রদ্ধার আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা বৌদ্ধ চীন বা জাপানে অথবা শ্যাম বা যবদ্বীপ কিংবা অন্যান্য দেশে একবার গেলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। ভারতীয় দর্শন, জীবনের নানা ব্যাপারে ও জীবনের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টি ভঙ্গী, এমন কি ভারতীয় আচার বা সদাচার, এইসব জাতির লোকের মধ্যে এমন-ভাবে গৃহীত হইয়া গিয়াছে যে, অনেক সময়ে সেগুলি অনপেক্ষিত-ভাবে আমাদের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের চমৎকৃত করে। সিঙ্গাপুরে এক চীনা বৌদ্ধ বিহারে আমাদের বিহার-সংশ্লিষ্ট নিরামিষ ভোজনাগারে আহার করিতে অনুরোধ করা হইল; মাংসভোজী সর্বভুক্ শূকরমাংস-প্রিয় চীনাদের মধ্যে নিরামিষ আহারের রীতি বড়ই অসাধারণ বস্তু, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ইহা তাহাদের সাংস্কৃতিক বা ধার্মিক জীবনের মধ্যে নিজ সহজ স্থান করিয়া লইয়াছে। আহারান্তে আমাদের ভোজনগৃহের পার্শ্বে একটী প্রাঙ্গণে ডাকিয়া লইয়া গেল, সেখানে একটী বড় জালায় জল আছে, হাতলওয়ালা মালায় করিয়া সেই জল তুলিয়া লইয়া আমাদের আঁচাইতে বলিল। ব্যাপারটী খুবই সামান্য; কিন্তু এই যে ব্যক্তিগত শৌচের আদর্শ, ইহা তো বৌদ্ধ মঠের বাহিরে আর কোথাও দেখি নাই—ভোজনের পরে এই মুখধাবন-রূপ শৌচের রীতি আমরাও যুগধর্মের ফলে অন্য পাঁচটী জাতির ছোঁয়াচে বর্জন করিতেছি, চীনাদের মধ্যে বোধ হয় ইহা তেমন সাধারণ ছিল না; কিন্তু চীনা বৌদ্ধচর্য্যা এখনও ইহা ধরিয়া আছে এবং তদ্দ্বারা প্রাচীন ভারতেরই শৌচ-বিচারের জয়গান করিতেছে। আমার তখনই মনে পড়িয়া গেল, সপ্তম শতকের চীনা ভিক্ষু ঈ ৎসিঙ এর কথা—তিনি ভারতবর্ষ ঘুরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বইয়ে ভারতীয়দের অনুষ্ঠিত শৌচ ও সদাচার স্বজাতীয় ভিক্ষুদের শিখাইবার জন্য তাঁহার কি আগ্রহ!

দ্বীপময় ভারতের লোকেরা বিগত ৭।৮ শত বৎসর ধরিয়া, আমাদের দেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে, ভারতের সঙ্গে যোগ হারাইয়াছে। বলিদ্বীপ বৃহত্তর-ভারতের একেবারে সুদূর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত—বলির সঙ্গে ভারতের

যোগসূত্র ইহার পূর্বেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল মনে হয়। তবে যবদ্বীপের সঙ্গে বলিদ্বীপ বরাবরই সংশ্লিষ্ট ছিল। বলিদ্বীপের দশ লাখ লোক এখন প্রায় পুরাপুরি তাহাদের পৈতৃক হিন্দুধর্ম জিয়াইয়া রাখিয়াছে, যবদ্বীপের চারি কোটি লোকের মত তাহারা অন্ততঃ বাহিরেও মুসলমান বনিয়া যায় নাই। বলিদ্বীপে এখন যে হিন্দুধর্ম বিদ্যমান, ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ্য (শৈব) ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম স্থানীয় লোকেদের আদিম ধর্মের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যাইবার ফলে, তাহা একটী বিশিষ্ট রূপ লইয়াছে—তাহাকে হিন্দুধর্মের বলিদ্বীপীয় বিকাশ বলিতে হয়। ভারতের লৌকিক হিন্দুধর্ম—ইহার দেব-কাহিনী ও পুরাণ-কথা, ইহার সাড়ম্বর পূজা, প্রেতকৃত্য, শ্রাদ্ধ ও অন্য অনুষ্ঠান, ইহার মধ্যে উৎসবাত্মক ও নয়নরঞ্জক যাহা কিছু আছে, তাহা, এবং ইহার অতিপ্রাকৃত দিক্‌, –আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এই-সবই যেন বলিদ্বীপের আদিম ইন্দোনেসীয় লোকেদের মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং এই-সবই তাহারা নিজেদের জীবনের অঙ্গ করিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণ হইতে গৃহীত নানা দেব-কাহিনী, রামায়ণ ও মহাভারত, ব্রাহ্মণ্য পূজা বা দেবার্চনা-রীতি, শবদাহ-রীতি ও শ্রাদ্ধ এবং অন্য অনুষ্ঠান, এবং বলিদ্বীপের ইন্দোনেসীয় সংস্কৃতির অনুযায়ী করিয়া সেগুলির পরিবর্তন—এই-সব বলিদ্বীপে এখনও বেশ জোরের সঙ্গে চলিতেছে। হিন্দু পূজার্চনার অনুষ্ঠান, ভারতে অজ্ঞাত নূতন কতকগুলি পদ্ধতির সঙ্গে মিলিত হইয়া, এই দ্বীপে বেশ একটু অন্য ধরণের হইয়া গিয়াছে ; পূজার তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি বিকৃত সংস্কৃতে ও বলিদ্বীপের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া উচ্চারিত হয়। ভারতের পূজার মন্ত্রপূত জল, পুষ্প, ঘণ্টা, আসন, মুদ্রা এই-সবের সঙ্গে বহু বলিদ্বীপীয় আচার উপচার মিলিত হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে মনে হইবে, বুঝি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহিরঙ্গ, পূজা-অর্চনার ঘণ্টা, প্রদক্ষিণ ও চংক্রমের আড়ম্বর—এক কথায়, দেবার্চনার নাটকীয় এবং দর্শনীয় বস্তুগুলিই—ইহাদের অভিভূত করিয়াছে, কেবল সেইগুলির জন্যই ইহাদের শিশুসুলভ আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এদেশের অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর দুই চারিজন ব্যক্তির সহিত আলাপে বুঝিলাম, এই ধারণা ঠিক নহে। আড়ম্বর ও ঘটা এবং অতিপ্রাকৃতের বাহুল্য ইহাদের মনকে সরস করে বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ যে-সমস্ত গভীর তত্ত্বকথা বলিয়া গিয়াছেন, সেগুলিও ইহাদের মনে বিশেষ একটা স্থান করিয়া লইয়াছে—ইহাদের মধ্যেও শাশ্বত সত্য, তত্ত্ব এবং তথ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও অন্তর্মুখিতা যথেষ্ট আছে।

১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলিদ্বীপে গিয়াছিলাম, তখনকার একটী ঘটনার কথা বলিব। পূর্ব-বলিতে ছোট একটী শহর, কারাঙ্-

আসেম; সেখানকার stedehouder (অর্থাৎ নগরপাল) এই ডচ্ উপাধিধারী বৈশ্য-জাতীয় রাজা অনাক্ আগুঙ্ বাগুস্ জলান্তিক্-এর গৃহে কবি অতিথি হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহার অনুচর-রূপে সেখানে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল। বলিদ্বীপের ব্রাহ্মণ ও অন্য হিন্দুদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হইবে জানিয়া, আমি দেশ হইতে যাত্রা করিবার সময়ে তাহাদের দেখাইবার জন্য এক প্রস্থ পূজার তৈজস-পত্র ও অন্য জিনিস লইয়া গিয়াছিলাম, সঙ্গে নিজের সুবিধার জন্য একখানি 'পুরোহিত-দর্পণ'ও লইয়া যাই। ভারতবর্ষ হইতে আগত ব্রাহ্মণ আমি—আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য রাজা তাঁহার ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের ('পদণ্ড' অর্থাৎ দণ্ডী বা দণ্ডধারীদের) ডাকিয়া আনাইলেন। সঙ্গের একজন ওলন্দাজ বন্ধু দোভাষীর কাজ করিলেন, তাঁহার সহায়তায় একদিন প্রায় সারা সকাল ও বিকাল ধরিয়া ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিলাম। আমার বক্তব্য আমি ইংরেজীতে বলি, ওলন্দাজ বন্ধু তাহা 'দ্বীপময়-ভারতের হিন্দী' মালাই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহাদের বলেন, তাঁহাদের মালাই বক্তব্য আবার আমায় ইংরেজী করিয়া শুনান। রাজা সারা ক্ষণ বসিয়া-বসিয়া সব শুনিলেন ও দেখিলেন। বলিদ্বীপের ব্রাহ্মণদের মনোমত সব বিষয় লইয়া আলোচনা চলিল। আমাকে আমাদের দেশের সাধারণ পূজার আচমন হইতে আরম্ভ করিয়া সব মন্ত্র ও অনুষ্ঠান বুঝাইতে হইল—'পুরোহিত-দর্পণ'খানি তখন বিশেষ কাজে লাগিল। সঙ্গে ভারতের মন্দিরের ও দেবমূর্তির অনেকগুলি ল্যাণ্টার্ন-স্লাইড ছিল—বলিদ্বীপে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন কোথাও মিলে নাই—সেগুলি হাতে-হাতে ঘুরিতে লাগিল, তাহা আলোর সামনে ধরিয়া সকলে ভারতের দেবমন্দিরের সম্বন্ধে একটু ধারণা করিবার চেষ্টা করিলেন। পদণ্ডরা ভারতের হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশৌচ, স্বগোত্র, সপিণ্ড প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। আমিও বলিদ্বীপে হিন্দুধর্মের উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কিছু-কিছু খবর লইলাম। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্য সংস্কৃত বই সম্বন্ধে, সংস্কৃত-চর্চার পুনরভ্যুত্থানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কথা কহিলাম। কারাঙ-আসেম-এর রাজা স্বধর্মনিষ্ঠ ও পণ্ডিত ব্যক্তি; তিনি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত মালাই ভাষায় একখানি বই প্রকাশিত করিয়াছেন, বলিদ্বীপে প্রচলিত হিন্দুধর্মের স্বরূপ তাহাতে বর্ণনা করিয়াছেন (এই বই একখণ্ড তিনি আমাকে উপহার দেন); তিনি বেশ বুদ্ধিমানের মত আমাদের কথার মাঝে-মাঝে যোগ দিতেছিলেন। এইভাবে, প্রায় একটী পুরা দিন ইঁহাদের সঙ্গে কাটাইবার পরে, সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নামিতেছে, তখন রাজবাটীর মধ্যে একটী দীঘির ধারে এক উচ্চ ছত্রীযুক্ত ঘরের

মধ্যে আমাদের যে আলোচনা-সভা চলিতেছিল, সেই সভা ভাঙ্গিবার সময়ে, রাজা হঠাৎ আমাকে একটী প্রশ্ন করিলেন: 'দেবতা, শ্রাদ্ধ, দেবার্চনা, সামাজিক রীতি—এ-সব নিয়ে তো অনেক কথা হ'ল; এখন বলুন তো, মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য কি?' প্রশ্নটী রাজা যেরূপ গভীর ও আন্তরিক ভাবের সহিত করিলেন, তাহাতে আমি চমৎকৃত হইলাম—হঠাৎ এরূপ প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না; কয়দিন যাবৎ বলিদ্বীপে ঘুরিয়া আমাদের মনে হইতেছিল—আর এদেশে বহুদিন ধরিয়া বাস করিতেছেন এমন শিক্ষিত ডচ্ লোকেও আমাদের সেই কথা বলিতেছিলেন—যে, এই বলিদ্বীপের ইন্দোনেসীয় জাতি হিন্দু সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া কেবল উপর-উপর মাত্র পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাদের মূল প্রকৃতিতে ভারতীয় সংস্কৃতির কোনও ছাপ পড়ে নাই, ভারতের চিন্তার গভীরতা তাহাদের কাছে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য। নাচগান, নাটক, পূজার ঘটা লইয়াই তাহারা খুশী। ধর্মের ও জীবনের বহিরঙ্গ লইয়া সারাদিন ধরিয়া বকাবকির পরে, এই অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসা বড়ই ভাল লাগিল। আমি নিজে উত্তর না দিয়া, ডচ্ বন্ধুর মারফৎ রাজাকে অনুরোধ করিলাম, তিনি নিজেই তাঁহার প্রশ্নের সমাধান করুন। তখন রাজা বলিলেন, দেবতা এবং দেবার্চনা, শ্রাদ্ধ এবং স্বর্গবাস—এ-সমস্ত কিছুই নহে, জীবনের বা ধর্মের গভীরতম ব্যাপার এগুলি তো নহে; মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, মানুষের পুরুষার্থ, হইতেছে, নির্বাণের সাধনা। রাজা মালাই ভাষায় কথা কহিতেছিলেন, বলিদ্বীপীয় উচ্চারণে তাঁহার কথার শেষ দুটি বাক্য এখনও আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—'ডেওআ-ডেওআ টিডাঃ আপা, নির্‌ওআনা সাটু' (Dewa-Dewa tidak apa, Nirwana satu), অর্থাৎ 'দেবতারা—এঁরা কোনও কাজের নয়, একমাত্র নির্বাণ।' সুদূর দ্বীপময়-ভারতের পূর্বতম প্রান্তে ভারতের সংস্কৃতির মূল কথা যে লোকে এখনও বিস্মৃত হয় নাই, তাহা দেখিয়া আমি যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম; মূল কথা এই যে, নির্বাণ বা মোক্ষের সাধনই হইতেছে দুঃখ-নিবৃত্তির চরম উপায়, মানবজীবনের একমাত্র কাম্য। হাজার বছরের উপর হইল, ভারতের সঙ্গে বলিদ্বীপের যোগ নাই, তথাপি এ কথা তাহারা ভুলে নাই। পরে রাজার এই প্রশ্নের কথা এবং তাঁহার উত্তরের কথা রবীন্দ্রনাথকে বলি, এবং তিনি শুনিয়া খুব খুশী হন। তিনি আমাকে বলেন—'এরা মালাই জাতির লোক, এদের চিন্তাজগৎ আমাদের থেকে আলাদা; খুব সম্ভব এরা ভারতের সভ্যতার বহিরঙ্গের জাঁকজমক দেখেই প্রথমটা আকৃষ্ট হয়, আমাদের পুরাণ কথা আর শিল্প এদের বেশী করে মুগ্ধ করে; কিন্তু রাজা যে ভাবে কথাটী ব'লেছেন, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে,

ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীও এরা ঠিকমত আর ভাবশুদ্ধির সঙ্গে ধ'রতে পেরেছে। আর তা না হ'লে এতদিন ধ'রে এরা নিজেদের হিন্দু ধর্মকে এত শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারত না, তাদের চতুর্দিকে এত প্রতিকূল শক্তি সত্ত্বেও।'

বলি আর যবদ্বীপের ভ্রমণ শেষ হইবার পরে রবীন্দ্রনাথ বলিদ্বীপ সম্বন্ধে একটী অতি চমৎকার কবিতা লেখেন, যেটী "বালী" এই নামে 'প্রবাসী'তে ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়; বহুদিন পরে কবি তাতে একটী পুরাতন ছন্দ ব্যবহার করেন। এই কবিতাতে ভারতবর্ষ যেন এক রাজকুমার, সুদূর দ্বীপে সাগরতীরে কুমারী-রূপিণী বালী বা বলির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ, তাহার পরে তাহাদের মিলন, আর শেষে বালীর সঙ্গ ছাড়িয়া রাজকুমার রূপী ভারতের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। বহু দিন পরে কবির মধ্যেই আত্মবিস্মৃত ভারত আবার রাজকুমারী বালীর দ্বীপে আসিয়া পঁহুছিয়াছে; তরুণী বালীকে দেখিয়া পূর্বকথা মনে পড়িতেছে। কারাঙ-আসেমের রাজার কথায় প্রকাশিত বলিদ্বীপের আধ্যাত্মিক গভীরতার কথা কবি এইভাবে কবিতাটীতে লিখিয়াছেন—

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব-অরুণ-রাগে,—
নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে;
শুনিনু কান পেতে,
গভীর স্বরে জপিছ কোন্‌-খানে
উদ্বোধন-মন্ত্র যাহা দিয়েছ' তব কানে,
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহ-মোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ ধরি', যুগল করি' পাণি ॥*

মহাযোগী শিব ও বুদ্ধ—ইঁহাদের দেশিত এই মোহ-মোচন বাণী, ভারতবর্ষ বাহিরের জগতে প্রচার করিয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন জাতির মানব মনে-প্রাণে তাহা গ্রহণ করিয়া, ভারতের সঙ্গে মিলিত ভাবে তাহার সাধনা করিয়াছে। ভারতের

* এই কবিতাটী 'সাগরিকা' নামে 'পূরবী'তে পুনঃপ্রকাশিত হয়, এবং পরে 'সঞ্চয়িতা'তেও এটী স্থান পায়। কি কারণে জানি না, 'পূরবী'তে ও 'সঞ্চয়িতা'তে এই ছত্রকয়টী বাদ দেওয়া হইয়াছে। কবির কাছে এ জন্য অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলাম, তিনি পরে ছত্রকয়টী পুনরায় সন্নিবেশিত করিয়া দিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠে নাই। আমার মনে হয়, এই ছত্র কয়টী বাদ দিলে কবিতাটির বলিদ্বীপ-সংক্রান্ত প্রসঙ্গটুকু অসম্পূর্ণ থাকে, একটু রসহানিও ঘটে।

বাহিরে ভারত-সংস্কৃতির ইহাই হইতেছে শ্রেষ্ঠ অবদান ; ভারতের অনুপ্রাণনায় যে পার্থিব সভ্যতা বাহিরে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার চেয়ে ইহার মূল্য অনেক অধিক।

ভারত কি নিজ জীবনে এই বাণীকে আবার কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিবে, যাহাতে সে তাহার পূর্ব-রীতিতে বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-মিত্র রূপে, জীবনে শ্রেয়ের সন্ধানে সহায়ক হইয়া, বিশ্ব-মানবের সেবা করিয়া আবার ধন্য হইতে পারিবে?

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ বিহার

ব্রহ্মদেশের যে কোনও নগরে বা গ্রামে গেলে, প্রায়ই একটী জিনিস নজরে পড়ে —ঘণ্টাকৃতি বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া—সাধারণতঃ স্বর্ণমণ্ডিত—তাল বা নারিকেল এবং অন্য তরুর গহন হরিৎশোভার মধ্যে উন্নতশীর্ষে নীল আকাশের ক্রোড়দেশে নিজ উজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। জাহাজে করিয়া রেঙ্গুনে আসিবার কালে রেঙ্গুন-নদীতে জাহাজ প্রবেশ করিবার কিছু পরেই, দূর হইতে রেঙ্গুনের সুউচ্চ শোয়ে-ডগোন চৈত্যের চূড়াস্বরূপ স্বর্ণময় দগব বা ধাতুগর্ভের উপরে প্রতিফলিত সূর্য্যের ঝলক সকলেরই চিত্তকে উৎসুক করিয়া থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসাদে যে স্থাপত্যাদি শিল্পরীতি ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে আনীত হয়, তাহা, ব্রহ্মদেশীয় মোন্ বা তালৈঙ এবং ম্রন্মা বা বর্মী এই দুই জাতির ধ্যান-ধারণা ও সাধনা এবং সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া, একটু স্বতন্ত্র ধরণের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; ব্রহ্মে ভারতের স্থাপত্যের ক্রমবিবর্ধমান স্বাধীন গতি, বিভিন্ন যুগের মন্দিরের গঠনপ্রণালী আলোচনা করিলেই বোঝা যায়। সে যাহা হউক, বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে লতাচিত্রাদি-অলঙ্করণবিহীন, নিরাভরণ অথচ স্বর্ণমণ্ডিত বৌদ্ধ চৈত্যের চূড়াভাগ, ব্রহ্মদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর ও অন্তর্মুখী দিকের প্রতীক-রূপ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মদেশে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহাদের চোখের সামনে প্রসন্ন আকাশের গায়ে রৌদ্রের মধ্যে ঝলমলে' সোনার-পাতমোড়া ঘণ্টাকার এই প্রকার চৈত্য-চূড়াই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী করিয়া ভাসিয়া থাকে। এই Symphony in blue, green and gold—নীল সবুজ আর সোনার এই সংবাদী বা ঐকতান সঙ্গীতে—ইহাই যেন ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট স্মৃতি-স্বরূপ চিত্তপটে উদিত হয়।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ, এবং পরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় মতের তান্ত্রিক—এই তিন

প্রকারের ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান ব্রহ্মদেশে গিয়া পঁহুছিয়াছিল ; এবং প্রাচীন ব্রহ্মের তিনটী বিশিষ্ট জাতি 'মে'ঞ' (আধুনিক মৌন্ বা তালৈঙ্—দক্ষিণ- ও মধ্য-ব্রহ্মের অধিবাসী), 'প্যূ' (অধুনালুপ্ত মধ্য-ব্রহ্মের অধিবাসী), ও 'ম্রন্‌মা' (আধুনিক বর্মী, উত্তর-ব্রহ্ম হইতে আগত)—ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু ও 'আর্য্য'-নামধারী তান্ত্রিক গুরুদেবের নিকট হইতে ঐ তিন মত গ্রহণ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রহ্মদেশের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা অনিরুদ্ধ (আনোয়াঠা বা নোয়াঠা) ও তৎপুত্র ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ ক্যন্‌চচ্-সাঃ (বা চ্যন্-জিৎ-থা), ইঁহাদের আগ্রহে, এবং ইঙ-অরহং (বা শিন্-আয়াহান্) নামক বৌদ্ধ ধর্মগুরুর চেষ্টায়, হীনযান মার্গের শুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশে সুস্থাপিত হয়। তখন হইতে, দেশে বহু-প্রচলিত তান্ত্রিক ধর্মের, এবং ভারতের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম বর্মীদের মধ্যে পঁহুছিবার পূর্বে উহাদের মধ্যে যে আদিম ধর্ম ছিল সেই ধর্মের, পতন ঘটিতে থাকে, এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মও ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করে ; ক্রমে তান্ত্রিক ধর্মের প্রায় বিলোপ-সাধন হয়। বর্মীদের আদি ধর্ম বিভিন্ন 'নাৎ' বা দেবযোনির পূজা, এখন বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া, অপ্রকাশ্যে টিঁকিয়া আছে ; এবং স্থানীয় 'পোনা' বা ব্রাহ্মণদের আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ক্ষীণধারায় এখনও প্রবাহিত আছে। কিন্তু আধুনিক বর্মী জাতির চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছে এই হীনযান-মতের বৌদ্ধ ধর্ম।

আদিম বর্মীজাতি সভ্যতার নিম্ন স্তরেই ছিল—ইহাদের আত্মীয় চীনারা এবং প্রতিবেশী ভারতীয়েরা নিজ চেষ্টায় উন্নতির যে শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, বর্মীরা তাহাদের আদিম অবস্থার তুলনায় নিতান্ত বর্বরই ছিল। বর্মী চরিত্রে সদ্‌গুণ আছে —আবার কতকগুলি অবগুণও আছে। সাহস, সঙ্ঘবদ্ধতা, স্বজাতি-প্রীতি ও সমাজ-প্রীতি, উৎসাহশীলতা, কৌতূহল, শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাব, এবং চিত্তপ্রসন্নতা ও রসবোধ—এগুলি ইহাদের মানসিক সদ্‌গুণের মধ্যে অন্যতম ; এবং অবগুণের মধ্যে উল্লেখ করিতে পারা যায়—নিষ্ঠুরতা—অপরের ক্লেশ সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা, গাম্ভীর্য্যের ও গভীরতার অভাব, দর্শন ও বিচারশক্তির অল্পতা, বিলাসপ্রিয়তা।

নিষ্ঠুরতা বর্মী চরিত্রের একটী কলঙ্ক ছিল। এখনও হঠাৎ রাগিয়া উঠিলে ইহাদের চরিত্রে এই অবগুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। সেদিন পর্য্যন্ত রাজদ্রোহের সাজা দিবার জন্য বাঁশের বা কাঠের আড়গড়ার ভিতর পুরিয়া শতশত নরনারী ও শিশুকে জীবন্ত দগ্ধ করার রেওয়াজ বর্মীদের মধ্যে ছিল। নূতন শহরের পত্তনের সময়ে বর্মীদের মধ্যে Myosade 'মিওসাডে' বলিয়া এক নৃশংস পদ্ধতি ছিল, তদনুসারে শহরের বহিঃ-প্রাচীরের কোণে-কোণে এবং তোরণগুলির নীচে জীয়ন্ত

মানুষ প্রোথিত হইত—পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোক এই 'মিওসাডে'র জন্য প্রশস্ত বলি বলিয়া বিবেচিত হইত। উদ্দেশ্য ছিল, এই সব নিহত ব্যক্তিগণ প্রেত বা যক্ষ হইয়া শত্রুর হস্ত হইতে নগর রক্ষা করিবে। ১৮৫৭ সালে যখন রাজা মিণ্ডোন্-মিন্ মাণ্ডালে নগর স্থাপিত করেন, তখন নাকি বাহান্ন জন নিরপরাধ নরনারীকে এইভাবে বধ করা হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বরাবরই এই-সব বর্বরতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। তাঁহারা এই সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও আদিম অন্ধবিশ্বাস দূর করিবার জন্য বহুবার সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মের মণিপুরী ব্রাহ্মণগণ 'মিওসাডে'র নরবলির সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, এরূপ শোনা যায়। বর্মীদের জ্ঞাতি শান্‌দিগের মধ্যে রাজাদের মৃত্যুর পরে তাঁহার দাহের সময়ে তাঁহার বহু অনুচরকে নিহত করা হইত—পরলোকে গিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য। শান্‌দের এক শাখা আহম জাতি ১২২৮ সালে আসাম জয় করে, ইহাদের মধ্যেও এই নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ব্রহ্মের রাজা বায়িন্-নৌঙ শান্‌দেশ জয় করেন, এবং শান্‌দের মধ্যে এই নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথা বন্ধ করিয়া দেন—তাঁহার সময় হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে বর্মার শানেদের ভিতর হইতে এই বর্বরতা উঠিয়া গিয়াছে। আসামের শান্ আহমরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করে ; কিন্তু আসামে ব্রাহ্মণ্যের প্রভাবও তাহাদের মধ্যে রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে কতকগুলি করিয়া নিরপরাধ নরনারীর হত্যা বন্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়া ভারতের মনের প্রভাব বর্মায় পঁহুছিয়া, বর্মী জীবনের অনেক আদিম বর্বরতাকে এইভাবে অবলুপ্ত বা সংস্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের জীবনের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও শোভন, গভীর ও অন্তর্মুখী, সুকুমার ও উচ্চভাবের পরিপোষক, তাহার কেন্দ্র হইতেছে দেশের নগর ও গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শত-শত বৌদ্ধ kyaung চ্যঙ বা বিহার। এখনও বর্মার জীবনে চ্যঙের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্মীরাও নিজেদের জীবনে প্রায় সব বিষয়েই চ্যঙের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। এখনও ভিক্ষুরাই সব বিষয়ে নেতা—চিন্তা ও ভাবজগতে তো বটেই। মন্দির ও বিহারকে আশ্রয় করিয়া ইহাদের সামাজিক ও উৎসবময় জীবনের যত-কিছু সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত উৎসবে গ্রামের ও নগরের লোকজন মন্দিরেই সমবেত হয় ; মন্দিরের আঙ্গিনায় তখন Pwe 'পুয়ে' নাট্যশালা খোলা হয়, সারারাত ধরিয়া নরনারী নানা প্রকারের 'পুয়ে' দেখে, উৎসবের জন্য স্থাপিত ভোজনশালায় পান-ভোজন করে,—
—'পুয়ে'র মারফৎ একাধারে নিজ ধর্মের ও নিজ জাতির ইতিহাসের কাহিনীগুলি

শুনে ও দেখে, এবং সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া আনন্দ পায়। সারা বছর ধরিয়া ভিক্ষুরা বিহারে পাঠশালা খুলিয়া রাখেন, গ্রামের বা পল্লীর ছেলেরা সেখানে লেখাপড়া শিখে; এই ভাবে ব্রহ্মের বিহারগুলির দ্বারা জন-সাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিতরণ আবহমানকাল চলিয়া আসিয়াছে, এবং ইহার ফলেই লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। প্রত্যেক বর্মী বালককে মাস কয়েকের জন্য মুণ্ডিত-মস্তক হইয়া চ্যঙ-এ গিয়া ভিক্ষুব্রত পালন করিতে হয়—দেশের ধার্মিক ও নৈতিক এবং মানসিক সংস্কৃতির মুখ্য ধারার সঙ্গে এইভাবে তাহাদের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। প্রাচীনকালে এই বিহারগুলি উচ্চশিক্ষার জন্য একমাত্র কেন্দ্র ছিল। এখনও এখানে ভিক্ষুরা পালির চর্চা করেন, পাঠার্থীরাও পালি পড়িতে পারে। ব্রহ্মের ভিক্ষুরা চ্যঙ্-এ বসিয়া-বসিয়া বিগত কয়েক শতকের মধ্যে পালি ভাষায় একটা বেশ বড় সাহিত্যও রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন—ভারতের ও সিংহলের মূল পালি সাহিত্যের একটা জের বা ধারা হিসাবে, শ্যাম ও কম্বোজের পালি-সাহিত্যের সঙ্গে ব্রহ্মের পালি-সাহিত্যেরও নাম করিতে হয়। সংসার-ধর্ম করিতে-করিতে জীর্ণদেহ ও ক্লান্তমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আশ্রয়স্থান এই বিহারগুলি—আমাদের হিন্দু-সমাজে যেমন কাশী বৃন্দাবন পুরী নবদ্বীপ, সংসার-তাপে তাপিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শেষ আশ্রয়স্থান হইয়া থাকে। আবার অগ্নিদাহাদি দৈবদুর্বিপাকের ফলে গৃহহীন লোকেরা এই সকল মন্দির ও বিহারে সাময়িক আশ্রয় পাইয়া, যথার্থ 'দেউলিয়া' বা দেবকুলবাসী অনাগারিক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারে। পথিক ব্যক্তির পক্ষে চ্যঙ-এর আশ্রয় অবারিত, পান্থদের জন্য চ্যঙ-গুলিই ধর্মশালার কাজ করে।

ব্রহ্মদেশের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে প্রত্যূষে একটী সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়—চ্যঙ হইতে ভিক্ষু ও শ্রামণেরগণ (অর্থাৎ ভিক্ষুদের ছোকরা চেলারা) মন্দিরের সোনালী রঙের চূড়ার মতই পীত-কাষায় বাস পরিধান করিয়া কালো রঙে রঙানো কাঠের পিণ্ডপাত্র লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। গৃহস্থের কিংবা দোকানীর দ্বারে দাঁড়াইলেই যাহার যাহা সাধ্য কিছু খাদ্য দ্রব্য দিতেছে। পাঁচ বাড়ী ঘুরিয়া ভাত-তরকারী অথবা চাউল ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চ্যঙ-এ প্রত্যাবর্তন করে। প্রাচীন কালে এই ভিক্ষালব্ধ খাদ্য হইতেই ভিক্ষুদের আহার হইত,—দ্বিপ্রহর অর্থাৎ বেলা বারোটার পূর্বে তাঁহারা একবার ভরপেট খাইয়া লইতেন, দ্বিপ্রহরের পরে বিকালে, সন্ধ্যায় বা রাত্রে ফলের রস ছাড়া আর কিছুই খাইতেন না। এখন সাধারণতঃ চ্যঙ-গুলির ভাল আয় থাকায়, ভিক্ষালব্ধ খাদ্যের উপর

ভিক্ষুদের নির্ভর করিতে হয় না,—ভিক্ষুর কর্তব্য হিসাবে মাধুকরী ভিক্ষা অবলম্বন করা হয় বটে, কিন্তু প্রাপ্ত খাদ্যাদি প্রায়ই গরীব দুঃখী ও রাহী লোকদেরই দেওয়া হয়—ভিক্ষুদের সেবার জন্য চ্যঙ-এই পৃথক্ রান্না হয়, ভিক্ষুরা তাহাই খান। নূতন-নূতন চ্যঙ বানাইয়া দেওয়া ও চ্যঙের ভিক্ষুদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য বা তাঁহাদের আরামে থাকিবার জন্য, এবং চঙ-এর ও মন্দিরের সৌষ্ঠব তথা ছাত্রদের পাঠাদির খরচের জন্য টাকা দেওয়া, কি ধনী কি দরিদ্র সাধারণ বর্মী গৃহস্থ সকলেই পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করেন। 'চ্যঙ্-তগা' অর্থাৎ 'বিহার-প্রতিষ্ঠাতা', এই উপাধিটী এতটা কাম্য যে, সাধারণতঃ বয়স্থ বর্মী পুরুষকে খাতির করিয়া 'চ্যঙ্-তগা' বলিয়া আহ্বান বা উল্লেখ করা হয়। মন্দির ও চ্যঙ-কে সুন্দর করা, আলোকমালাদ্বারা সজ্জিত করা, বর্মীদের এতটা বেশী রোচক কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, মাণ্ডালের এক সর্বজনমান্য বৃদ্ধ ভিক্ষুর চেষ্টায় বর্মার প্রায় তাবৎ নগর ও গ্রামের বড়-বড় বৌদ্ধ মন্দিরগুলি বিজলীর বাতিতে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে;—হয় তো শহরে বা গ্রামে বিজলীর বাতি যায়-ই নাই, কিন্তু বিশেষভাবে ডাইনামো বসাইয়া মন্দিরে-মন্দিরে বিজলীর আলোর মালা মন্দিরগাত্রে ও চূড়ায় সারারাত ধরিয়া জ্বলিয়া থাকে, এবং এইরূপে নিস্তব্ধ নিশীথে নক্ষত্রখচিত আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বৌদ্ধধর্মের মহিমা আলোকমালার দ্বারায় বিঘোষিত হয়।

বর্মার বৌদ্ধমন্দিরে পাণ্ডার উৎপীড়ন নাই। ফুলওয়ালীরা ও বাতিওয়ালীরা বুদ্ধমূর্তির সাম্‌নে উৎসর্গের জন্য ফুল ও বাতি কিনিতে আহ্বান করে; এবং মন্দিরের আঙিনায় কোনও এক কোণে ঘণ্টা বাজাইয়া হয় তো মন্দিরের কার্য্যকারী সমিতির তরফ হইতে কেহ চাবি-দেওয়া দানের বাক্সের সামনে দাঁড়াইয়া, মন্দিরের খরচ চালাইবার জন্য কিছু দান করিবার জন্য যাত্রী, পূজক ও দর্শকদের আহ্বান করিতেছে, ইহা দেখা যায়; কিন্তু কোনও পীড়াপীড়ি নাই। মন্দিরের মধ্যে—'মন্দির' বলা ঠিক নহে, বিরাট চৈত্যের গায়ে—চারিদিকে বসা বুদ্ধমূর্তি আছে; তা ছাড়া, ছোট বড় কুলুঙ্গীতে ও নাটমন্দিরে শোওয়া বসা দাঁড়ানো রকমারি আকারের সোনার-পাত-লাগানো কাঠের, অথবা শ্বেতবর্ণ মর্মর-প্রস্তরের বুদ্ধমূর্তি আছে; ইচ্ছামত সেগুলিরও সামনে গিয়া মন্ত্রপাঠ করা যায়, নিঃশব্দে ধ্যান বা পূজা করা যায়, ফুল বাতি অর্পণ করা যায়।

মন্দিরের সংলগ্ন, অথবা সম্পূর্ণ পৃথক-ভাবে অবস্থিত 'ফুঙ্গী' বা 'ফুঙ্গী চ্যাঙ' বা ভিক্ষুদের আবাসস্থান বিহার। স্বয়ং বিহার-স্থাপয়িতা, অথবা বিহারে বাস করে এমন বিশিষ্ট পূজ্যপাদ ভিক্ষুর অনুরক্ত শিষ্যেরা, নানাভাবে বিহারটীকে সমৃদ্ধ করিয়া

রাখিতে চেষ্টা করেন।

বিহারগুলি সাধারণতঃ প্রশস্ত হাতার মধ্যে হয়; এই হাতার মধ্যে সমাগত যাত্রী বা শিষ্যদের বসিবার ও থাকিবার জন্য বড়-বড় কতকগুলি চালাঘর থাকে, গ্রামের উৎসব সভা ইত্যাদিও এই-সব চালাঘরে হইয়া থাকে। আধুনিকভাবে সজ্জিত, মায় লোহার খাট ও মূল্যবান্ আলমারী টেবিল চেয়ার সমেত প্রকোষ্ঠ থাকে ভিক্ষুদের বাসের জন্য; বিহারে যে-সব ছাত্র পড়িতে আসে, তাহাদের জন্যও ঘর থাকে; পৃথক্ রান্নাঘর, খাইবার জায়গা। গরীব বিহারে এতটা ঘটার ব্যবস্থা থাকে না;—ভিক্ষুরা বর্মী ধরণের দ্বিতল বাটীর কাঠের পাটাতনের মেঝের উপরে মাদুর পাতিয়া শয়ন করেন, সেখানেই বসিয়া-বসিয়া নিজেরা ধ্যান-জপ ও পড়াশুনা করেন, ছেলেদের পড়ান। কিন্তু সব বেশ পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে', শহরের বা গ্রামের কোলাহল হইতে দূরে স্থাপিত শান্তিময় স্থান। প্রাচীনকালে, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটি ও নিষ্ঠুর বীভৎস হত্যার তাণ্ডবলীলার মধ্যে, সমগ্র ব্রহ্মদেশে এই বিহারগুলিই একমাত্র শান্তি ও সচ্চিন্তার, বিদ্যা ও শিল্পকলার আশ্রয়-নিকেতন ছিল।

১৯৩৯-১৯৪০ সালে বর্মায় তিন সপ্তাহ আন্দাজ থাকিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, কিন্তু তিন-চারিটী ছাড়া চ্যঙ বা বৌদ্ধ-বিহার দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। মাণ্ডালের বিখ্যাত Queen's Golden Monastery অর্থাৎ 'রাণীর তৈয়ারী সোনা-মোড়া চ্যঙ' দেখিতে যাই—বিহারটী বিগত শতকের বর্মী কাষ্ঠময় বাস্তুশিল্পের একটী অতি সুন্দর নিদর্শন, এই হিসাবে ইহার প্রধান আকর্ষণ। মাণ্ডালের কাছে মাণ্ডালে-পাহাড়ের উপরে কতকগুলি নূতন বৌদ্ধমন্দির হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী বিহারও স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে বৌদ্ধ পুস্তকাগার ও পাঠনিরত কতকগুলি বর্মী ছাত্র ও ভিক্ষুকেও দেখিলাম—ইহারা উবুড় হইয়া শুইয়া-শুইয়া লেখাপড়া করিতেছে। এই দুই জায়গায় ভিক্ষুকদের সঙ্গে কথাবার্তার বা আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয় নাই—যদিও বাহির হইতে ইঁহাদের জীবনযাত্রা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনার রীতির কিছু আভাস পাইয়াছিলাম।

মধ্য-বর্মায় Pyinmana পিJন্‌মানা শহরে দুই-চারি দিন অবস্থান করি, সেখানে স্থানীয় উকিল, আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত শান্তিময় রায় চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে দুইটী চ্যঙ ভাল করিয়া দেখিবার ও ভিক্ষুদের সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রাতে তিনি আমাকে Kan U Kyaung 'কান্-উ-চ্যঙ' নামে একটি বিহার দেখাইতে লইয়া যান। বিহারটী একটু উঁচা টিলা জায়গায় স্থাপিত। সিঁড়ি

বহিয়া উপরে উঠিয়া জুতা খুলিতে হইল। বিহারে ভিক্ষুদের কিন্তু জুতা পরিতে বাধা নাই—তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বর্মী চাপ্‌লি পরিয়া বেড়াইতেছেন। সকাল সাড়ে-সাতটা আন্দাজ সময়ে গিয়াছিলাম, ঘাসের শিশির তখনও শুখায় নাই। একজন ছোক্‌রা ভিক্ষুকে দেখিলাম, শান্তি-বাবু বর্মীতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা চ্যঙ দেখিতে পারি কি না। সে আমাদিগকে একটী দ্বিতল বাটী দেখাইয়া দিল। নীচের তলায় খালি একটী হল-ঘরের মতন। সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিলাম। উপরে একটী বিরাট হল, তাহার মধ্যে মাথার চেয়ে একটু উঁচু কাঠের দেওয়াল দিয়া কতকগুলি কামরা করা হইয়াছে; এক-একটী কামরা এক-একজন সম্মানিত ভিক্ষুর থাকিবার স্থান। মাঝে খানিকটা জায়গা খালি আছে, তাহাতে দেওয়ালের আশ্রয়ে একটী বেদী, বেদীর উপরে বুদ্ধমূর্তি। মনে হইল, খালি জায়গাটীতেও সাধারণ অন্য ভিক্ষুদের রাত্রে শুইবার ব্যবস্থা হয়। কতকগুলি আলমারীতে চামড়ায় বাঁধা বই—বোধ হয় বর্মী অক্ষরে পালি ত্রিপিটক ও অন্য পালি ও বর্মী বই,—এবং বেশ শক্ত করিয়া বাঁধা কতকগুলি তালপাতার পুঁথি আছে। ভিক্ষুদের কাঠের দেওয়াল দেওয়া কামরাগুলিতে, দেখিলাম—থাকিবার ব্যবস্থা ভালই। কিছু-কিছু শৌখীনত্বের জিনিস আছে—লোহার স্প্রিং-যুক্ত খাট, তদুপরি পরিষ্কার বিছানা, নেটের মশারিও আছে—এই কামরাগুলি ভিক্ষুদের থাকিবার জন্য হইলে, বুঝিতে পারা যায় যে ভিক্ষুদের খাটের উপরে শুইবার সম্বন্ধে যে নিষেধ আছে তাহা পালিত হয় না।

এই বাড়ীটীতে তখন জনমানব ছিল না। আমরা দেখিয়া শুনিয়া নামিয়া আসিলাম। পরে, রান্নাবাড়ী ও ভোজনাগারের দিকে চলিলাম। ইতিমধ্যে কুতূহলী ভিক্ষু ও শ্রামণের দুই-একজন আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিল। শান্তি-বাবু বলিলেন, যদি কোনও আপত্তি না থাকে, আমরা বিহারের প্রাধন স্থবির বা আচার্য্য বা মহন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই। তাহারা বিশেষ ভদ্রতা সহকারে বলিল, তিনি এইমাত্র সেবায় বসিতেছেন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তাঁহার অনুমতি লইয়া আসায়, আমরাও ভোজন-স্থানে গেলাম। এই অংশটী সেকেলে ধরণের একটী কাঠের পাটাতনের মেঝেওয়ালা অনুচ্চ দোতালা বর্মী বাড়ী—নীচের তলায় অর্থাৎ মাটীর উপরে কেহই থাকে না। কাষায়-পরিহিত মুণ্ডিত-মস্তক সৌম্যদর্শন একজন আধা-বয়সী ভিক্ষু বসিয়া আছেন, সামনে ছোট চৌকী পাতা, ধোঁয়া উড়িতেছে এমন কি একটা তপ্ত খাদ্যদ্রব্য চীনামাটীর বাটিতে চৌকীর উপরে রহিয়াছে, আর কতকগুলি চীনামাটির রেকাব ও বাটি আশেপাশে সাজানো রহিয়াছে। শুঁটকী মাছের একটা উগ্র গন্ধে সমস্ত স্থানটী ভরিয়া গিয়াছে—বোধ

হয় 'নাপ্পি' অর্থাৎ বর্মার সুপরিচিত পচা মাছের চাট্‌নি বা টাক্‌নার গন্ধ। ব্রহ্মদেশে ভিক্ষুদের মাছ-মাংস খাওয়ার কোনও বাধা নাই, গৃহীরা শ্রদ্ধা করিয়া যাহা দেয় তাহাই ইঁহারা নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করেন। এখন ভিক্ষুদের মধ্যে মাছ-মাংস না খাওয়া অবশ্য-পালিতব্য নিয়ম নহে, ঐচ্ছিক কৃচ্ছ্রতা। কাছেই অন্য খাদ্যদ্রব্য, জলের কলসী, কাঠের গেলাস, মাছি তাড়াইবার পাখা—এই সব লইয়া চারি-পাঁচজন অন্য ভিক্ষু গুরুর সেবক রূপে দণ্ডায়মান; তদ্ভিন্ন সাদা-পোশাক-পরা দুই-একজন প্রাচীন বর্মী গৃহস্থ, ধর্মগুরুর আহার-লীলা দেখিবার জন্য হাঁটু পাতিয়া বসিয়া। আমরা আসিতেই আচার্য্য সৌজন্যপূর্ণ ভাবে হাসিয়া আমাদের বসিতে ইঙ্গিত করিলেন; অমনি দুইটী ছোট-ছোট চাটাইয়ের আসন একটী ছোক্‌রা ভিক্ষু আমাদের জন্য পাতিয়া দিল, আমরা বসিলাম। আচার্য্য সস্মিত উৎসুকনেত্রে আমাদের দিকে তাকাইলেন। শান্তি-বাবু বর্মীতে নিজের পরিচয় দিলেন, আমার পরিচয় দিলেন। শান্তি-বাবু সমগ্র বর্মার ভারতীয়-মহলে বিশেষ পরিচিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও জনপ্রিয় ব্যক্তি; এবং ঐ অঞ্চলে বর্মী ও ভারতীয় নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার নাম জানে—চ্যঙের আচার্য্যও তাঁহার নাম জানিতেন, তিনিও বলিলেন যে "চৌধুরী মহাশয় বলিয়া তাঁহার নাম শুনিয়াছেন, তবে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই।" আমার জন্য দোভাষীর কাজ শান্তিবাবুই করিলেন। আমি বলিলাম—"আপনাদের দেশে আমি বেড়াইতে আসিয়াছি, আপনাদের দেশকে দেখিতে ও বুঝিতে চাহি, আপনাদের দেশের সম্বন্ধে ইতিহাস ও অন্য বই যাহা পড়িয়াছি, সেগুলি হইতে ব্রহ্মদেশের সভ্যতা ও ব্রহ্মদেশের বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু তাহার উৎস যে আপনাদের এই চ্যঙ্‌গুলি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আপনারা একটী সমগ্র জাতির মধ্যে উচ্চ আদর্শ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আপনারা জাতির নমস্য, সকলের নমস্য।" এই ধরণের কথায়, বর্মার ইতিহাসে ও বর্মী জাতির সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের স্থান সম্বন্ধে একটু প্রশস্তি করিলাম—শান্তি-বাবু অনুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। আচার্য্য আর অন্য ভিক্ষুরা সম্মতি-সূচক মাথা নাড়িতে লাগিলেন। আচার্য্য সব শুনিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক; বৌদ্ধধর্ম আমাদের জীবনকে যে কতটা উন্নত করিয়াছে তাহা আমরা বুঝি। আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা, যথাশক্তি আমাদের 'ফয়া' বা প্রভু বুদ্ধের অনুশাসন পালন করিতে চেষ্টা করি,—আমাদের দৌর্বল্য ঢের, কিন্তু শক্তি আমরা পাই সংঘ হিসাবে ধর্মের নিকট হইতে; আর এই ধর্ম হইতেছে বুদ্ধের উপদিষ্ট। আর এই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ—'বুড্ডা, ডামা, থিঙ্গা'—এই তিনটীই তো আসিয়াছে আপনাদের দেশ হইতে।

ভারতবর্ষের গৌরবের প্রতিচ্ছায়া হইতেছে ব্রহ্মের গৌরব—একথা আপনারাও ভুলিয়া গিয়াছেন, আমরাও ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি।" আমি বলিলাম—"ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের একমাত্র সংযোগ-সূত্র হইতেছেন আপনারা—বৌদ্ধ ধর্মকে এবং আপনাদের অবলম্বন করিয়া এই দুইটী দেশের মধ্যে আবার মৈত্রীর বন্ধন ঘটিতে পারে। এই বন্ধন দৃঢ় করা যেমন ভারতবর্ষে পালিশাস্ত্র ও ব্রহ্মের বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রহ্মের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা এক দিকে হইতে পারে, অন্য দিকে আমার আত্মীয় শান্তি-বাবুর মত ভারতীয়দের চেষ্টায় ব্রহ্মদেশের ভিক্ষুদের ও ভারতীয় হিন্দুদের সম্প্রীতিকে আশ্রয় করিয়া হইতে পারে।" ব্রহ্মে উপনিবিষ্ট ভারতীয়দের এ বিষয়ে অবহিত এবং চেষ্টিত না হওয়ায় যে তাঁহাদের ত্রুটী হইয়াছে, শান্তি-বাবু নিজেও তাহা স্বীকার করিয়া বিহারের আচার্য্যকে বলিলেন।

এইরূপ শিষ্টালাপ উভয় পক্ষেই বেশ লাগিতেছিল—কিন্তু ওদিকে উঁহার খাবার যে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আমরা মিনিট পনর-কুড়ি এইরূপ আলাপ করিয়া বিদায় লইলাম। আচার্য্য স্মিতমুখে বসিয়া-বসিয়া বিদায়-অভিনন্দন জানাইলেন, তাঁহার ইঙ্গিতে দুইজন ভিক্ষু আমাদের সঙ্গে আসিয়া খানিকটা পথ আমাদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

পিান্‌মানা শহরের আর একটী বিহারে ঐ দিনই শান্তি-বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলাম। ঐ বিহারটীর নাম Ko Gan Zayat Kyaung 'কো-গান-জয়াৎ-চ্যঙ্'। এটী পূর্ব-বর্ণিত 'কান-উ চ্যঙ্' অপেক্ষা সমৃদ্ধ। এখানে এ অঞ্চলের বর্মীদের সকলেরই বিশেষ ভক্তিভাজন একজন বৃদ্ধ ও জ্ঞানী ভিক্ষু থাকেন। পিান্‌মানা একটু পাহাড়ে' জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত; শহরে একটী অরণ্য-বিভাগীয় বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালা আছে, এই চ্যঙটী তাহার কাছেই, একটু টিলার মত উচ্চ স্থানে। এই চ্যঙে আমরা যখন গেলাম, তখন বেলা প্রায় বারোটা। শান্তি-বাবু খোঁজ লইয়া জানিলেন ভিক্ষুরা তাঁহাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিতেছেন, একটু পরেই তাঁহারা আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন। আমরা তখন চ্যঙ-এর হাতায় ইতস্ততঃ একটু ঘুরিয়া দেখিলাম। বাগানের মত অনেকটা জায়গার মধ্যে চ্যঙ-এর ঘর-বাড়ীগুলি। কতকগুলি স্থান, আমাদের আটচালার মত—কতকগুলি থামের উপরে কাঠে তৈয়ারী বর্মী কোঠা মাত্র। এইরকম একটী বাড়ীতে দেখি, অনেকগুলি বর্মী মেয়ে-পুরুষ রহিয়াছে। সকলেই পরিষ্কার এবং সুন্দর কাপড় পরা, মেয়েদের মুখে 'তানাখা'র গুঁড়া মাখা, মাথায় ফুল গোঁজা—যেন উৎসব বা নিমন্ত্রণের সভায় সকলে উপস্থিত। শুনিলাম, ইহারা চ্যঙ্-এর আচার্য্যের অনুরাগী ভক্ত, তাঁহার দর্শনলাভের

জন্য, তাঁহার কাছ হইতে দুইটী কথা শুনিবার জন্য আসিয়াছে—মাধ্যাহ্নিক আহার এই মঠেই সারিয়া লইবার আয়োজন করিতেছে ;—খাদ্যদ্রব্য সঙ্গেই আনিয়াছে—ভিক্ষুদের জন্য ও নিজেদের জন্য। এই বিহারটীতে লোকজন এবং ব্যস্ততা একটু বেশী বলিয়া মনে হইল।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের প্রধান ভিক্ষুর কাছে লইয়া গেল। দ্বিতল একটী কুঠীর মধ্যস্থ এক ঘরে তিনি তখন ছিলেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে দোতলায় উঠিলাম—এখানকার ব্যবস্থাও পূর্বের কান্-উ-চ্যঙ-এর মত, তবে এখানে অতটা আন্‌কোরা নূতন-নূতন ভাব নাই—মনে হইল, এই বাড়ীতে বহুকাল ধরিয়া লোকেরা দস্তুর-মত বসবাস করিতেছে। সেই বুদ্ধমূর্তি, বইয়ের আলমারী, টেবিল-চেয়ার, মাদুর বিছানা-পত্র, একটি হল-ঘরের এখানে-ওখানে রাখা। দেওয়ালে রকমারি ছবি—বর্মী ঢঙে আঁকা ; বুদ্ধের জীবনী অবলম্বন করিয়া আঁকা ছবির রঙ্গীন লিথোগ্রাফ ও তেরঙ্গা হাফটোন, রকমারি ক্যালেণ্ডার, মন্দিরের ফোটো, ভিক্ষুদের গ্রুপ-ফোটো। এখানে-ওখানে জাপানে তৈয়ারী লোহার উপরে এনামেল করা আমাদের পানের বড় ডাবর অথবা পিতলের বোকনোর আকারের পিক্‌দানী—ভিক্ষুরা আর তাঁদের ভক্তেরা যে খুব পান খাইতে ও পানের পিচ্‌ ফেলিতে অভ্যস্ত তাহার প্রমাণ যথেষ্ট বিদ্যমান। এই জাপানী এনামেলের পিক্‌দানীর রেওয়াজ বর্মায় খুব বেশী দেখিয়াছি—এগুলি চীনা-মাটির পাত্রের অনুকারী, গায়ে রকমারি চীনা ধাঁজের রঙীন ফুল-পাতা-নদী-পাহাড়ের নক্‌শা। দুইটী দ্বার অতিক্রম করিয়া, আচার্য্য-মহাশয় যে ঘরে ছিলেন আমরা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ছোট একটী ঘর—দেওয়ালে ছবি আর ক্যালেণ্ডার টাঙ্গানো, বইয়ের আলমারী, একটী খাটের উপর বিছানা, দুই-চারিখানি জল-চৌকীর মত কাঠের আসন। মেঝের উপর চাটাই পাতা। একটী দরওয়াজার সামনেই এক কাঠের বারান্দা বা রেলিং দেওয়া পথ—ওদিকে বাড়ীর অন্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত। একখানি মাদুরের উপর একটী কাষায় বস্ত্রে আবৃত বালিশে হেলান দিয়া, আচার্য্য মহাশয় অর্ধ-শয়ান। দর্শনীয় আকৃতি—venerable অর্থাৎ শ্রদ্ধোৎপাদক বলিলে যে ভাবটী মনে হয়, সেই ভাবের উপযোগী মূর্তি; মুণ্ডিত মস্তক; শ্মশ্রুগুম্ফহীন, প্রশান্ত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক মুখমণ্ডল—তাহাতে বয়সের রেখাপাত আসিয়া যাওয়ায় একটা গভীর চিন্তাশীলতার ভাব আনিয়া দিয়াছে। সর্বোপরি আমাদের আকর্ষণ করিল, মুখের মধ্যে একটা শান্তি ও চিত্তপ্রসন্নতার ভাব। দেখিয়াই মনে শ্রদ্ধা হয়, প্রণাম করিতে ইচ্ছা করে।

আচার্য্য মহাশয় আমাদের বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমরা চাটইয়ের উপরে বসিলাম। বর্মীদের পক্ষে দীর্ঘকায়, খুব লম্বা আর সুপুষ্ট একজোড়া গোঁফ, মাথায় লাল ও সবুজ রেশমের চাদর পরা এক সৌম্য-দর্শন ভদ্রলোক পিতলের ছোট হামানদিস্তা ও ডাঁটী লইয়া পান ছেঁচিতেছেন। আচার্য্য মহাশয়ের সামনে একটী পিক্‌দানী। মাধ্যাহ্নিকের পরে পান খাইয়া মুখশুদ্ধি করিয়াছেন, সঙ্গে-সঙ্গে পিক্‌দানীর ব্যবহারও চলিল। ঘরে আর দুই-তিন জন ভিক্ষু বসিয়া রহিলেন। শান্তি-বাবু যথারীতি নিজের ও আমার পরিচয় দিলেন, এবং আমার দো-ভাষীর কাজ করিলেন। তিনি আচার্য্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

আচার্য্য আধ-শোয়া অবস্থাতেই বলিতে লাগিলেন—"দেহের তো কুশল! কিন্তু ও-কুশলে কি আসে যায়? আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি যাহাতে যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই যে আমি বসিয়া রহিয়াছি,—আমার হাত-পা-মাথা সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, আমি আছি, এই বোধ যাহাতে যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। এরূপ দৃষ্টি ও অনুভব আমাদের হওয়া চাই, যাহাতে আমার এই যে হাত, ইহাতে অস্ত্রাঘাত করিলে বা ইহাকে কাটিয়া লইলেও আমার কিছু আসিল না বা গেল না—এইরূপ উপলব্ধি আমাদের হওয়া চাই।" তিনি এই কথাগুলি এমনই বিশ্বাসপূর্ণ অনুভূতির সঙ্গে বলিলেন যে, আমাদের মনে হইল তাঁহার নিজের মধ্যে এই উপলব্ধি যেন হইয়াছে। বহু পূর্বে পুরীর গোবর্ধন-মঠে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল (ইনি উড়িষ্যার একটী সামন্তরাজার মন্ত্রী ছিলেন, তিরিশ বৎসর বয়সে ঘর-সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন)—তাঁহারও সৌম্য প্রশান্ত মুখ-মণ্ডল দেখিয়াছিলাম, তাঁহারও মুখে এই ভাবের কথা এইরূপই উপলব্ধি-জাত দৃঢ়তার সহিত শুনিয়াছিলাম—তাঁহার কথা আমার তখনই মনে হইল। হীনযান বৌদ্ধ, অদ্বৈত বৈদান্তিক, এবং ভক্ত বৈষ্ণব, অথবা সূফী বা খ্রীষ্টান—ইহাদের সকলের শেষ কথা কি একই নয়?

আমরা যে এইরূপ তত্ত্বালোচনার মধ্যে প্রথমেই অবতীর্ণ হইব, এই ধারণা আমাদের ছিল না। আর এ বিষয়ে আমার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কিছুই নাই, শ্রোতা হওয়াই একমাত্র পথ। সংঘাচার্য্য কিয়ৎকাল ধরিয়া এইরূপ বলিয়া গেলেন—সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়া শান্তি-বাবু আমায় শুনাইতে লাগিলেন। আমার ইচ্ছা ছিল, হীনযান বৌদ্ধ মতে যে নির্বাণকে চরম বস্তু বা পরমার্থ বলিয়া উল্লেখ করে, সেই নির্বাণ কোনও সৎ বা সত্য বস্তু, ব্রহ্মবাদের বা পরব্রহ্মের সত্তায় বিলীন হওয়ার মত অবস্থা বলিয়া তাঁহার মনে হয় কি না, সে কথা আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি। সেই

জন্য আমি শান্তি-বাবুর মারফৎ প্রশ্ন ফাঁদিলাম—"সংসারকে তো পালি গ্রন্থে 'অনিচ্চ', 'দুক্‌খ' ও 'অনত্ত' (অর্থাৎ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম) বলিয়াছে ; 'অনত্ত' বা অনাত্ম—এই শব্দের তাৎপর্য্য কি ? আত্মা জিনিসটী কি—কিছু positive অর্থাৎ সদ্‌বস্তু, না negative বা অসৎ ?" এখন, পালি শব্দগুলি যথাযথ উচ্চারণ করিলে, সাধারণ বর্মী ভিক্ষুদের বোধগম্য হইবে না—বর্মী ভিক্ষুরা পালির মূল উচ্চারণকে বর্মী ভাষার উচ্চারণ-মোতাবেক বদলাইয়া পাঠ করিতে অভ্যস্ত। 'অনিচ্চ', 'দুক্‌খ', 'অনত্ত'—এই তিনটী পালি শব্দ আচার্য্যের পক্ষে সহজে ধরিবার জন্য আমি শান্তিবাবুকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম—"'অনিত্য বা অনিচ্চ' না বলিয়া, বলুন 'আনেইক্‌সা' (anicca স্থলে aneiksa), 'দুঃখ' বা 'দুক্‌খ' স্থলে বলুন 'দোক্‌কা,' আর 'অনাত্ম' বা 'অনত্ত' স্থলে বলুন 'আনাত্তা'।" আমাদের এই আলাপটুকু শুনিয়া, পালি কথাগুলি ধরিতে পারিয়া তিনি জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইলেন—শান্তি-বাবু তখন বলিলেন, "পালি শব্দগুলির বর্মী উচ্চারণ লইয়া কথা হইতেছে।" আমি বলিলাম—"আনেইক্‌সা, দোক্‌কা, আনাত্তা—অনিচ্চ, দুক্‌খ, অনত্ত।" এখন আমার জিজ্ঞাস্য, 'অনত্ত' বা 'অনাত্ত' ভাবটী আচার্য্য মহাশয়ের মত বা উপলব্ধি অনুসারে সত্যসত্যই কি,—সে দিক্ হইতে আলোচনা কিন্তু সম্পূর্ণ-রূপে অন্যদিকে চালিত হইল। পালি উচ্চারণ আর বর্মী উচ্চারণ—এই দিকে আলোচনার গতি ফিরিল। "চোরের মন বোঁচকার দিকে"—আর "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—নহিলে জগন্নাথ-দর্শন করিতে গিয়া লাউ-মাচা দেখিয়া লোকে ফিরিয়া আসে ? আমার অনাত্ম-ঘটিত জিজ্ঞাসা প্রকাশ করিয়া বলাই হইল না ;—উচ্চারণ-তত্ত্বের দিকে আলাপ-আলোচনা চলিয়া যাওয়ায় আমিও আপত্তি করিলাম না ;—আমি বলিলাম, "আপনারা বর্মা-দেশে পালির উচ্চারণ সংশোধন করিবার চেষ্টা করেন না কেন ? দন্ত্য 'স' কে 'থ'-রূপে বা 'দ' রূপে, 'র'কে 'য়'-রূপে, আর অন্যান্য স্বর ও ব্যঞ্জনকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে উচ্চারণ করেন, ইহাতে বুদ্ধবাণী মূল ভাষায় থাকিয়াও বিকৃত হয়, বর্মার বাহিরের পালি-ভাষাভিজ্ঞদের বুঝিবারও কষ্ট হয়—'নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা-সম্বুদ্ধস্স'কে কেন আপনারা 'নমো টাৎথা বাগাউআডো আয়াহাডো থান্‌মাথাম্বুড্ডাৎথা' পড়িবেন ?" তখন আচার্য্য একটু উৎসাহ করিয়া অর্ধশয়ান অবস্থা হইতে উঠিয়া হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "আমরা ঠিক-মত উচ্চারণ করি না—করিতে পারি না যে তাহা নহে, কিন্তু পালির মূল ধ্বনির একটী আমাদের মুখে সহজেই আর একটীতে পরিবর্তিত হয়—আমাদের-কাছে-সহজ এই পরিবর্ত্তনকে আমরা মানিয়া লইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি বাঁ হাতকে তুলিয়া উবুড়

করিয়া, খিলানের আকার করিয়া ধরিয়া, তদ্দ্বারা মুখের অভ্যন্তরের উপরের চোয়াল নির্দেশ করিলেন, অধোমুখে স্থিত ঐ হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলি যেন হইল মুখের মধ্যে স্থিত দাঁত; এবং এই উলটানো বাঁ হাতের চেটোর নীচেই চিৎ করিয়া ডান হাতের চেটো রাখিলেন—ডান হাতের চেটো হইল যেন নীচের চোয়াল; এবং ডান হাতের আঙ্গুলগুলিকে সংযুক্ত করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে ধরিয়া ও উঁচুতে নীচুতে চালিত করিয়া, তদ্দ্বারা জীভের কাজ করাইলেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—মূর্ধণ্য বর্গ কি ভাবে উচ্চারিত হয়, আর কেমন করিয়া বর্মীতে সেগুলি দন্ত্য বর্গের সামিল হইয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া দন্ত্য 'স' স্থানে দন্ত্য 'থ' দাঁড়াইয়াছে, কেমন করিয়া দন্তমূলীয় 'র', তালব্য 'য়' স্থানে আসিয়াছে, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। শান্তি-বাবুর অনুবাদ, তাঁহার উচ্চারণ-তত্ত্ব-বিষয়ক দ্রুত বক্তৃতার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিল না—আচার্য্য বর্মীতে অনর্গল বলিয়া চলিলেন, আমি বিশেষ প্রীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার হাতের সাহায্যে এই উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-ঘটিত ব্যাখ্যান শুনিতে ও দেখিতে লাগিলাম। চকিতের ন্যায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির একটী practical বা প্রযোজনার দিক যেন খুলিয়া গেল;—তালপাতার পুঁথি লইয়া গুরু-শিষ্য বসিয়াছেন, ব্ল্যাকবোর্ড নাই, ছবি আঁকিয়া সব জিনিস বুঝাইবার রেওয়াজও আসে নাই—প্রাচীন ভারতের গুরুরা বুঝি এই ভাবেই সহজে হাতের চেটো আর আঙ্গুলের সাহায্যে মুখের মধ্যে জীভ আর কণ্ঠ তালু দন্ত প্রভৃতির ক্রিয়া দেখাইয়া উচ্চারণ বুঝাইতেছেন। মনে হইল, নিশ্চয়ই গুরুপরম্পরায় প্রাচীন ভারত হইতেই শিক্ষার অর্থাৎ উচ্চারণ-তত্ত্বের অধ্যাপনায় এই 'হাতে-কলমে' বুঝাইয়া দিবার রীতি বর্মায় আসিয়া পহুঁছিয়াছে।

এইরূপে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটী বিষয়ে ইঁহাদের অধ্যাপনারীতি দেখিলাম। আচার্য্য মহাশয়ের কথায় বুঝিলাম, তিনি শিক্ষা বা উচ্চারণ-পর্য্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া পালি ব্যাকরণের খুঁটিনাটি সব বেশ জানেন। পালি বিদ্যায় প্রাচীন কালের অগাধ পাণ্ডিত্য এখনও বর্মার ভিক্ষুদের মধ্য হইতে লোপ পায় নাই। সংস্কৃতের সঙ্গেও তিনি কিছু-কিছু পরিচিত, 'শ, ষ, স'-র কথাও জানেন। আমি মাণ্ডালেতে দেখিয়াছি, বৌদ্ধ বিহার হইতে বর্মী ভিক্ষু মাণ্ডালেতে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালী 'পৌনা' বা ব্রাহ্মণদের মারফৎ বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত ব্যাকরণ আনাইতেছেন; উচ্চ কক্ষায় পালি শিক্ষায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে পরে বর্মী ভিক্ষুদের অনেকেই সাবেক পদ্ধতিমত সংস্কৃত ধরেন।

তারপর অন্য কথা উঠিল। বর্মা-প্রবাসী বাঙ্গালীরা যে রেঙ্গুনে সাহিত্য-সম্মেলন

করিয়াছেন তদুপলক্ষে আমি বর্মায় আসিয়াছি, বর্মী বইয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ (বিশেষ করিয়া বর্মী নাটক, কবিতা আর ইতিহাস-গ্রন্থের) আর বাঙ্গালা বইয়ের বর্মী অনুবাদ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আমি প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাও শুনাইলাম; আচার্য্য এ কথায় খুশী হইলেন। তারপর ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগের বিষয় লইয়াও অল্প দুই-চারি কথা হইল। শুনিলাম বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রায় সকলেই ভারত হইতে ব্রহ্মদেশের বিচ্ছেদের বিপক্ষে।

আমরা প্রায় আধ ঘণ্টাকাল এই ভাবে আলাপ করিলাম। বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে, আমরা বিদায় লইয়া উঠিলাম। সেই দীর্ঘগুম্ফ বর্মী ভদ্রলোকটি ও দুই চারিজন ভিক্ষু আমাদের সঙ্গে আসিলেন। এই আলাপে আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হইলাম। আমাদের দেশের যাঁহারা বর্মায় যাওয়া-আসা করেন বা বর্মায় যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা যদি এই শ্রেণীর ভিক্ষুদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তাহা উভয় জাতির পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ বর্মার বৌদ্ধ বিহারগুলিতে এই প্রকার ভিক্ষুদের মধ্যে এখনও বর্মী জাতির চিত্তের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি সুরক্ষিত রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংরক্ষক এই সকল ভিক্ষুর সহিত আলাপ-পরিচয়ে আমাদের চিত্তে অতি উচ্চ শ্রেণীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক পুষ্টি লাভ করিতে আমরা সমর্থ হইব, এবং বর্মার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা ভারতবর্ষকে—অর্থাৎ নিজেদেরও—জানিতে শিখিব।

[আশ্বিন ১৩৪৭]

হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে ?

কোন মুসলমান বন্ধু নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রশ্ন বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বার-এট্-ল, মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নির্মলবাবু ঐ প্রশ্নগুলি আমাকে পাঠাইয়া দিয়া ঐগুলির উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন। মানুষের জীবনযাত্রার সকল দিক্ ও সকল স্তর ব্যাপিয়া হিন্দুত্বের পরিধি ; এরূপ একটী ব্যাপক ধর্মের সংজ্ঞা সংক্ষেপে নির্ণয় করা যে কত কঠিন, পণ্ডিতেরা তাহা জানেন। আমি হিন্দুর চিন্তাধারা ও জীবনপ্রণালীতে দৃঢ় বিশ্বাসী, এবং যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি উহাকে নিজ জীবনে কার্য্যকর করিবার প্রয়াসী। এই মত ও পথের অনুযায়ী রূপে, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে আমি হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা-নির্ণয়-কার্য্যে চেষ্টিত হইতেছি।

প্রশ্ন : (ক) হিন্দুত্ব কাহাকে বলে ? (খ) হিন্দুত্ব (Hinduism) **ও হিন্দুধর্ম** (Hindu Religion) **কি এক ? যদি না হয়, তবে কোন্-কোন্ বিষয়ে উহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে ?**

উত্তর :—(ক) যে-সকল ধর্মের মূলনীতি (অথবা যে-সকল ধর্মের অনুগামিগণের মৌলিক ধর্মবিশ্বাস) একটি বিশেষ বা নির্দিষ্ট ধর্ম-বীজ অথবা সূত্র দ্বারাই প্রকাশিত হয়, হিন্দুত্ব সে প্রকারের ধর্ম নহে। অন্য সকল প্রকারের ধর্মমতকে বাদ দিয়া অথবা অস্বীকার করিয়া, একটি মাত্র মতবাদ লইয়াই ইহা গঠিত নহে ; বরং, হিন্দু ধর্মকে বহু ধর্মমতের সঙ্ঘ বা সমবায় বলা যাইতে পারে। এই ধর্ম ভারতের ক্ষেত্রে ভারতীয় জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়। এই ভারতীয় জনগণ, মনুষ্যজাতির বিভিন্ন শাখার সমবায় বা মিলনের ফল। প্রথম-প্রথম এই-সব বিভিন্ন জাতির মানুষের সভ্যতার পটভূমিকা এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-ভঙ্গী উভয়ই পৃথক্ ছিল। বৈদিক যুগ হইতে (এবং উহার পূর্ব হইতেও) আরম্ভ করিয়া, যুগে-যুগে ভারতীয় ঋষিগণ, জিনগণ ও বুদ্ধগণ, এবং আচার্য্য, সিদ্ধ ও ভক্তগণ, এই হিন্দুধর্মের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা, বর্ণনা এবং স্বরূপ-নির্ণয় করিয়াছেন, অথবা কাব্যময় কল্পনার সঙ্গে রঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। এই-সমস্ত ঋষি, ও জ্ঞানী সাধু ও ভাবুক, ধর্মের বিভিন্ন প্রকাশকে ও এই-সব প্রকাশের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও অনুষ্ঠানগুলিকে সর্বদা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন।

হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশেষত্ব এই :—

[১] যে পরা সত্তাকে (চরম বা শাশ্বত সত্যকে) মানুষ আত্মোৎকর্ষ দ্বারা, ও সাধনালব্ধ আভ্যন্তর অনুভূতি দ্বারা, অথবা ভগবানের প্রসাদ বা কৃপা দ্বারা লাভ করিতে পারে, মানুষ ইহজীবনে যে সত্তার একটি অংশমাত্র, যে সত্তা আমাদের জীবনের উর্ধ্বে অবস্থিত অথচ ওতপ্রোতভাবে উহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত, হিন্দুধর্ম সেই পরা সত্তায় বিশ্বাস করে, এবং যুক্তি দ্বারা, আস্থা দ্বারা ও কর্ম দ্বারা উহাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে।

[২] জীবনের সকল প্রকার দুঃখকে হিন্দুধর্ম স্বীকার করে, এবং এই-সমস্ত দুঃখকে দূর করিবার চেষ্টা করে।

[৩] কল্পকল্পান্তর হইতে অনন্তকাল ধরিয়া বিশ্ব-সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। হিন্দুধর্ম মানুষের জীবনযাত্রার এবং সেই অনন্ত বিশ্বের কোনও দিক্‌কেই উপেক্ষা করে না। মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির অংশমাত্র , হিন্দুধর্ম মানুষকে বিশ্ব-প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ মনে করে না। হিন্দুধর্মের মতে, মানুষ এবং প্রাকৃতিক জগৎ সেই এক পরমাত্মা বা শক্তি অথবা ঋতের প্রকাশ মাত্র।

[৪] হিন্দুধর্ম একটিমাত্র ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কিংবা মতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—সে ব্যক্তি ঈশ্বরের অবতার বলিয়াই স্বীকৃত হউন অথবা প্রেরিত পুরুষ বলিয়াই স্বীকৃত হউন, যদিও হিন্দুধর্ম সকল মহাপুরুষকেই শ্রদ্ধা করে। হিন্দুধর্ম স্বীকার করে যে, বিশ্বের মধ্যে নিহিত ও বিশ্বের উর্ধ্বে বিদ্যমান শাশ্বত সত্তা বা সত্য বহু প্রকারে নিজেকে প্রকাশিত করে ; এবং ভিন্ন-ভিন্ন পন্থাদ্বারা সেই একই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইহেতু, হিন্দুধর্ম একথা জোর করিয়া বলে না যে, প্রত্যেক মানুষকেই একটি বিশেষ মত বা creed অর্থাৎ ধর্ম-বীজ গ্রহণ করিতেই হইবে। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, মানুষ নিজ-নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা পায়, আন্তরিকতা ও উদারতার সহিত তাহারই অনুসরণ করিলে, জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ, সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

প্রায় সকল হিন্দুই (ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের অনুগামিগণ, এবং অন্যেরাও ইহার মধ্যে পড়ে) কর্ম-বাদ ও জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস করে ; কিন্তু প্রত্যেককেই যে ঐ বিশ্বাস করিতেই হইবে, এমন কোন অবশ্য বিধান নাই।

(খ) যদি religion এই ইংরেজী শব্দের মূল লাতীন ভাষা অনুসারে মৌলিক অর্থ ধরা হয়, অর্থাৎ 'চিন্তা বা মনন করা (মনুষ্যজীবন এবং ভগবান্ সম্বন্ধে চিন্তাকরা)' এই অর্থ ধরা হয়, তবে 'হিন্দুত্ব (Hinduism) অর্থাৎ হিন্দুর বিশিষ্ট চিন্তাধারা এবং

'হিন্দুধর্ম' (Hindu Religion) একই। হিন্দুদিগের ধরণে এই প্রশ্নের উত্তর আরও ভাল রূপে দেওয়া যায়। ধর্ম বলিতে দুইটি বিষয় বুঝায়—[১] বিচার, অথবা দর্শন-শাস্ত্র; [২] আচার অর্থাৎ জীবন-রীতি। দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপরই নির্ভর করে, বিশেষতঃ যখন আমরা সচেতন ভাবে কাজ করি। মানুষ ইহজীবন ও পরজীবন সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে, তদনুসারে সে কাজ করে। হিন্দুত্বের ব্যবহারিক দিক্‌টাকে 'ধর্ম' বলা হয়—'ধর্ম' অর্থে, 'যাহা ধারণ করে', অর্থাৎ জীবনযাত্রার পদ্ধতি বা নিয়ম। 'ধর্ম'কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) 'নিত্যধর্ম' অর্থাৎ সনাতন নৈতিক নিয়মগুলি (যথা,—সত্য, অস্তেয়, অহিংসা); এবং (২) 'লৌকিক ধর্ম' অর্থাৎ জীবনযাত্রার গৌণ নিয়মগুলি; সেগুলি ভিন্ন-ভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন পাত্র অর্থাৎ ব্যক্তিসমষ্টি ও জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে (যথা—পূজাপার্বণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান, উপবাস, বিশেষ খাদ্য বর্জন ইত্যাদি)। হিন্দুর 'দর্শন' (দর্শন = দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র) এবং হিন্দুর 'ধর্ম' (ধর্ম = যাহা ধারণ করে, অর্থাৎ সমাজ ও ধর্ম-বিষয়ক আচার-ব্যবহার ও বিধিনিষেধ)—এই দুইটী হিন্দুত্বের দুই দিক। অহিংসা, করুণা ও মৈত্রী মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম। সামাজিক ভাবে দেখিতে গেলে, মানুষের জীবনে তিনটী ঋণ পরিশোধ করিতে হয়—দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ। দেবতা বা ঈশ্বরের পূজা ও সেবা দ্বারা দেবঋণ, বিবাহ ও গৃহস্থাশ্রম দ্বারা পিতৃপুরুষ অর্থাৎ পূর্ব-পুরুষগণের ঋণ, এবং জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানবিস্তার দ্বারা ঋষিঋণ শোধ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। মোক্ষ-লাভের (অর্থাৎ সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি-লাভের) ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, সাংসারিক ব্যাপার বা বিষয় হইতে নির্লিপ্ত থাকা, এবং বৈরাগ্য, এই দুই উপায় অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষের জীবনের চারিটী পুরুষার্থ বা লক্ষ্য (উদ্দেশ্য)—ধর্ম (পুণ্যময় জীবন), অর্থ ও কাম (ধর্মানুমোদিত অভীষ্ট-সিদ্ধি, ও আনন্দ-উপভোগ) এবং মোক্ষ (সংসার বা জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তি)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা (বা লক্ষণনির্দেশ) কোন্ কোন্ পুস্তকে অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থে আছে?

উত্তর:—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হিন্দুধর্ম কোনও একটীমাত্র মতকে বা একটীমাত্র ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে একমাত্র সত্যবস্তু বলিয়া গ্রহণ করে না। সুতরাং কোনও-একখানিমাত্র পুস্তকে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত বা অনুমোদিত সমস্ত সত্য, আদ্যন্ত সমগ্র চিন্তাধারা, লিপিবদ্ধ নাই। উপনিষৎসমেত চতুর্বেদ, রামায়ণ, ভগবদ্-

গীতাসমেত মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতি এবং অন্যান্য গ্রন্থে হিন্দুর চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রার প্রধান বিষয়গুলি বর্ণিত আছে। ইহা ব্যতীত, বহুবিধ দার্শনিক পুস্তকে (মূলগ্রন্থে ও টীকায়), মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক সাধুসন্তগণের ভজনগানে, এবং দার্শনিক পণ্ডিতদের তত্ত্বালোচনায়, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন-প্রকারের ধার্মিক ভাবধারা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

যাঁহারা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা স্থির করিবার জন্য এক বা একাধিক Scripture বা ধর্মগ্রন্থ পড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য আমি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উল্লেখ করিতেছি :—

[১] ১৩খানি প্রধান উপনিষদ্ (বিশেষতঃ ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক এবং শ্বেতাশ্বতর); [২] ভগবদ্গীতা (হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী); [৩] শ্রদ্ধোৎপাদ-শাস্ত্র—অশ্বঘোষ-রচিত মহাযান-মতানুযায়ী বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ এক্ষণে লুপ্ত; কেবল চীন ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ বর্তমান। (বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই প্রকারভেদ; হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ এবং প্রামাণিক ইংরেজ গ্রন্থকারের ভাষায়, বৌদ্ধধর্ম হইতেছে 'বিদেশে প্রেরণ করিবার উপযোগী হিন্দুধর্মের রূপান্তর মাত্র।')

আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি পড়া যাইতে পারে :—

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী। [২] স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থাবলী; [৩] স্তর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ প্রণীত—Indian Philosophy (2 vols.) এবং Hindu View of Life; [৪] Sanatan Dharma : an advanced Text-book of Hindu Religion and Ethics (2nd edition), মাদ্রাজের থিওসোফিকাল সোসাইটি হইতে পুনঃপ্রকাশিত; [৫] Sir Charles Eliot-প্রণীত Hinduism and Buddhism (3 vols.); [৬] J. Estlin Carpenter প্রণীত Theism in Medieval India; [৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'সাধনা'; [৮] Ananda Kentish Coomaraswamy প্রণীত The Dance of Siva; [৯] বেলুড়, রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রকাশিত The Cultural Heritage of India (3 vols.)।

তৃতীয় প্রশ্ন—যে ব্যক্তি কোরান, বাইবেল, অথবা বৌদ্ধ পঞ্চশীলে বিশ্বাস করে এবং তদনুরূপ আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, ইচ্ছা করিলে সে কি হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইতে পারে?

উত্তর :—নিশ্চয়ই, কিন্তু কয়েকটী শর্ত আছে; অর্থাৎ, যদি সেই ব্যক্তি

হিন্দুদর্শনের মতগুলিকে (যথা, এক পরমেশ্বর বহু রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন ; এবং প্রতীকোপাসনা বা মূর্তিপূজা পাপ নহে, বরং ঈশ্বরের সাধনার একটা পথ বা স্তর মাত্র, যাহা বহু লোকের পক্ষে আবশ্যক—ইত্যাদি মতকে) মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত এবং পাপপূর্ণ বলিয়া উপেক্ষা না করেন ; এবং যতদিন হিন্দু সমাজের মধ্যে বাস করিবেন, তিনি ততদিন হিন্দু সমাজে যাহা বহুকাল ধরিয়া সদাচার বলিয়া প্রচলিত এরূপ অনুষ্ঠান ও আচরণের (যথা—গোমাংস-ভক্ষণ হইতে বিরতির) বিরোধী না হন ; এবং ছলে অথবা বলে অপরকে নিজের ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণায় ও নিজের আচরণে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা যদি না করেন।

চতুর্থ প্রশ্ন—পৃথিবীর যে কোন দেশেই কেহ জন্মগ্রহণ করুক না কেন, কি কি গুণ বা লক্ষণ থাকিলে তাহাকে হিন্দু বলিয়া জানা যাইবে ?

উত্তর ঃ—বিশ্বমানবের এবং মানুষের মনের বহুবিধ বিচিত্রতায় পূর্ণ বিকাশকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সমগ্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে একটীমাত্র বাঁধা-ধরা মতে বা বিশ্বাসে পরিণত করা হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য নহে ; হিন্দুধর্ম একত্বের ভিত্তিতে বহুত্বকে স্বীকার করে, এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বা একচ্ছত্রত্ব কামনা করে না। যে-কোনও স্বভাবজ (স্বাভাবিক প্রণালীতে উদ্ভূত) ধর্ম, যাহা নিজেকে পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত পথ বা মত বলিয়া অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ভাব পোষণ করে না (যথা, প্রাচীন বাবিলন, মিসর, গ্রীস, ইতালীর ধর্ম ; এবং প্রাচীন টিউটনিক, কেল্‌তিক ও শ্লাব জাতির ধর্ম ; প্রাচীন পারস্যের ধর্ম ; চীনের 'তাও' ও কন্‌ফুশীয় ধর্ম ; জাপানের শিন্তো ধর্ম ; আফ্রিকা, ওশেয়ানিয়া, এবং কোলম্বস কর্তৃক আবিষ্কারের পূর্বেকার আমেরিকার ধর্ম), তাহারই সহিত হিন্দুধর্মের ঐক্য আছে। হিন্দুধর্ম ভারতে উদ্ভূত স্বভাবজাত ধর্ম। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, এবং নিজেকে হিন্দু বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন, তবে তাঁহার নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা উচিত :—

[১] সকল ধর্মের প্রতি তাঁহার উদার সহানুভূতি থাকা চাই ; এবং তাঁহাকে এই মত স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, সকল প্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতিই সত্য, এবং নিজ-নিজ দেশ, কাল ও জাতির সম্পর্কে সেই সমস্ত বিভিন্ন অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী ; অধিকন্তু তাঁহাকে ইহাও মানিতে হইবে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম বা আচার অপরের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, ততক্ষণ উহাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করা পাপ। যদি তিনি সকল প্রকার ধর্মের সম্মেলনের অথবা সংমিশ্রণের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আস্থা পোষণ করিতে না পারেন, তবে একান্ত

পক্ষে একটী ধর্মমত বজায় রাখিয়া অপরগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার অপেক্ষা বরং সকল ধর্মই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব স্থানে অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই মত তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে।

[২] হিন্দুধর্মের মধ্যে যে ভিন্ন-ভিন্ন ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এবং অনুভূতি থাকা চাই। ইচ্ছা করিলে, তিনি, নিজের আধ্যাত্মিক রুচি ও আবশ্যকতা অনুসারে, ঐ সকল অভিজ্ঞতার বা ধর্মমতের যে-কোনও একটী গ্রহণ করিয়া উহার অনুসরণ করিতে পারেন।

[৩] প্রথম প্রশ্নের 'ক' চিহ্নিত অংশের উত্তরে যে নিত্যধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে, যতদিন পর্য্যন্ত তিনি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন (এবং বিশেষ করিয়া যখন তিনি হিন্দুদের মধ্যে বাস করিতে থাকিবেন), ততদিন তাঁহাকে হিন্দুদিগের লৌকিক ধর্মের মুখ্য বিধানগুলিও পালন করিতে হইবে। যেহেতু হিন্দুধর্মের দেশ, কাল ও জাতি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি ভারতবাসীদিগের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির বিকাশ, অতএব আশা করা যাইতে পারে, কোন বিদেশী অ-ভারতীয় হিন্দু হইয়া ভারতবর্ষে বাস করিতে চাহিলে, তিনি সঙ্গত সীমার মধ্যে, অর্থাৎ অপর জাতির লোকদের ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া, ভারতবাসীদিগের মঙ্গলকে নিজের মঙ্গল মনে করিবেন। যিনি হিন্দুদর্শন এবং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিবেন অথচ হিন্দুদিগের দেশের বাহিরে বাস করিবেন, তিনি ভারতের প্রতি citizen's obligations অর্থাৎ নাগরিকোচিত কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য থাকিবেন না, এবং হিন্দুর লৌকিক ধর্ম অনুসরণ করাও তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হইবে না।

পঞ্চম প্রশ্ন—কি কি বিশ্বাস ও আচরণ থাকিলে, কোনও ব্যক্তি হিন্দু বলিয়া কথিত হইতে পারিবেন না ?

উত্তর :—তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

হিন্দুশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত ও হিন্দু জীবনে প্রকাশিত চিন্তাধারার প্রতি এবং হিন্দু জীবন-প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব একটী অমার্জনীয় দোষ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

[১] যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডীর বাহিরের লোকেরা ঐশ্বরিক সত্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে, এবং যাহারা ঐ ধর্মানুযায়ী নহে অথবা উহা গ্রহণ করিবে না, তাহারা ঈশ্বরের চক্ষে পাপী ও নরকগামী, তবে তিনি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না।

[২] যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, যাহারা সেই ব্যক্তির নিজের ধর্মের বিধানানুসারে যাহা নিষিদ্ধ ও পাপ বলিয়া বিবেচিত এমন আচার ও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকে (যথা, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের এবং রোমান কাথলিকদিগের প্রতীকোপাসনা), ঐ-সকল অনুষ্ঠান অপরের ধর্মে এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিলেও, তাহারা ভগবানের কাছে পাপী, তবে তিনি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না।

[৩] যদি কেহ হিন্দুদিগের মধ্যে বাস করিয়াও হিন্দু জনসাধারণের অনুসৃত সদাচার ও সাধু জীবন-পদ্ধতি সম্বন্ধে চিরাগত হিন্দু আদর্শের অনুগামী না হন (যথা, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, কোন-কোন খাদ্য পরিহার, এবং পর্ব, উৎসব ইত্যাদি পালন বিষয়ে), যদি তিনি হিন্দুদের মধ্যে বাস করিয়া এবং নিত্যধর্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া, মোটামুটি ভাবে হিন্দু লৌকিক ধর্মের ব্যবস্থার অনুযায়ী না হন, তবে তিনি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না।

[৪] কোনও ভারতীয় পুরুষ বা নারীর যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে (বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বাস করিবার সময়ে) যে, 'আমি সর্বপ্রথমে ভারতবাসী, তারপর অন্য কিছু' ; হিন্দুধর্ম যাহার একটী প্রধান অঙ্গ সেই ভারতীয় সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রা-প্রণালী যদি তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক পটভূমিকা না হয়, তবে তিনি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন না।

উপসংহারে আমি অতীব আনন্দের সহিত নিম্নলিখিত উক্তিটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমার মতে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান করা, এবং ধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তার মধ্যে বিভিন্নতা থাকিবেই ইহা স্বীকার করা, আমাদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। কোরানে এই মর্মে একটী কথা আছে যে, ঈশ্বর মানবজাতিকে এমনভাবে সৃষ্টি করিতে পারিতেন যে তাহাদের একটিমাত্র ধর্ম হইত ; কিন্তু তিনি মানুষকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন, মানুষ নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি কিরূপে ব্যবহার করে ইহা দেখিতে চাহিলেন। মনে হয়, মানবের চিন্তাধারার বিভিন্নতা সৃষ্টি-পরিকল্পনার অন্তর্গত ; এবং অন্যান্য বিষয়ে এই প্রকার বিভিন্নতা প্রকৃতির কার্য্যের অনুরূপ। ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদযুক্ত বৃক্ষ, পুষ্প ও ফল প্রকৃতিদেবীর বৈচিত্র্য-প্রিয়তার সার্থক দৃষ্টান্ত। আসুন, আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, সকল ধর্মেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। এই উদার ভ্রাতৃভাবের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমরা যেন সকল ধর্মমত অধ্যয়ন করি, ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হই। অতীতকালে

ভারতের যে সূফীগণ ও সাধুসন্তগণ প্রেম ও সহানুভূতি দ্বারাই অপরকে জয় করিতেন, তাঁহারা পূর্বোক্ত নীতিরই অনুসরণ করিতেন ; এবং ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ এই উদার ভাবের মধ্যেই সংস্কৃতি-ঘটিত সমস্যার মীমাংসা পাইবে।" (The Cultural Problem : Oxford Pamphlets on Indian Affairs, No. 1, pp. 24-25)।

ভারতের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান রাজপুরুষ, ভারত-সচিবের ভূতপূর্ব পরামর্শমন্ত্রী এবং বর্তমানে পাঞ্জাবের বহাবলপুর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি স্তর আব্দুল কাদির উপরিলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রসভার সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহার ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যায় অনুরূপ উদার এবং সহানুভূতিপূর্ণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। মৌলানা আজাদ ভারতের, বিশেষতঃ মুসলমান ভারতের এবং আরবদেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিদ্যা ও আদর্শের উত্তরাধিকারী ; তিনি ধর্মের গৌণবিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা এবং মুখ্যবিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া অত্যাবশ্যক মনে করেন। ইস্লাম-ধর্মের মুখ্যবিষয়গুলি বা মূল কথা তাঁহার মতে এই :—[১] ঈশ্বরে বিশ্বাস,, এবং [২] সৎকার্য্য-সম্পাদন। বাস্তবিক পক্ষে, ঐগুলিই সকল স্বভাবজ ধর্মের মূল বিষয়, এবং সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাব বা চিন্তাধারার সহিত ঐগুলির মিল আছে। আমরা ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানেরা, যখন আব্দুল কাদির এবং আবুল কালাম আজাদের মত ব্যক্তির নেতৃত্ব মানিয়া চলিতে পারিব, তখন ভারতমাতার সকল দুঃখকষ্টের অবসান হইবে। এই নেতাদের মত গ্রহণ করিলে আমরা কোনও সঙ্কীর্ণ, পরের প্রতি অসহিষ্ণু, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বা প্রতিষ্ঠানের ভ্রাতৃত্ব অপেক্ষা, অধিকতর বিস্তীর্ণ এবং উচ্চতর ভ্রাতৃত্বের সঙ্ঘে সম্মানীয় স্থান পাইব। অপর পক্ষে, 'যুদ্ধং দেহি'-ভাবশীল, অসহিষ্ণু এবং পরবর্জনশীল ইস্লামের ভাব লইয়া "শিক্ওয়াহ্" এবং "জওয়াব ইশিক্ওয়াহ্" নামক উর্দু কবিতার লেখক পরলোকগত স্তর মুহম্মদ ইক্বালের নেতৃত্ব মানিয়া চলিলে, ঐ সম্মানীয় স্থান আমরা পাইব না। ইক্বাল যে অসহিষ্ণু মনোভাব লইয়া ঐ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই কথা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই বা পারেন নাই যে, ঈশ্বরের কাছে বিশেষভাবে প্রিয় কোন জাতি বা ধর্ম নাই, ঈশ্বর কোন নির্দিষ্ট মনুষ্যমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নহেন, কিন্তু তিনি সমগ্র মানবজাতির ; তিনি ন্যায়বান্ ও সমদর্শী সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিচারক ; তিনি, কেবল এক রূপে নয়, পরন্তু বহু রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন॥

[প্রবন্ধটী মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।]

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে দুই চারিটী কথা নিবেদন করিতে চাহি।

"বাঙ্গালী জাতি" বলিলে, যে জন-সমষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বা ঘরোয়া ভাষা রূপে ব্যবহার করে, সেই জন-সমষ্টিকে বুঝি। বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা-ভাষী জন-সমষ্টির মধ্যে, দেশের জল-বায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন-যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভাব-ধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই "বাঙ্গালী সংস্কৃতি"। এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি-কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে-সকল কাব্যে কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই "বাঙ্গালা সাহিত্য"।

এখন পাঁচ কোটির অধিক লোকে বাঙ্গালা ভাষা বলে। সংখ্যা-হিসাবে বাঙ্গালী জাতি নগণ্য নহে। গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী—ইহাদের প্রত্যেকের অধিবাসিগণের চেয়ে বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষী জনগণের সংখ্যা অধিক। আমি এই বিষয়ে আমার দেশবাসিগণের ও অন্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি যে, ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি মাতৃভাষা হিসাবে বাঙ্গালা বলে। হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দু) ভাষার স্থান অবশ্য ভারতবর্ষে বাঙ্গালার উপরে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; হিন্দুস্থানী বাঙ্গালার তিন গুণের কাছাকাছি লোকের মধ্যে প্রচলিত, এবং আরও অনেকে ইহা বলিতে পারে; কিন্তু হিন্দুস্থানী উত্তর-ভারতের অর্থাৎ আর্য-ভাষী ভারতের চৌদ্দ কোটি লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও ইহা (অর্থাৎ হিন্দ্-উর্দু সমেত পশ্চিমা-হিন্দী উপভাষাগুলি) মাত্র সাড়ে চার কোটি লোকের মাতৃভাষা—বাকী সাড়ে নয় বা দশ কোটি লোক ঘরে লহন্দী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, মালবী, গাঢ়বালী, কুমাউনী, অবধী, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরিয়া, মগহী, মৈথিলী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলে; এই সব ভাষা হিন্দুস্থানী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র;—এই সব ভাষা যাহারা ঘরে বলে, তাহাদের কাহাকেও হিন্দুস্থানী (হিন্দী বা উর্দু) শিখিতে হইলে, দস্তুর-মত চেষ্টা করিয়া, অনেকটা বিদেশী ভাষা শিক্ষার মত করিয়াই শিখিতে হয়। পৃথিবীর সংখ্যা-গরিষ্ঠ

ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালার স্থান সপ্তম। বাঙ্গালার অগ্রে এই কয়টী ভাষার নাম করিতে হয়—উত্তর-চীনা, ইংরেজী, রুষ, জরমান, স্পানিশ, জাপানী; পরে বাঙ্গালা। কিছুকাল হইল, Benn's Six-penny Library নামক সুপরিচিত এবং প্রামাণিক গ্রন্থমালা-মধ্যে Firth নামক একজন ইংরেজ ভাষা-তত্ত্ববিৎ ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধে একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন; এই পুস্তকে তিনি সংখ্যার দিক্ বিচার করিয়া এবং অন্য বিষয়ে লক্ষণীয়ত্ব বিচার করিয়া, বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিয়াছেন। অবশ্য, কেবল অন্যতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভাষা হওয়ায় বাঙ্গালার বা আর কোনও ভাষার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কিছু নাই; কিন্তু সংখ্যাধিক্য উপেক্ষণীয় বস্তু নহে; এবং সংখ্যাধিক্য ভিন্ন, বাঙ্গালার সাহিত্য-গৌরবও অন্য পাঁচটী ভাষার মধ্যে বাঙ্গালার একটী প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে।

এই যে পাঁচ কোটি বাঙ্গালা-ভাষী যাহারা সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া এবং বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ জুড়িয়া বাস করিতেছে, এবং কিছু কিছু বাঙ্গালার বাহিরে অ-বাঙ্গালীদের দেশে গিয়াও যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই পরস্পরের মধ্যে একটা ভাষা-গত স্বাজাত্য অনুভব করে। বিদেশে অন্য ভাষা-ভাষীদের মধ্যে গেলে, এই স্বাজাত্য-বোধটুকু আমাদের কাছে বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হয়। আজ-কাল জাতীয়তা বা স্বাজাত্যের প্রধান আধার হইতেছে ভাষা। যেখানে বিভিন্ন ভাষা, সেখানে ধর্ম, মানসিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থান এক হইলেও, সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়া কঠিন,—সম্পূর্ণাঙ্গ স্বাজাত্য-বোধ আসা এক রকম অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে এমন একাধিক জন-সমষ্টিকে, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কারণে একরাজ্য-পাশে বদ্ধ করা যায়; কিন্তু দেখা যায়, ভাষা-গত বৈষম্য থাকিলে, ওতপ্রোত-ভাবে মিল হয় না। রাষ্ট্রীয় বন্ধনে সঙ্ঘ-বদ্ধ বিবিধ-ভাষা-ভাষী একাধিক জন-সমষ্টির মধ্যে একটী বিশেষ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা স্বরূপ গ্রহণ করিলে, একতার সূত্র একটা অধিক হয় বটে, কিন্তু প্রান্তিক সত্তা বর্জন করিয়া সকলে মিলিত হইতে চাহে না বা পারে না। সম্পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে, দেশে মাত্র একটী ভাষাকে রাখিতে হয়,—অন্যগুলিকে হয় একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা নির্জীব ও ক্ষয়িষ্ণু করিয়া রাখিতে হয়। এই রূপটি করিয়াই তবে গ্রেট ব্রিটেনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঘটিয়াছে—স্কট্‌লাণ্ডের গেলিক ও ওয়েল্‌স্-এর ওয়েল্‌শ্-ভাষাকে বিলোপের পথে আগাইয়া দিয়া ইংরেজীর প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষাকে আশ্রয় করিয়া ব্রিটিশ একতা। ফ্রান্সেও এইরূপে দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রভাঁসাল ভাষাকে নির্জীব ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রেতঁ

ভাষাকে অমিয়ুু ও মৃতকল্প করিয়া, ফরাসী ভাষায় অবিসংবাদিত ও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠার আসনেই ফ্রান্সের রাষ্ট্র-গত একতা স্থাপিত হইয়াছে। বহুভাষাময় রুষ সাম্রাজ্যেও এই প্রকারে প্রান্তিক ভাষাগুলিকে পিষ্ট ও বিনষ্ট করিয়া দিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়,—এক সময়ে রাজভাষা রুষের চাপে পোলীয় ভাষা, লিথুআনীয়, লেট্, এস্তোনীয়, ফিন্, আর্মানী প্রভৃতি ভাষার প্রাণসংশয় হইয়াছিল; কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যের পতন ও উক্ত সাম্রাজ্যের খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল ভাষা যাহারা বলে তাহারা মাথা-কাড়া দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, নিজ নিজ ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিয়া লইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ঐক্যের প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া, কেহ-কেহ হয় তো এগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ও ইহাদের স্থানে একমাত্র হিন্দীর অবস্থান কামনা করিবেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার সাধন করা অসম্ভব—এক কোটি, দুই কোটি, পাঁচ কোটি লোকের ভাষাকে এ ভাবে মারা যায় না। বিশেষতঃ প্রান্তিক জনগণ যেখানে পৃথক্ প্রান্তিক সত্তা সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে এরূপ কল্পনা করাও যায় না।

এই প্রান্তিক সত্তার প্রাণই হইতেছে—প্রান্তিক ভাষা। এই জন্য বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষা যাহারা বলে, তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা মানিয়া লইয়া, সম্পূর্ণ রূপে একীভূত রাষ্ট্রের পরিবর্তে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের গঠনকেই আদর্শ ধরিতে হয়। সোভিয়েট-শাসিত রুষ-দেশে এইরূপ হইয়াছে। রুষ সাম্রাজ্যের তাবৎ ভাষাকে এখন নিজ নিজ গৃহে স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া সমগ্র দেশ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষেও দাঁড়াইতেছে তাহাই। The United States of India, অর্থাৎ 'ভারতবর্ষের সংযুক্ত রাষ্ট্র'—ইহাই হইতেছে ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। কংগ্রেস ভারতকে বঙ্গদেশ, আসাম, উৎকল, বিহার, হিন্দুস্থান বা সংযুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থানী মধ্য-প্রদেশ, মহাকোশল, মারাঠি মধ্য-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সিন্ধু, গুজরাট, অন্ধ্র, তামিল-নাড়ু, কেরল, কর্ণাট প্রভৃতি ভাষাগত প্রদেশে বিভাগ করিয়াছেন। এক একটী প্রদেশে এক এক একটী ভাষা, এক একটী ভাষা অবলম্বন করিয়া এক একটী স্বতন্ত্র জাতি; সকলেই বৃহত্তর বৃত্ত-স্বরূপ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সকলেরই প্রাদেশিক বা প্রান্তিক সত্তা বা সভ্যতা প্রাচীন ভারতের সার্বভৌম ভারতীয় সত্তা বা সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সকলকেই হিন্দী ভাষাকে "রাষ্ট্র-ভাষা" বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও, প্রত্যেকেরই

কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া গিয়াছে; সকলেরই অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য ও জনপদের সম্মিলনে আধুনিক কালের এক অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্গালী জাতির বা বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে হইলে, ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষের অন্য জাতির মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে সেই সব বিষয়ে বাঙ্গালীদের সমতা আছে। বিশেষের উপরে ঝোঁক দিয়া সাধারণকে ভুলিলে চলিবে না—সাধারণটাই যখন প্রধান। ভারতের সমস্ত-প্রদেশ-সুলভ একটা সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাঙ্গালাও তাহার অংশীদার। অন্য দেশের সম্পর্কে, ভারতের সমস্ত প্রদেশে বিদ্যমান এই ভারতীয়ত্বটুকু, ঈষৎ-পরিবর্তিত বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপে তত্তৎ প্রদেশের বৈশিষ্ট্যের পর্য্যায়েই পড়ে। একটী বাহ্য ও সহজ ব্যাপারেই এইটী দেখা যায়। আমাদের চেহারায় একটা সাধারণ অনন্যদেশ-লভ্য ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য আছে; অন্য দেশের মানুষের তুলনায়, আমাদের দেশের যে কোনও প্রদেশের মানুষের মধ্যে এই জিনিসটী পাওয়া যায়। গায়ের গৌর-বর্ণে, কিংবা শ্যাম-বর্ণে, মুখ-চোখের সমাবেশে, চাহনিতে, চলনে বলনে, এমন একটা লক্ষণীয় জিনিস আছে, যাহা কেবল ভারতবর্ষেরই পরিচায়ক। অত্যন্ত গৌরবর্ণ পারসী অথবা কাশ্মীরী, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবী, খুব খাটো চেহারার এবং খুব কালো রঙের সাঁওতাল, প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় জন-সঙ্ঘের মধ্যে কতকগুলি extreme type অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতীক বাদ দিলে, যে কোনও প্রদেশ হইতে হউক না কেন, সাধারণ ভারতবাসী জনকতককে ধরিয়া, তাহাদের দেহ হইতে কানের মাকড়ী, লম্বা চুল, গালপাট্টা, উড়ে খোঁপা, লম্বা টিকি, ফোঁটা বা বিভূতির ঘটা, মুসলমানী কায়দায় ছাঁটা গোঁফ, প্রভৃতি প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছনা দূর করিয়া দিয়া, এক রকমের কাপড়-চোপড় পরাইয়া দিলে, তাহারা কোন্ প্রদেশের লোক তাহা বলা কঠিন হইবে। ইউরোপে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ জিনিস দেখিয়াছি, আমার মত অনেকেও দেখিয়াছেন; এদেশেও লোকে অহরহঃ দেখিতেছে। ইংরেজী-পোশাক-পরা সাধারণ ভারতীয় মানুষকে, যদি বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার বাহিরে, রেলে বা অন্যত্র দেখি, তাহা হইলে জোর করিয়া বলা কঠিন হয়—লোকটী কোন্ প্রদেশের; লোকটী বাঙ্গালী হইতে পারে, না-ও হইতে পারে, এ বোধও আমাদের আসে। আকারে যেমন, প্রকৃতিতেও তেমনি—বাঙ্গালী ভারতীয়ই বটে। বাঙ্গালী তাহার আধুনিক

সংস্কৃতিতে হয় তো চার আনা ইউরোপীয়,—তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে,—এবং আট আনা ভারতীয়; বাকী চার আনায় সে বাঙ্গালী, এবং এই চার আনার মধ্যে আবার অনেকটা ভারতীয়ত্বের বাঙ্গালা বিকারমাত্র,—বাকীটুকু খাঁটী বাঙ্গালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙ্গালী। বাঙ্গালী জাতির এক অংশে আবার ইস্‌লামের প্রভাব আছে—সে প্রভাব কতটা আছে, তাহার নির্ণয় বাঙ্গালী মুসলমান ঐতিহাসিকেরাই করিবেন; তবে তাহা খুব বেশী নহে; এ বিষয় লইয়া পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এতটা কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী জাতির কথা, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, এই সব জিনিসের ভারতীয় আধার বা পটভূমিকার কথা বাদ দিলে চলিবে না। অন্যান্য প্রদেশের অর্থনৈতিক আক্রমণের চাপে আমরা মৃতকল্প হইয়া পড়িতেছি; ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় ঘরের মুসলমানের চাপও আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালার হিন্দুদের উপর অনুচিত ও অন্যায় ভাবে এখন আসিয়া পড়িয়েছে—ইংরেজানুগৃহীত মুসলমানের এখনকার এই দাপট, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই হানিকর হইবে। কতকটা দিশাহারা হইয়া আমাদের এক দল উপদেশ দিতেছেন—"সামাল, সামাল, এটা আপদের সময়; কর্ম্ঠ-ব্রত বা কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালীয়ানার খোলার ভিতরে হাত পা গুটাইয়া লইয়া ব'সো, বাঁচিয়া যাইবে; 'ভারত' 'ভারত' বলিয়া চেঁচাইও না। বলো, 'বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয়ের মা বঙ্গ-মাতার জয়'; Sinn Fein অর্থাৎ We Ourselves এই মন্ত্র জপ করিয়া, প্রকাশ্য ভাবে বঙ্গ-বহির্ভূত ভারতের অর্থনৈতিক উপদ্রব ও শোষণ হইতে বাঁচ; এবং সম্ভব হইলে, এই মন্ত্র আওড়াইয়াই আরব তথা উর্দুওয়ালা পশ্চিমা মুসলমানদের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক আক্রমণ হইতে বাঙ্গালার মুসলমানদেরও বাঁচাও,—তাহারা খাঁটি বাঙ্গালী থাকিলে, বাঙ্গালী হিন্দু, তুমিও বাঁচিয়া যাইবে।"

কথাটা খুবই সমীচীন, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিবার। Confusion of issues অর্থাৎ বিষয় বিভ্রম যাহাতে না ঘটে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙ্গালার বুকের ভিতরে যে বৃহত্তর মারওয়াড়, বৃহত্তর উৎকল, বৃহত্তর সংযুক্ত প্রদেশ বৃহত্তর পাঞ্জাব, বৃহত্তর ভাটিয়া ভূমি, বৃহত্তর বিহার, বৃহত্তর অন্ধ্র, বৃহত্তর কেরল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাণপণে সে সকলের অর্থনৈতিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে, এবং অন্যান্য

প্রদেশের সঙ্গে ও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আমাদের যে আধ্যাত্মিক যোগ আছে সেই যোগকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। যত প্রকার শক্তি আছে তাহার প্রয়োগ করিয়া, অর্থনৈতিক দিকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই পাড়িয়া যাহারা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাদের বাড়া ভাতে ভাগ বসাইতেছে, মুখের গ্রাসটী কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের বাধা দিতে হইবে। কিন্তু সেই কারণে বাঙ্গালার বাহিরের ভারতের, নিখিল ভারতের সভ্যতাই যে বাঙ্গালার সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, তাহা ভুলিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করিব,—কিন্তু সাংস্কৃতিক যোগ ভুলিব না; নূতন সাংস্কৃতিক যোগের সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিব না; এবং আমাদের অতীতের কথার আলোচনা কালে, আমাদের জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য বিচারের কালে, বাঙ্গালার পটভূমিকা নিখিল ভারতবর্ষকে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইব না। বাঙ্গালা পল্লীগাথার মলুয়া মদিনা ও কমলার চরিত্র লইয়া আমরা গর্ব করিব-ই,—এই অপূর্ব নারীচরিত্রগুলি আমাদের বাঙ্গালারই পল্লীজীবনের সৃষ্টি; কিন্তু উমা সীতা ও সাবিত্রীকে লইয়া কম গৌরব করিব না; কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা সীতা সাবিত্রী বাঙ্গালার বিশেষকে অতিক্রম করিয়া, বাঙ্গালারই অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধার সূত্রে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হইয়া, বাঙ্গালীর জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীক হইয়া বিরাজ করিতেছেন;—আদি আর্য্য-ভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙ্গালা ভাষাই থাকে না, তেমনি সীতা-সাবিত্রীকে অর্থাৎ আদি আর্য্য-যুগের বা সংস্কৃত যুগের ঐতিহ্য ও আদর্শকে বাদ দিলে, বাঙ্গালার সংস্কৃতি বলিয়া আমরা কোনও জিনিসের কল্পনা করিতে পারি না। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সীতা-সাবিত্রীকে "ঘাঘরা-পরা বিদেশিনী" এই আখ্যা দান করিয়া, বাঙ্গালার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন, বা হৃদয়-সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিতে চাহেন; তাঁহাদের স্থানে নবাবিষ্কৃত বাঙ্গালা-পল্লী-গাথাবলীর নায়িকা মলুয়া মদিনা ও কমলাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সীতা-সাবিত্রীর সত্যকার পোশাক যাহাই থাকুক (তবে প্রাচীন আর্য্য যুগে মেয়েরা যে ঘাঘরা পরিত না, এবিষয়ে সন্দেহ নাই), বাঙ্গালার মাটিতে তাঁহারা কোনও এক অজ্ঞাত পুণ্য মুহূর্তে পাদক্ষেপ করা মাত্রই আমরা তাঁহাদের বাঙ্গালী ধরণের সাড়ী পরাইয়া দিয়া আমাদের নিতান্ত আপনার জন করিয়া লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। রায় বাহাদুরের এই চেষ্টার বিশ্লেষণ এখন করিব না; কিন্তু আমাদের দেশে

মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটী শব্দ দ্বারা এই চেষ্টার বর্ণনা করা যায়—সে শব্দটী হইতেছে "আদিখ্যেতা"—অর্থাৎ, বিশেষ এক প্রকার ভাববিলাসের আতিশয্য; এবং এই চেষ্টার মূলে, অন্যান্য মনোভাব ও চিন্তা ব্যতীত এই জিনিসটী দেখিতে পাই—আমাদের বাঙ্গালার জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা বা আধার-ভূমি কি কি বিষয় লইয়া, তৎসম্বন্ধে অবহিত না হইয়া, নূতন ও অনপেক্ষিত কথা (তাহা যুক্তি-সহ হউক বা না হউক) বলিয়া, sensationalism বা চমক-প্রদতার সৃষ্টি করা। বঙ্গদেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত না হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যই গড়িয়া উঠিত না—ইহাও এইরূপই sensational এবং যুক্তি-হীন কথা।

ভাষা না হইলে nation বা জাতি হয় না; এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে, জাতীয়তা-বোধও আসে না। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি লইয়া অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির কথা পুনরুদ্ধার করা যায় সেগুলি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা এখন হইতে মাত্র হাজার বৎসর পূর্বে নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পূর্বে বাঙ্গালা সৃজ্যমান, তখন বঙ্গদেশের ভাষা অপভ্রংশ ও প্রাকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ হিমাচল-কন্যা গঙ্গার দান; পলিমাটিতেই বাঙ্গালার উদ্ভব। বাঙ্গালা দেশের ভাষাও তেমনি উত্তর-ভারতে উদ্ভূত আর্যভাষা প্রাকৃত হইতেই উৎপন্ন। গঙ্গার মত আর্য্য-ভাষার নদী বাঙ্গালা দেশেও বহিল, এই নদীর স্রোতে দেশের প্রাচীন অনার্য্য ভাষা ভাসিয়া গেল—আর্য্য ভাষা প্রাকৃত, এই বাঙ্গালায় আসিয়া, ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার রূপ ধারণ করিল; প্রাকৃতের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ধাত্রী-রূপে সংস্কৃতও আসিল।

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি-পর্ব একটু সংক্ষেপে শেষ করিয়া, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিব।

প্রাগৈতিহাসিক কালে বাঙ্গালার অধিবাসীরা কি প্রকারের মানুষ ছিল তাহা জানা অসম্ভব; তবে এইটুকু অনুমান হয় যে, যে যুগের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক বাঙ্গালীর পূর্ব-পুরুষেরাই বাস করিয়া আসিতেছে। উত্তর-ভারতের লোকেরা বিহার ও আরও পশ্চিম হইতে বরাবর-ই বাঙ্গালা দেশে কিছু-কিছু করিয়া আসিয়াছে—এখনও যেমন আসিতেছে। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালাদেশের লোকেদের প্রকৃতি বা আকৃতি বিশেষ কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে কি না, জানা যায় না। নৃতত্ত্ববিদ্যা বাঙ্গালা-দেশের অধিবাসীদের কুলজী বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও স্পষ্ট কিছু বুঝা

যাইতেছে না। এ বিষয়ে আমি যাহা বলিব, তাহা মুখ্যতঃ-ই ভাষার দিক হইতে অনুমান করিয়াই বলিব। ভাষা-তত্ত্ব হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে আর্য্য ভাষা আসিবার পূর্বে এ দেশের লোকেরা কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা বলিত। মনে হয় পাঁচটী জাতির বা পাঁচটী বিভিন্ন প্রকারের ভাষা বলিত এমন লোকেদের মিশ্রণে উত্তর-ভারতের নানা জনগণের উদ্ভব হইয়াছে; সেই পাঁচটী জাতি হইতেছে—[১] Negroid নিগ্রোরূপ বা Negrito নেগ্রিটো, [২] Austric অস্ট্রিক, [৩] দ্রাবিড়, [৪] আর্য্য, এবং [৫] Sino Tibetan বা Tibeto-Chinese অর্থাৎ ভোট-চীন। অনুমান হয়, আদিম যুগে, যখন মানুষ আদিম কালের বা প্রথম কালের অমসৃণ প্রস্তরের অস্ত্র ব্যবহার করিত, তখন ভারতের অনাদি অরণ্য-সমূহে, বিশেষ করিয়া ভারতের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থান-সমূহে, ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, ঊর্ণাবৎ-কেশযুক্ত নিগ্রোসম্পৃক্ত নেগ্রিটো বা 'নিগ্রোবটু' জাতির মানুষ বাস করিত। ইহা এখন হইতে কম করিয়া ধরিলেও পাঁচ ছয় হাজার বছর পূর্বেকার কথা। শিকার-লব্ধ মাংস, বন্য কন্দ-মূল এবং মৎস্য ইহাদের আহার ছিল, কৃষিকার্য্য ইহারা জানিত না, এবং ইহাদের সভ্যতার কোনও বালাই ছিল না। ইতিমধ্যে Indo-China ইন্দোচীন হইতে অস্ট্রিক জাতির লোকেরা আসামের উপত্যকা-ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে থাকে। অস্ট্রিক জাতির মূল ভাষা, ও মূল অস্ট্রিক জাতি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, উত্তর ইন্দোচীনের কোনও স্থানে, এইরূপ অনুমিত হয়। অস্ট্রিক জাতি একটী লক্ষণীয় সভ্যতার পত্তন করে। অস্ট্রিক জাতির আকৃতি ও প্রকৃতি কি প্রকার ছিল, তাহা বলা যায় না; ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিৎ Przyluski প্‌শিলুস্কি অনুমান করিয়াছেন, তাহারা পীতাভ-বর্ণ ছিল, তাহারা কতকটা মোঙ্গোল জাতির মতন দেখিতে ছিল। ইহাদের বিভিন্ন শাখা দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রসৃত হয়; দক্ষিণের দেশে গিয়া ইহারা সেখানকার আদিম জাতিদের সহিত মিলিত হয়, ও সেখানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহারা মালয় বা Indonesian ইন্দোনেসীয় জাতিতে, এবং পরে প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়া আরও মিশ্রণের ফলে Melanesian মেলানেসীয় ও Polynesian পলিনেসীয় জাতিতে রূপান্তরিত হয়। ইহাদের কতকগুলি দল ইন্দোচীনেই রহিয়া যায়; তাহাদের উত্তরপুরুষ হইতেছে দক্ষিণ-বর্ম্মা ও শ্যামের Mon মোন্ বা Talaing তালৈঙ্ জাতি এবং কম্বোজের Khmer খ্‌মের্ জাতি, এবং ব্রহ্ম, শ্যাম ও ফরাসী ইন্দোচীনের কতকগুলি অর্ধ বর্বর জাতি। ইহাদের একটী শাখা নিকোবারদ্বীপে উপনিবিষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন, কতকগুলি শাখা

ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষে খুব সম্ভবতঃ ইহারা অল্প-বিস্তর আদিম নিগ্রোবটুদের সহিত মিলিত হয়, নিগ্রোবটু ও অস্ট্রিকের রক্তে মিশ্রণ ঘটে; এই সংমিশ্রণের ফলে Kol কোল বা Munda মুণ্ডা জাতির উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে। আবার কোথাও এই মিশ্রণ প্রায় হয়-ই নাই, যেমন খাসিয়াদের মধ্যে।

Hevesy হেভেশি নামে একজন হঙ্গেরীয় পণ্ডিত সম্প্রতি এই মত প্রচার করিতেছেন যে, Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয় জাতির একটী শাখা সাইবেরিয়া হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে আইসে, এবং তাহাদের আনীত ভাষাই স্থানীয় অন্য ভাষার প্রভাবে পড়িয়া কোল বা মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয়। হেভেশি কোল ভাষার সহিত অস্ট্রিক ভাষার যোগ অস্বীকার করেন। হেভেশির মতের এখন বিচার চলিতেছে—ইহাতে সকলে এখনও সায় দেন নাই।

ভারতের বহুস্থলে নিগ্রোবটুদের বিলোপ ঘটিয়াছিল। আসামের পার্বত্য অঞ্চলের কোনও-কোনও স্থানে, দক্ষিণ-ভারতের দুই-একটী বন্য জাতির মধ্যে, এবং দক্ষিণ-বেলুচিস্থানে, এই নিগ্রোবটুর অস্তিত্বের নিদর্শন এখনও কিছু-কিছু বিদ্যমান আছে। অস্ট্রিকদের আগমনে নিগ্রোবটুদের জীবনের অবসান ঘটিল। তাহাদের ভাষারও কোনও নিদর্শন এখন আর নাই। উত্তর-ভারতে এবং বাঙ্গালা দেশে বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু আর রহিল না। উত্তর-ভারত ও বাঙ্গালার লোকদের মধ্যে কচিৎ এখনও নিগ্রোবটু চেহারার লোক বা নিগ্রোবটু চেহারার আমেজ নিম্নতম শ্রেণী বা জাতিতে দেখা যায়; তাহা হইতে এই জাতির সহিত, পরবর্তী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের মিলনই সূচিত হয়।

অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে প্রথম কৃষি-কার্য্য ও তদবলম্বনে সভ্য-অর্দ্ধ সভ্য জীবনের পত্তন করে। উহারা ধান, পান, কলা, লাউ, বেগুন, নারিকেলের চাষ করিত; পাহাড়ের গা কাটিয়া ধানের খেত্ প্রস্তুত করিত, সমতল জমীতেও চাষ করিত। প্রথমটা উহাদের চাষ ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মত। লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্ণ-মুখ কাষ্ঠ-দণ্ড ব্যবহার করিত। ধনুর্বাণ ছিল ইহাদের প্রধান অস্ত্র। একখণ্ড গুঁড়িকাঠে তৈয়ারী ডোঙ্গায় এবং কতকগুলি গুঁড়িকাঠ বাঁধিয়া তৈয়ারী আকারের বড়-বড় নৌকায় করিয়া উহারা বড় বড় নদী, এমন কি সাগরও পার হইত। ইহারা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করিত—মানুষের মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা গাছে, পাহাড়ে, অথবা অন্য জীব-জন্তুর ভিতরে প্রবেশ করিত, এইরূপ ধারণা ইহাদের ছিল। এই ধারণাই, পরবর্তী কালে ইহাদের লইয়া হিন্দু-জাতির সৃষ্টি হইবার পরে, হিন্দুদের মধ্যে উদ্ভূত পুনর্জন্মবাদে পরিণত হয়।

শ্রাদ্ধের অনুরূপ রীতি—মৃতকে মধ্যে মধ্যে আহার্য্য দান—ইহাদের মধ্যেও ছিল বলিয়া মনে হয়। মৃতকে ইহারা হয় বৃক্ষ-সমাধি দিত, অর্থাৎ কাপড় বা বল্কলে জড়াইয়া বৃক্ষ-স্কন্ধে মৃতদেহ রাখিয়া দিত; অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া সমাধির উপরে দীর্ঘাকার প্রস্তর-খণ্ড খাড়া করিয়া পুঁতিয়া দিত।

এই অস্ট্রিক জাতির ভাষার নিদর্শন ভারতবর্ষে আমরা কোল-ভাষাগুলিতে ও খাসিয়া-ভাষাতে পাই। এই ভাষার প্রভাব পাঞ্জাবের ভাষায়, উত্তর-কাশ্মীরের হুন্‌জা-নাগিরের Barushaski বুরুশাস্কি ভাষাতে, এবং নেপালের নবাগত কতকগুলি ভোট-চীনা ভাষাতেও আছে; এবং মধ্য-ভারতে, দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর কেরলেও ইহাদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরানেও ইহাদের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকা অসম্ভব নহে। ভারতের অস্ট্রিকদের সঙ্গে যে নিগ্রোবটুদের মিশ্রণ হওয়া খুবই সম্ভব ছিল, সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। উত্তর-ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমতঃ এই অস্ট্রিক জাতির লোকেরাই বাস করে; সেখানে ইহারা কৃষি-মূলক একটা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। "গঙ্গা" এই নামটি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ বলিয়াই অনুমিত হয়। ইহাদের কৃষি-মূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি। উত্তর-ভারতের সভ্য কৃষি-জীবী অস্ট্রিকেরাই (সম্ভবতঃ কিছু পরিমাণে নেগ্রিটোদের সহিত মিশ্রিত), পরে কিছু পরিমাণে দ্রাবিড় ও অতি অল্প-স্বল্প আর্য্যদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, হিন্দু জাতিতে পরিণত হয়। উত্তর ভারতে তথা বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদের জড় বা মূল হইতেছে, দ্রাবিড় তথা আর্য্য দ্বারা রক্তে ও সভ্যতায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবান্বিত (এবং সম্ভবতঃ নেগ্রিটোদের সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিত) অস্ট্রিক জাতি। অস্ট্রিক জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়—ইহার সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণ-যুক্ত, প্রফুল্ল-চিত্ত, দায়িত্ব-হীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহ-হীন, দৃঢ়তা বিহীন, এবং সংহতি-শক্তিতে হীন ছিল; কিন্তু লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি ছিল—এই প্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই।

ভারতে আগত শুদ্ধ বা মিশ্রিত অস্ট্রিক জাতির সমস্ত শাখাই কৃষিজীবী বা সুসভ্য ছিল না; কতকগুলি শাখা বনে জঙ্গলে, অনেকটা নেগ্রিটোদের মতনই শিকার করিয়া বেড়াইত। এই অরণ্যবাসী নিম্ন স্তরের অস্ট্রিকগণই "নিষাদ"

"ভিল্ল-কোল্ল" বলিয়া প্রাচীন ভারতে খ্যাত ছিল, এবং ইহাদেরই বংশধর হইতেছে আধুনিক কোল জাতির নানা শাখা—সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, শবর, গদব, কুর্‌কু, ভীল প্রভৃতি। ইহা বেশ দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, ভারতের ধর্ম-অনুষ্ঠানে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি প্রভৃতির অস্ট্রিক প্রভাবেরই ফল। অস্ট্রিকেরা গো-পালন করিত না, কিন্তু বোধ হয় তুলার কাপড় ইহারাই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় ইহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, পরে ভারতে আসিয়া তামার ব্যবহার শিখিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

অস্ট্রিকদের আগমন হয় উত্তর-পূর্ব হইতে; দ্রাবিড়েরা আসে উত্তর-পশ্চিম হইতে। দ্রাবিড়েরা সম্ভবতঃ অস্ট্রিকদের ভারতে আগমনের পরে আসিয়াছিল; তবে এ সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই; এমনও হইতে পারে যে, একই সময়ে ভারতবর্ষে পূর্বে ওপশ্চিমে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় উভয়ের আগমন হয়। দ্রাবিড়দের জ্ঞাতিরা ইরান, ইরাক, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে ও গ্রীসে এবং গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে বাস করিত, এইরূপ অনুমান হয়। আবার অস্ট্রিকদেরও প্রসার ভারতের পশ্চিমেও ঘটিয়া থাকিতে পারে। দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকদের অপেক্ষা সভ্য এবং সঙ্ঘ-শক্তিতে পূর্ণ ছিল বলিয়া অনুমান হয়; ইহাদের সভ্যতা ছিল নগরকে অবলম্বন করিয়া, অস্ট্রিকদের মত কেবল আদিম বা গ্রামীণ সভ্যতা নহে। মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পার বিরাট নগরগুলি আদিম দ্রাবিড়দেরই কীর্তি বলিয়া মনে হয়। দ্রাবিড়েরা চাষ করিত—বোধ হয় যব ও গম ইহারাই বাহির হইতে ভারতে আনে, এবং ইহারা গোপালনও করিত। শিব ও উমা, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি প্রধান পৌরাণিক দেবতারা মুখ্যতঃ দ্রাবিড়দেরই দেবতা ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়; যোগ-সাধন-পদ্ধতি ইহাদেরই আধ্যাত্মিক সাধনার পথ ছিল। অস্ট্রিকেরা সংখ্যা-বহুল অথবা প্রবল ছিল উত্তর-পূর্বে, ও কতকটা গঙ্গার উপত্যকায়; দ্রাবিড়েরা বোধ হয় পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতেই বেশী করিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আদিম দ্রাবিড় জাতির চরিত্র কি প্রকারের ছিল, তাহা পরবর্তী যুগের দ্রাবিড় সাহিত্য ও দ্রাবিড় জাতি হইতে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহারা কর্মঠ ও কৃতকর্মা অথচ ভাব-প্রবণ, mystic বা রহস্যবাদী, আধ্যাত্মিক বিশ্বাসযুক্ত, শিল্পী, ও সঙ্ঘশক্তি-যুক্ত জাতি ছিল। ভারতের সর্বত্রই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের মধ্যে অল্প-বিস্তর মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এখন যেমন ছোট-নাগপুরে দ্রাবিড়-জাতীয় ওরাঁও ও অস্ট্রিক-জাতীয় মুণ্ডাদের পাশাপাশি অবস্থান করিতে দেখা যায়, বোধ হয় প্রাচীন

কালে উত্তর-ভারতে ও বাঙ্গালায় বহু অংশেই সেই-রূপ ছিল। দ্রাবিড়ীয় লোকেরা ও অস্ট্রিক লোকেরা পরস্পরের প্রতিবেশপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে। মনে হয়, গঙ্গার উপত্যকায় এই দুই জাতির ও সভ্যতার বিশেষ মিশ্রণ হয়। তবে পশ্চিম-ভারতে ও দক্ষিণাপথে এবং তামিল দেশে দ্রাবিড়েরা বহুকাল ধরিয়া নিজেদের সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত অবিকৃত রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বাঙ্গালা দেশের ভৌগোলিক নামে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতের আর্য্য-ভাষায়—কি সংস্কৃতে, কি প্রাকৃতে, কি আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলিতে—একটী লক্ষণীয় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার ছাপ সুস্পষ্ট। বাঙ্গালায় ও অন্য আর্য্য ভাষায় এমন সব রীতি আছে যাহা বৈদিক ও অন্য আর্য্য ভাষায় মিলে না—অথচ সেরূপ রীতি দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষায় আছে। এই-সমস্ত বিষয় অন্য-বিস্তর অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। এগুলি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, আর্য্য-ভাষা উত্তর ভারতে ও বাঙ্গালায় প্রসৃত হইবার বা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে, দেশে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল; অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষায় কথা দিয়াই দেশের নদ-নদী পাহাড়-পর্বত ও গ্রামের নাম-করণ করিয়াছিল, সেই সকল নামকে কোথাও ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া উত্তর কালে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা সেই সকল নাম বিকৃত হইয়া, অর্থ-হীন নাম-রূপে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। (যথা—অনার্য্য ভোট-ব্রহ্ম ভাষায় 'তিস্তাং' হইতে 'তিস্তা' ও 'ত্রিস্রোতাঃ,' কোল ভাষার 'কব-দাক্' হইতে 'কপোতাক্ষ', 'দামু-দাক্ হইতে 'দামোদর'; বিকৃত অনার্য্য নাম—যথা প্রাচীন বাঙ্গালার 'আউহাগড্ডি', 'দিজমকা-জোলী', 'বথট' বা 'বহড', 'বাল্লহিট্টা', 'মোডালন্দী' ইত্যাদি, আধুনিক বাঙ্গালার 'বালুটে, মুড়ুন্দী, বয়ড়া, চুঁচুড়া, বগুড়া', ইত্যাদি।) এখন হইতে আড়াই হাজার বছর আগে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরাই বাঙ্গালা দেশে বাস করিত, সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া তাহারা ছিল; দেশে তখন আর্য্য ভাষা স্থাপিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়; ইহাদের পরে আসিল আর্য্য, এবং তৎপরে ভোট-চীন জাতির শাখা—ভোট-ব্রহ্ম, শ্যাম-চীন, ও অন্যান্য। ইহাদের আদি পিতৃভূমি ছিল Yang-tsze-Kiang য়াঙ্‌ৎসে কিয়াঙ্ নদীর উৎপত্তি-স্থলে। ইহারা খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি ভারতের দিকে আসে, এবং হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভোট বা তিব্বত হইতে ইহাদের কতকগুলি দল ভারতে প্রবেশ করে; আবার ইহাদের অন্য কতকগুলি দল ('বড়' বা 'মেচ' শাখা) আসাম ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা

দিয়া উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে উপনিবিষ্ট হয়। কোন্ সময়ে ইহাদের বঙ্গদেশে আগমন হয় তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের পূর্বে 'কম্বোজ' নামক একটী জাতি উত্তর-বঙ্গে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে এই 'কম্বোজ' শব্দটী 'কোঁচ' বা 'কোচ' শব্দের একটী প্রাচীন রূপের সংস্কৃতীকরণ মাত্র —'কোঁচ' বা 'কম্বোজ'-গণ ভোট-চীন জাতিরই একটী শাখা। কিন্তু অন্য মত অনুসারে, এই 'কম্বোজ'-গণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব সীমান্তের—'কম্বোজ' জাতিরই একটী শাখা; পশ্চিমের এই কম্বোজগণ আর্য্য-ভাষী, জাতিতে ভোট-চীন শ্রেণীর নহে। যাহা হউক, মনে হয়, ভোট-ব্রহ্ম জাতির মানুষ বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব সীমানায় এখন হইতে দুই হাজার বৎসরের পূর্বেই আসিয়াছিল। তখন বাঙ্গালা দেশের মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা, উত্তর-ভারতের আর্য্য ভাষা এবং আর্য্য বা হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্ঘ-বদ্ধ ভোট-চীন জাতির যে লোকেরা ভারতে আসিয়াছিল, তাহারা, অনুমান হয়, প্রকৃতিতে প্রফুল্ল-চিত্ত, কর্মঠ, শ্রমী ও কল্পনা-বিহীন ছিল। চীন দেশে এই জাতি এক বিরাট সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কোনও বড় সংস্কৃতি ভারতে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা বাঙ্গালা দেশের অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য্য সভ্যতা মানিয়া লইয়া, উত্তর- ও পূর্ব-বাঙ্গালায় বাঙ্গালী জনগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে—এবং এখনও হইতেছে। সংস্কৃতির দিক হইতে, বাঙ্গালী সংস্কৃতির গঠনে, ভোট-চীন জাতির দান নগণ্য বলিয়াই মনে হয়।

উত্তর-ভারতে নেগ্রিটো অবলুপ্ত; অস্ট্রিক, মিশ্র অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক, মিশ্র নেগ্রিটো ও দ্রাবিড় এবং মিশ্র অস্ট্রিক-নেগ্রিটো-দ্রাবিড়, এই সব জনগণ, যখন উত্তর-ভারতের অনার্য্য জাতিরূপে নিজ মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া বাস করিতেছে, যখন দেশ ছিল খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং দেশে কোনও ঐক্য-বিধায়িনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিও ছিল না;—এমন সময়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্ত-রূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, disciplined বা শৃঙ্খলা-সম্পন্ন, সুদৃঢ়-রূপে সঙ্ঘ বদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত, বাস্তব সভ্যতায় কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ অথচ নূতন বস্তু উপযোগী হইলে গ্রহণ করিতে সদা-চেষ্টিত, এমন আর্য্য জাতি ভারতে দেখা দিল। আর্য্যেরা আসিয়া খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্ম-রাজ্য পাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল। আর্য্যদের আগমন কখন ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটা মত এই যে, পূর্ব-ইউরোপের কোনও স্থানে আর্য্যদের আদি পিতৃভূমি ছিল; সেখান হইতে তাহারা

(হয় মাসিডন ও থ্রেশিয়া এবং কৃষ্ণ-সাগরের দক্ষিণে এশিয়া-মাইনরের উত্তর ভাগ হইয়া, না হয় কৃষ্ণ-সাগরের উত্তরে দক্ষিণ-রুষ হইয়া, ককেসস্ পর্বত পার হইয়া) প্রথমটায় মেসোপোতামিয়ায় আসে। সেখানে বাবিল ও আসুরীয় জাতি এবং অন্যান্য সুসভ্য জাতির সহিত সংস্পর্শে আসে; পরে খ্রীঃ-পূঃ ১৫০০-র দিকে, ইহাদের কতকগুলি দল পূর্বে পারস্য দেশে ও ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। ভারতবর্ষে তাহারা বৈদিক ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র বা সূক্ত লইয়া আসিল; তাহারা আনিল তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্য সভ্য জাতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

ভারতবর্ষের সু-সভ্য, অর্ধ-সভ্য ও অ-সভ্য, সব রকমের অনার্য্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্য্যদের প্রথম সংস্পর্শ হয় তো বিরোধময়ই হইয়াছিল। কিন্তু অনার্য্য ভারতে আর্য্যদের উপনিবেশ হইবার পর হইতেই উভয় শ্রেণীর মানুষ—অনার্য্য ও আর্য্য—পরস্পরের প্রতিবেশ-প্রভাবে পড়িতে থাকে। আর্য্যেরা বিদেশ হইতে আগত, এবং পার্থিব সভ্যতায় তাহারা খুব উচ্চে ছিল না। আর্য্যদের ভাষা আসিয়া, দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করিয়া দিল; উত্তর ভারতের কোল ও দ্রাবিড় অনার্য্যদের মধ্যে ঐক্য-বিধায়ক ভাষার অভাব ছিল, আর্য্য-জাতির বিজেতৃ-মর্য্যাদা লইয়া আর্য্য-ভাষা সে অভাব পূর্ণ করিল। ক্রমে ক্রমে ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত এক হাজার বৎসরের মধ্যে, গান্ধার হইতে বিদেহ ও চম্পা (অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের পশ্চিম সীমা) পর্যন্ত প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারতে আর্য্য-ভাষার জয়জয়কার হইল; আর্য্য ও অনার্য্য—দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক—মিশিয়া, উত্তর-ভারতের (অর্থাৎ পাঞ্জাবের ও বিহার পর্যন্ত গাঙ্গ উপত্যকার) হিন্দুজাতিতে পরিণত হইল। আর্য্যের ভাষা ও আর্য্যের ধর্ম—বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান—অনার্য্যেরা শিরোধার্য্য করিয়া লইল; অনার্য্যেরা আর্য্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মানিল। কিন্তু অনার্য্যের ধর্ম মরিল না, অনার্য্যের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনার্য্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতা-বাদে, পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগ-চর্য্যার তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে, আর্য্যদের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য্য ও অনার্য্য, এই টানা ও পড়িয়ান মিলাইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্র বয়ন করা হইল।

উত্তর-ভারতের গঙ্গা-তীরের আর্য্যসভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতায় আর্য্য অপেক্ষা অনার্য্যের দানই অনেকে বেশী, কেবল আর্য্যদের ভাষা ইহার বাহন

হইল। আর্য্য ও অনার্য্যের রক্তের মিশ্রণ পাঞ্জাবে আর্য্যদের আগমনের সময় হইতেই হইতেছিল; গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেশ-সমূহে ইহা আরও অধিক পরিমাণে হইল। কোথাও বা জাতিকে জাতি দ্বিজত্বের অর্থাৎ আর্য্যত্বের দাবী করিয়া বসিল, এবং বহু স্থলে ক্রমে-ক্রমে সে দাবী স্বীকৃতও হইল। বাঙ্গালা দেশে আর্য্য-ভাষা লইয়া যখন উত্তর-ভারতের—বিহার ও হিন্দুস্থানের—লোকেরা দেখা দিল, যখন উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য জাতির সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদও বাঙ্গালা দেশে আসিল, তখন উত্তর-ভারতে মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও এক জাতি হইয়া গিয়াছে। রক্তের বিশুদ্ধি বোধ হয় তখন আর কোনও আর্য্যবংশীয়ের ছিল না।

মৌর্য্যরাজগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বে, বাঙ্গালা দেশে আর্য্য-ভাষার ও আনুষঙ্গিক উত্তর-ভারতের গাঙ্গ-উপত্যকার সভ্যতার বিস্তার ঘটে নাই বলিয়া অনুমান হয়। মৌর্য্য-বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত-রাজবংশের রাজত্ব পর্য্যন্ত —খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫০০ পর্য্যন্ত, এই আট শত বৎসর ধরিয়া, ভাষায় বাঙ্গালা দেশের আর্য্যীকরণ চলিতেছিল; এই আট শ' বছর ধরিয়া বাঙ্গালার অস্ট্রিক- ও দ্রাবিড়-ভাষী জনগণ নিজ অনার্য্য ভাষা-সমূহকে ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে আর্য্য-ভাষা—অর্থাৎ মগধের প্রাকৃত—গ্রহণ করে; উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা এবং তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য—অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর-ভারতের আর্য্য ও অনার্য্যের ইতিহাস ও পুরাণ—বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ করিল; বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ আসিল, তাহাও বাঙ্গালায় গৃহীত হইল।

এইরূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য্য—এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল। উত্তর-ভারতের গাঙ্গ সভ্যতাই যেন এই নব-সৃষ্ট আর্য্য-ভাষী বাঙ্গালী জাতির জন্ম-নীড় হইল। রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অনার্য্য ছিল। যেটুকু আর্য্য রক্ত বাঙ্গালী জাতির গঠনে আসিয়াছিল, সেটুকু আবার উত্তর-ভারতেই অনার্য্য-মিশ্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আর্য্য-ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি একটা নূতন মানসিক নীতি বা বিনয়-পরিপাটী, যাহাকে ইংরেজীতে discipline বলে, তাহা পাইল; বাঙ্গালীর অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য্য মনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গলের কারণই হইল। আর্য্য মনের—ব্রাহ্মণ্যের—এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে যখন চীনা পরিব্রাজক Hiuen Tsang

হিউএন্-ৎসাঙ্ বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কথার ভাবে মনে হয় যে, তখন সমস্ত বাঙ্গালা দেশটা আর্য্য-ভাষী হইয়া গিয়াছিল। তারপরে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বরেন্দ্র-ভূমিতে পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, নব-সৃষ্ট বাঙ্গালী জাতি নবীন এক গৌরবময় জীবনে প্রবেশ-লাভ করিল। প্রথমটায় বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতেরই চর্চায় তৎপর হইলেন। তাহার পরে তাঁহারা দেশ-ভাষার দিকে দৃষ্টি দিলেন। পাল-রাজগণের রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দুই শতকের মধ্যেই মাগধী-প্রাকৃত এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ হইতে একটু বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষা, একটী স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; এবং খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্য-ভাগ হইতে বৌদ্ধ গুরুদের হাতে এই স্বতন্ত্র ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায়, সাহিত্য-সৃষ্টি—গান-রচনা—হইতে লাগিল।

আমাদের বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসের কাঠামো বা মূল-কথা এইরূপ বলিয়াই আমার ধারণা। আর্য্য-ভাষী বাঙ্গালী জাতির গঠনের সঙ্গে-সঙ্গে যখন বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়, তখন কেহ বাঙ্গালীর নিজস্ব অনার্য্য সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই; তখন যে ছাঁচে বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য—রীতি-নীতি শিল্প-সাহিত্য সবই ঢালা হইয়াছিল, তাহা ছিল উত্তর-ভারতের বা নিখিল ভারতের সর্ব-জয়ী হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন) মন,—ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন সমাজ, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, শিল্প ও সাহিত্য। যে ছাঁচে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতিকে ঢালা হইল, মোটের উপর সেই ছাঁচ এখনও বাঙ্গালী সমাজে বিদ্যমান। উপস্থিত কালে, অর্থনৈতিক ও মানসিক নানা বিপর্য্যয় এবং বিপ্লবের আগমনে, আমরা স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আমাদের সমাজকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আবার এক নূতন ছাঁচে ঢালিতে যাইতেছি।

পাল-যুগে নূতন-সৃষ্ট বাঙ্গালী জাতির মনের সুর, তাহার আর্য্য-ভাষার তারকে অবলম্বন করিয়া, উত্তর-ভারতের মনের সঙ্গে যে ভাবে বাঁধা হইয়া গিয়াছে, মোটের উপরে সে সুরটী এখনও প্রবল ভাবে বিদ্যমান। এই একই সুরে নানান্ ঝঙ্কার শুনা গিয়াছে; কখনও বৌদ্ধ, কখনও ব্রাহ্মণ্য; ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে কখনও বৈদিক (বৈদিকের ঝঙ্কার বাঙ্গালা দেশের সুরে চিরকালই অতি ক্ষীণ ভাবে শুনা গিয়াছে), কখনও শৈব, কখনও শাক্ত, কখনও বৈষ্ণব; এবং কখনও মুসলমান সূফী। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তন্ত্রও এই ঝঙ্কারের অন্যতম।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙ্গালী-সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার

মূল সুর বাঁধা হইল। তারপর তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের ঝড় বহিয়া গেল। মনে হইল, বুঝি সে ঝড়ের মুখে বঙ্গ-বীণার বাঁধা তার ছিঁড়িয়া যাইবে,—প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী জাতীয়তার সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তখন বাঙ্গালীর মধ্যে প্রান্তিক বা প্রাদেশিক জাতীয়তার বোধ হয় নাই—তখনকার দিনের বাঙ্গালীর সাহিত্যিক গৌরব ছিল না, বাঙ্গালী নিজেকে এক অখণ্ড ভারতেরই প্রত্যন্ত- বা প্রদেশ-বাসী বলিয়া মনে করিত। যে ঝড় কাবুল হইতে বিহার পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্থানে বহিয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালী তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। তাহাকে বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। কিন্তু এই বৈতসী বৃত্তির মধ্যেই তার জীবনী শক্তি অটুট রহিল। মুষ্টিমেয় তুর্কী বিজেতা ও তাহাদের পারসিক, পাঠান ও পাঞ্জাবী-মুসলমান অনুচর যাহারা বাঙ্গালায় রহিয়া গেল, তাহারা বাঙ্গালার হিন্দুর সাহায্যেই বাঙ্গালায় দিল্লী হইতে স্বাধীন এক মুসলমান-শাসিত রাজ্য স্থাপন করিল। তুর্কী ও অন্য বিদেশী বিজেতৃগণ দুই-চারি পুরুষের মধ্যেই বাঙ্গালী বনিয়া গেল। তখনও উর্দু ভাষার উদ্ভব হয় নাই। উত্তর-ভারতের সঙ্গে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালার যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সে যোগ তুর্কী-বিজয়ের পরে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী মুসলমানদের বাঙ্গালী স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত; তাহাদের সন্তানেরা ভাষায় বাঙ্গালীই হইত।

প্রথম সজ্ঘাতের পরে বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী-মিশ্র মুসলমান এবং দেশের হিন্দু বাঙ্গালী জন-সাধারণের মধ্যে একটী সংস্কৃতি-বিষয়ক সহযোগিতা আরম্ভ হইল। মুসলমান সুফী, দরবেশ, ফকীর ও গাজী ধর্ম-প্রচারের জন্য উত্তর-ভারত হইতে এবং ক্বচিৎ ভারতের বাহির হইতেও বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্মোন্মত্ততার ফলে হিন্দুদের অনেককে বল-পূর্বক মুসলমান করিয়া দেওয়া যে হয় নাই, তাহা নহে; তবে পীর, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালা দেশে যে মতের মোহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটী শরিয়তী অর্থাৎ কোরান-অনুসারী ইসলাম নহে। শরিয়তী মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে; বাঙ্গালা দেশে ইসলামের সুফী মতই বেশী প্রসার লাভ করে। সুফী মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোনও বিরোধ হয় নাই। সুফী মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালায় প্রচলিত যোগ-মার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া

লইতে সমর্থ হইয়াছিল ; মধ্য-যুগে তুর্কী-বিজয়ের পর হইতে, যে ইসলাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ-গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ইস্‌লাম ধর্ম বাস্তবিকই "মজ্‌মু'অ অল্‌-বহ্‌রৈন্‌" অর্থাৎ 'দুইটী সাগরের সম্মিলন' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ডক্টর শ্রীযুক্ত মোহম্মদ এনামুল্‌ হক্‌ বঙ্গদেশে ইস্‌লাম-প্রচার বিষয়ে যে মূল্যবান্‌ গবেষণা করিয়াছেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমরা বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির একটা প্রধান দিকের ইতিহাসের উপর লক্ষণীয় আলোক-পাত দেখিতে পাইব।

তুর্কী-বিজয়ের পরে যেমন এক দিকে মুসলমান-ধর্ম-প্রচার চলিতে লাগিল, তেমনি অন্য দিকে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ-নেতৃগণ ঘর সামলাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। দেশে যখন ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ মতাবলম্বী হিন্দু রাজা ছিলেন, ভারতের বাহিরের দেশের প্রতি অথবা ধর্ম-গুরুর প্রতি তাকাইয়া থাকে এমন বিদেশীয় ধর্ম যখন দেশে ছিল না, তখন দেশের জন-সাধারণের প্রতি শিক্ষিত বা অভিজাত সমাজের দৃষ্টি ততটা আকর্ষিত হয় নাই। অশিক্ষিত জন-সাধারণ চিরাচরিত রীতি অনুসারে গ্রাম্য ধর্ম পালন করিত, উচ্চ বর্ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা পূজা যজ্ঞ অনুষ্ঠানাদিতে যোগ-দান করিত ; তাহাদের মধ্যে ধর্ম-পিপাসা জাগাইবার এবং মিটাইবার জন্য যোগী, সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু ছিল ; তাহারা নিজেরাও নানা পর্ব-দিবস পালন করিত, সমাজের মন্থর গতির সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়া তাহারাও মোটামুটি ভাবে ধর্ম সম্বন্ধে একটী ধারণা করিত। কিন্তু মুসলমান প্রচারক আসিলেন ; তাঁহার পিছনে ছিল মুসলমান রাজার প্রচণ্ড শক্তি ; মুসলমানের ধর্ম সহজ-বোধ্য-তাহাতে হিন্দু অর্থাৎ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সূক্ষ্ম intellectualism বা আধিমানসিকতা নাই বলিয়াই, তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে আপাতগ্রহণীয় ছিল। অবস্থা দেখিয়া উচ্চ-বর্ণের হিন্দুও সজাগ হইলেন। তখন বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের যুগ, বৌদ্ধ ধর্ম তখন তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মতের পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জমান। তুর্কীদের আগমন ও মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, এবং ভারতে (বিশেষ করিয়া বঙ্গে) বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ-লাভ—এই দুইটী কাকতালীয় ন্যায়ে হইয়াছিল। জীবনী শক্তিতে হীন বৌদ্ধ ধর্ম, নব শক্তিতে জাগ্রৎ পুরাণ- ও তন্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিকট পরাভূত হইতেছিল ; ব্রাহ্মণ ও তাঁহার অনুগামীর দল নব উৎসাহে তখন বেদ উপনিষদ্‌ পুরাণ ও তন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট নব হিন্দু ধর্মকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। সমাজে তখন ব্রাহ্মণই প্রধানতম চিন্তানেতা ; বৈদ্য এবং কায়স্থও এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। বাঙ্গালার ক্ষাত্র শক্তি তখন কায়স্থ এবং অন্য কতকগুলি

জাতির মধ্যে সজীব অবস্থায় বিদ্যমান; এবং বৈদ্য এখনকার মত তখনও বিদ্যাবৃত্ত। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসর্বস্ব, এবং বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির বলে রাজসেবা কার্য্যেও নিযুক্ত। দেশের মধ্যে বাঙ্গালা প্রভৃতি লোক-ভাষা তখন সাহিত্যের উপযোগী হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা বুঝিয়া, উচ্চ-বর্ণের হিন্দু, সাধারণের জন্য শাস্ত্রকে উন্মুক্ত করিয়া দিতে সচেষ্ট হইলেন। তুর্কী-বিজয়ের পরে, কেরামত জাহির করেন এমন পীর ও আউলিয়াদের দ্বারা মুসলমান ধর্মের প্রচারের ফলে, উত্তর-ভারতের সর্বত্র লোক-ভাষায় হিন্দুর ধর্ম-গ্রন্থ প্রচারের একটা সাড়া পড়িয়া গেল। হিন্দী-মারাঠী বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে নিবদ্ধ আমাদের সাহিত্যের মুখ্য প্রেরণা এই খানেই—রাজশক্তিতে শক্তি-শালী, সহজ-বোধ্যতায় প্রবল মুসলমান ধর্মের সমক্ষে, জন-সাধারণের নিকটে হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম-শাস্ত্র ও ইতিহাস, তৎসঙ্গে গভীর অধ্যাত্ম-চর্চার অনুভূতি, এবং প্রাচীন উপাখ্যানাবলীর অন্তর্নিহিত রোমান্স ও উচ্চ আদর্শাবলী—এগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া দিবার ইচ্ছাতেই;—কৌতূহলী বিদেশী মুসলমান রাজাদের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য মধ্য-যুগের ভারতের ভাষা-সাহিত্যের সৃষ্টি বা আরম্ভ হয় নাই।

তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের প্রথম যুগের পরে বাঙ্গালী যখন আত্মরক্ষায় তৎপর হইল, তখন কেবল সাহিত্য-রচনাতেই তাহার দৃষ্টি বা চেষ্টা নিবদ্ধ রহিল না। বাহিরের ধর্ম ও রাজশক্তির হাত হইতে দেশকে আবার স্বাধীন করিয়া দেখিবার স্বপ্নও তাহাকে বিচলিত করিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে "চণ্ডীচরণ-পরায়ণ" মহারাজ শ্রীদনুজমর্দন দেব দেখা দিলেন। ইনি সমগ্র বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু রাজা হন, এবং যে কার্য্য সারা উত্তর-ভারতের কোন হিন্দু রাজা তুর্কীবিজয়ের পরে করিতে সাহসী হন নাই, সেই কার্য্য ইনিই করিয়াছিলেন—নিজ নামে দেশ-ভাষায় মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। দনুজমর্দন দেবকে অনেকে মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত রাজা "কান্‌স্‌" ('কাঁশ' বা কংশ)-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। এই রাজা কংশই বাঙ্গালা রামায়ণের রচয়িতা ব্রাহ্মণ কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এইরূপ অনুমান হয়। সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু রাজা দনুজমর্দন দেব কংশ, হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ ভাষায় প্রচারে উদ্যোগী; কর্ম-চেষ্টা ও জাতীয় সাহিত্যের প্রসার, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে নিঃসন্দেহে দুই-ই সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছিল।

এই রূপে ভাষায় প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের ফলে বাঙ্গালা দেশে যাহা ঘটিল, তাহা বাঙ্গালী জাতির উত্তর-কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরিস্ফুট। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংস্কৃতে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ, সারদাতিলক তন্ত্র

প্রভৃতি পড়িতেন—চৈতন্যদেবের পূর্বেকার কালে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা এই-সব সংস্কৃত পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্য প্রতিষ্ঠানের পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়া আছে। এই প্রকারের ইতিহাস ও পুরাণ-গ্রন্থ ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। জন-সাধারণে ইহার স্বাদ পাইল। কথকতা—ভারত-পুরাণ পাঠ—সংস্কৃতি-প্রচার বিষয়ে দেশের এক প্রাচীন পদ্ধতি ছিল। বাঙ্গালা দেশের স্থানীয় পুরাণ-কথা, যেগুলি সংস্কৃতে লিপি-বদ্ধ হয় নাই বলিয়া ভারতের অন্যত্র সম্পূর্ণ-ভাবে গৃহীত হইতে পারে নাই, সেগুলিও নবীন "মঙ্গল-কাব্য" আকারে বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সব স্থানীয় পুরাণ মধ্যে, বৌদ্ধ পুরাণও বাদ পড়িল না। এই ভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত শিবায়ণ ও অন্য পুরাণের আখ্যায়িকার পাশে, লখিন্দর-বেহুলা কালকেতু-ফুল্লরা ধনপতি-খুল্লনার কথা এবং লাউসেন ও গোপীচাঁদের কথাও বহুল ভাবে পুনঃ-প্রচারিত হইল। প্রাচীন কথা ও লোক-গাথা মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে সাহিত্যিক রূপ পাইল। সমাজের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংরক্ষক ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার নূতন করিয়া জ্ঞান-বল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হইল। স্বদেশে সংস্কৃত বিদ্যা মৃতপ্রায়; সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা হয় নালন্দার বিহারের মত অন্যান্য বিহারের ধ্বংসের কালে তুর্কীর ভল্ল ও তরবারীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন, না-হয় পুঁথি-পত্র লইয়া তাঁহারা নেপালে পলাইয়া গিয়া প্রাণ ও বিদ্যা উভয়েরই রক্ষা করিয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গে তুর্কীর আগমনে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পলায়ন করিয়া পূর্ব-বঙ্গের নদী খাল বিলের দ্বারা সুরক্ষিত জনপদে আত্মরক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের বিদ্যা দেশের কেন্দ্র-স্থলে না থাকায় আর কার্য্যকর হইতেছে না। তখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবটু বিদেশ হইতে সংস্কৃত জ্ঞানকে আবাহন করিয়া আনিবার জন্য বাহির হইলেন। মিথিলা সে যুগে কেমন করিয়া তুর্কীর অধীন হয় নাই। হিন্দু রাজা ছিল বলিয়া, তুর্কী-বিজয়ের পরে ধ্বংসের শতকেও মিথিলার সংস্কৃত বিদ্যার কেন্দ্রস্থলগুলি জীবিত ছিল—বাঙ্গালীর ছেলেরা সেখানে বিশেষ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতি পড়িতেই যাইত। এই প্রসঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি ও পক্ষধর মিশ্রের কথা আমরা সকলেই জানি। মিথিলায় যে সব ছেলে পড়িতে যাইত, তাহারা কেবল যে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িত তাহা নহে। মিথিলার দেশভাষা মৈথিলে ঐ প্রদেশের পণ্ডিতেরা সুন্দর সুন্দর গান বাঁধিতেন। কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর (ইঁহার জীবৎকাল আনুমানিক ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ) মৈথিল কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যাপতির-রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ বাঙ্গালী ছাত্রদের দ্বারায় বাঙ্গালা দেশে আনীত হয়, এবং সেই সকল পদের অপূর্ব কবিত্বে বাঙ্গালীদের

মধ্যে অনেকে মোহিত হইয়া যান—বাঙ্গালা দেশে সেগুলির বহুল প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের অনুকরণও আরম্ভ হয়। বিদ্যাপতির পদের মৈথিল ভাষা বাঙ্গালীর মুখে অবিকৃত থাকিতে পারিল না; এবং বাঙ্গালীর হাতে বিদ্যাপতির পদের ভাষা বিকৃত হইল, আবার বাঙ্গালা ও মৈথিল এই দুই ভাষা মিলিয়া, মৈথিলের নকলে এক অতি মধুর কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষার সৃষ্টি করিল, এই ভাষার নাম হইল "ব্রজবুলি"। বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যের অনেকখানি অংশ এই ব্রজবুলিকে লইয়া।

এই ভাবে বাঙ্গালার পণ্ডিতের হাতে দুই দিকে কাজ চলিল; বাঙ্গালার সংস্কৃতির দুইটী দিক্-ই ইঁহারা পুষ্ট করিতে লাগিলেন—সংস্কৃত বিদ্যা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালার মস্তিষ্ক খেলিতে লাগিল; এবং বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা, যাহাতে বাঙ্গালার হৃদয়ের প্রকাশ হইল। এই দুই দিকেই, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবই ছিল মূল প্রেরণা। বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনে যে ডাক ও খনার বচন ছিল, তাহা প্রাচীন মুসলমান-পূর্ব যুগের সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র। তুর্কী-বিজয়ের দেড়-শত দুই-শত বৎসরের মধ্যে যখন সমস্ত উত্তর-ভারতময় মুসলমান ভাব-জগতের প্রতাপ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের জীবনে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন সহজ-বোধ্য ভক্তি-মার্গ পুনরায় প্রকটিত হইল, "নাম-ধর্ম" প্রসার-লাভ করিল। নাম-ধর্মের নানা সাধক দেখা দিলেন; রামানন্দ কবীর প্রমুখ উত্তর-ভারতের সন্তমার্গী সাধুগণ; বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্যদেব; এবং পাঞ্জাবে গুরু নানক ও তৎশিষ্য ও অনুশিষ্য শিখ গুরুগণ।

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অনেকটা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবকেই আশ্রয় করিয়া পুষ্টি-লাভ করে।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনী বাঙ্গালী-সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নূতন ধারা সৃষ্ট বা প্রবর্তিত করিয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যার মর্য্যাদা তাঁহার হাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই; বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ, এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের গুরু-পরম্পরা, সংস্কৃত ভাষায় যে দার্শনিক বিচার প্রকট করিলেন, যে রস-শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, যে সকল মূল গ্রন্থ, টীকা ও কাব্যাদি রচনা করিলেন, তাহা বিদ্যা ও বুদ্ধির দিক হইতে বাঙ্গালী-সংস্কৃতির অপূর্ব সৃষ্টি; বাঙ্গালীর বুদ্ধির প্রকাশ যেমন নব্যন্যায়ের ও স্মৃতি-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের এবং শ্রীকুল্লুকভট্ট, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, আগমবাগীশ শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রমুখ টীকাকার ও সংকলয়িতাদের মেধায় দেখা যায়, তেমনি ইহা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্য্যদের পাণ্ডিত্যেও দেখা যায়। আবার বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙ্গালীর হৃদয়ের,

তাহার রসানুভূতির যে পরিচয় পাই, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবেরই অনুপ্রেরণার ফল। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালার জন-সঙ্গীত কীর্তনগানে যে লক্ষণীয় এবং অতি বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিল, বাঙ্গালার নিজস্ব সঙ্গীতের প্রাণ-স্বরূপ সেই কীর্তনগানও সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদ। ঘরমুখো বাঙ্গালী ঘর ছাড়িয়া নূতন উদ্যমে পুরী গয়া কাশী বৃন্দাবনে গেল, জয়পুরে গেল, এবং আরও পশ্চিমে গেল;—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এক সত্যকার গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিল। এখানেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের প্রভাব দেখি।

বাঙ্গালার সংস্কৃতি মুখ্যতঃ গ্রাম্য জীবনকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টি-লাভ করিয়াছিল। এদিকে বাঙ্গালা-দেশ বোধ হয় আদিম অস্ট্রিক জাতি হইতে প্রাপ্ত রিকৃথকেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয়কেই আশ্রয় করিয়া সভ্যতার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। গ্রামের বড় দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যতা, কর্মপ্রাণ সভ্যতা। ইউরোপের সভ্যতা অর্থে Civilisation—যাহা civis বা নগরকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, "নাগরিকতার ভাব"; ইউরোপের polis বা নগর হইতে Politics-এর উৎপত্তি। আরবদের মধ্যেও "মদীনা" বা নগরের জীবন-যাত্রাই "তমদ্দ্দুন" বা সভ্যতা। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কখনও নগরের প্রাধান্য ছিল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিল্প-সম্ভারপূর্ণ, বিরাট্ মন্দির ও অন্য গৃহে শোভিত, বড় বড় নগর প্রাচীন কাল হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল দেখা যায়; যেমন, প্রাগৈতিহাসিক মোহন-জো-দড়ো, হড়প্পা; প্রাচীনকালের অহিচ্ছত্র, মথুরা, কাশী, পাটলিপুত্র, তক্ষশীলা, সাকেত, গোনর্দ, উজ্জয়িনী, প্রতিষ্ঠান, ধান্যকটক (অমরাবতী), মহাবলিপুর, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি, যে-সব নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাই; মধ্য যুগের দিল্লী, আগরা, লাহোর, মদুরা, পুনা, মাণ্ডু প্রভৃতি। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে নগরাদির ধ্বংসাবশেষ যে-রূপ পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশে সে-রূপ ততটা পাওয়া যায় নাই; কাশী, মদুরা, পুনা, উজ্জয়িনী, লাহোর প্রভৃতির সহিত এক সঙ্গে নাম করা যায় এমন নগর বাঙ্গালা দেশে বেশী গড়িয়া উঠে নাই—বাঙ্গালা দেশের নাগরিক জীবন মুখ্যতঃ গ্রামের জীবনেরই একটী বিস্তৃত সংস্করণ ছিল। বাঙ্গালার নগরের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি দুই-একটীর নাম মাত্র করা যায়। বাঙ্গালাদেশ ভারতের জীবনের স্রোতের এক পাশে, একটু যেন বিচ্ছিন্ন ভাবেই বরাবর ছিল। শিল্প-নগরী রূপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পশ্চিম-বঙ্গে বিষ্ণুপুর বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই সময়ের বিষ্ণুপুরের হঠাৎ বড় হইয়া উঠার

দুইটি কারণ ছিল—[১] উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব উপকূলের সহিত উত্তর-ভারতের যোগ-বিধায়ক পথের উপরেই বিষ্ণুপুর অবস্থিত ছিল; সেইজন্য উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে তীর্থ-যাত্রা ও অন্য উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা যাতায়াত করিত, তাহাদের মারফত বাহিরের জগতের সহিত বিষ্ণুপুরের সংযোগ সহজ হইয়াছিল; [২] বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালাদেশের ও হৃদয়-স্থানীয় নবদ্বীপ অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং সমগ্র সপ্তদশ শতক ধরিয়া, কতকগুলি বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কর্মী বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালার বাহিরেও একটী বিরাট কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ যেমন একদিকে ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা, অন্য দিকে ছিল—বাঙ্গালাদেশের স্বাধীন মুসলমান নরপতির হাত হইতে মুক্ত হইয়া, দেশ মোগল সম্রাটের অধীন হওয়া। স্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের এক কোণে পড়িয়া ছিল, এবং রুদ্ধবারি জলাশয়ের মত অবস্থায় ছিল; বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার তেমন কোন যোগ ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বাংলার পক্ষে আংশিক ভাবে সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া সম্ভবপর হইল। দিল্লী-আগরার কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালার হিতকর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালীর প্রতিভা বাঙ্গালার বাহিরে আদর পাইল—বাঙ্গালার বিদ্যাধর পণ্ডিত জয়পুর নগর স্থাপন কালে সাহায্য করিলেন (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ), বাঙ্গালার পণ্ডিত ও গোস্বামীরা উত্তর-ভারতের ধর্ম-জীবনে অংশ-গ্রহণ করিলেন, বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করাচার্য্যের মতকে উত্তর-ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, দিল্লী-আগরা জয়পুর-চিতোর হইতে পারস্য ও তুরস্ক পর্যন্ত সর্বত্র রাজদরবারে বাঙ্গালার ঢাকাই মলমলের চাহিদা বাড়িয়া গেল, বাঙ্গালার বাঁশে তৈয়ারী কুঁড়ে' ঘরের বাঁকা ধাঁচা, 'রেওটী' নামে রাজপুত-মোগল বাস্তু-শিল্পের মধ্যে স্থান পাইল। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, হিন্দু-যুগের অবসানের পরে, বাঙ্গালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডী প্রথম কাটাইয়া, নিখিল ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড় সুযোগ পাইল। সপ্তদশ শতকে উত্তর-ভারতের লোক-ভাষা ('হিন্দী') হইতে বাঙ্গালাতে দুইখানি বই অনূদিত হইল—নাভাজী দাসের 'ভক্তমাল', এবং মালিক মোহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত'।

দিল্লী-আগরা এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে যে যোগ নূতন করিয়া মোগল-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল, সে যোগ আর বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে এই যোগকে একটা বড় স্থান দিতে হয়।

যদিও বাঙ্গালী জাতির অর্ধেকের উপর এখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহা লক্ষণীয় যে অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সংস্কৃতি (অর্থাৎ আরবী, ফারসী ও উত্তর-ভারতীয় মুসলমান মনোভাব বা বাস্তব সভ্যতা, রীতি-নীতি এবং চিন্তা-প্রণালী) বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনেও তেমন কার্যকর হয় নাই। সুফী মতের ইস্‌লামের সহিত বাঙ্গালী (অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দু) মনোভাবের একটা আপস হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান (কতকগুলি বিশেষ প্রান্তে, বিশেষ কতকগুলি গোষ্ঠী বা পরিবার ব্যতীত), বিশিষ্ট মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। যে-দুই-চারি জন বড় বড় আলেম, মোল্লা ও মৌলবী বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে হইতেন, তাঁহারা নিজেদের আরবী-ফারসী কেতাবের মধ্যেই নিমগ্ন থাকিতেন, বাঙ্গালা ভাষার চর্চা তাঁহারা বড় একটা করিতেন না: ফলে, আরবী-ফারসী জগতের খবর বাঙ্গালীর কাছে বেশী করিয়া পঁহুছায় নাই। কিছু কিছু আরবী প্রার্থনা, মুসলমানী স্মৃতি-শাস্ত্রের কথা, এবং মুসলমানী ইতিহাস-পুরাণ কেচ্ছা-কাহিনী বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছিল, এইটুকু মাত্র। উত্তর-ভারতের এবং ভারতের বাহিরের দেশের মুসলমান সংস্কৃতির সহিত এবং কোরান-অনুমোদিত ইস্‌লামের সহিত বাঙ্গালী মুসলমান অতি আধুনিক কালে—বিগত মাত্র ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে—একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নানা কারণে তাহার জীবনে সে পরিচয় কার্যকর হইতেছে না।

বাঙ্গালী মুসলমান এখনও মনে-প্রাণে খাঁটী বাঙ্গালী থাকায়, নব-আলোচিত বঙ্গ-বহির্ভূত মুসলমানী সংস্কৃতি তাহার প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিতেছে না। এই আলোচনা মুষ্টিমেয় ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ, এবং ইঁহাদের জ্ঞান মুখ্যতঃ মুসলমান-সভ্যতা-বিষয়ক ইংরেজী পুস্তক হইতেই সংগৃহীত। বাঙ্গালী মুসলমান এখন বিষম দো-টানায় পড়িয়াছে। সজ্ঞান ভাবে একটী জাতির মনের মোড় ফিরানো কঠিন ব্যাপার—অজ্ঞাত-সারেই এই কার্য্য হইয়া থাকে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদের কেহ-কেহ এখন একটী "বাঙ্গালী মুসলমান সংস্কৃতি" গঠনের প্রয়াস করিতেছেন। সহজ বাঙ্গালীত্বের দাবীতে—বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়া বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি যে তাহারই, এই সহজ বোধে—বাঙ্গালী মুসলমান সমগ্র ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার কিন্তু এখন তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না—কারণ ইহার সঙ্গে কোরানের বা আরব জগতের কোনও যোগ নাই। তাহার মনে অশ্বস্তির ভাব আসিয়াছে। যতই কেন "মুসলমান ইতিহাস", "মুসলমান সভ্যতা" বলিয়া বাঙ্গালী

মুসলমান নিজের উৎসাহাগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করুন না, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আরবেরা সিরিয়া, পারস্য ও মিসরে যে বীরত্ব দেখাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, সেই বীরত্বের কাহিনীতে, ইংরেজীতে যাহাকে বলে legitimate pride—ন্যায়সঙ্গত গর্ব—তাহা তাঁহার মনের অন্তস্তল হইতে অনুভব করা কঠিন। বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে, সপ্তম শতকের আরব শৌর্য, বা দশম শতকের বগ্‌দাদের আরব, পারস্য ও সিরীয় পাণ্ডিত্য ও মানসিক উৎকর্ষ, বা ত্রয়োদশ শতকের স্পেনের স্পেনীয়, আরব ও মঘরেবী নাগরিকতা ও সভ্যতা, অথবা পঞ্চদশ শতকের তুর্কী বীরত্ব,—কেবল সমধর্মিত্বের দোহাই পাড়িয়া এগুলি লইয়া গর্ব করিতে রসবোধ-যুক্ত যে কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের মনে বাধো-বাধো লাগিবে, তাঁহার হাসি পাইবে; আমার "মুসলমানজাতি" কত বড়, এই গর্ব করিয়া ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে উর্দু কবি ইক্‌বালের উক্তি—

> অয়্ গুল্‌সিতান্-এ-উন্দুলুস্, বহ্ দিন হৈ য়াদ তুঝ কো,
> থা তেরী ডালীওঁ-মেঁ জব্ আশিয়াঁ হমারা॥
> মঘ্‌রিব কী বাদীওঁ-মেঁ গুন্‌জী আজাঁ হমারী॥

—হে আন্দালুসিয়ার পুষ্পোদ্যান, সে দিন তোমার স্মরণে আছে কি, যে দিন তোমার শাখায়-শাখায় আমাদের নীড় অবস্থিতি করিত (অর্থাৎ আমাদের জাতি এক সময়ে স্পেন দখল করিয়াছিল); মঘ্‌রেব্ (মরক্কোর) মরুভূমির নদীর তীরে আমাদেরই আজান-ধ্বনি গুঞ্জিত হইয়াছিল (অর্থাৎ আমরা মুসলমানেরাই মরক্কো জয় করিয়াছিলাম)—

ইত্যাদি গৌরব-গাথা তাঁহার কাছে নিজ ভারতীয়ত্বের বা বাঙ্গালীত্বের দৈন্যকে যেন উপহাস করিবে! কোনও বাঙ্গালী রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান যদি গর্ব করে—"আমরা রোমান-কাথলিক জাতীয় লোক, আমরা কত বড়! আমাদের জাতি স্পেন হইতে আমেরিকায় গিয়া আমেরিকা দখল করিয়াছিল—মেক্সিকো ও পেরুর মত দুই-দুইটা সুসভ্য জাতির রাজ্য হেলায় জয় করিয়া সেখানে আমাদের ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়াছিল; আমাদের রোমান-কাথলিক জাতি পর্তুগাল হইতে বাহির হইয়া ব্রেজিল দখল করিয়াছিল, ভারতের সমুদ্রপথে দোর্দাণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিত; আমাদের জাতিই ফ্রান্সে, ইটালীতে, স্পেনে, জর্মানীতে কত বড়-বড় গির্জা নির্মাণ করিয়াছে, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যায় কত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, কত দর্শন-শাস্ত্রের বই লিখিয়াছে, কত জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছে,"—তাহা হইলে ইহা যেমন শুনায়, বাঙ্গালাভাষী, জাত্-বাঙ্গালী ঘরের ছেলে, কেবল ধর্মে মুসলমান

বলিয়া, ইরানী, তুর্কী, আরব, শামী, মিসরী, মগরেবী ও হিস্পানীদের কীর্তি-কলাপ লইয়া গৌরব-বোধের সঙ্গে যদি মাতামতি করে, তবে তাহা তেমনই যুগপৎ হাস্যকর এবং করুণার উদ্রেককর ব্যাপার বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি-মাত্রেরই মনে লাগিবে।

ফরমাইশ দিয়া ইচ্ছামত "জাতীয় সংস্কৃতি" তৈয়ারী করা চলে না। বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে যেটুকু মুসলমান প্রভাব বিদ্যমান, ধীরে-ধীরে এই পাঁচ ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া, ইসলামগত-প্রাণ পূর্ণবিশ্বাসী আলেম, মোল্লা ও মৌলবীদের চেষ্টাতেই হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের কেহ-কেহ যে ভাবে বাঙ্গালায় "ইস্‌লামী সংস্কৃতি" আনিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার মধ্যে Positive অর্থাৎ সংগঠনকারী দিক্ অপেক্ষা Negative অর্থাৎ ধ্বংসকারী দিক্‌টাই প্রবল। ইহাদের কাছে ইস্‌লামীয় মনোভাব মানে, মুখ্যতঃ যাহা ভারতীয়ত্বের বা হিন্দুত্বের বিরোধী; কারণ ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব ইহাদের চোখে "কুফ্‌র্" বা বিধর্মিত্ব এবং "শির্‌ক্" বা বহু-দেব-বাদিত্বেরই নামান্তর। হিন্দু বা ভারতীয় মাটিতে জন্ম—এই কথাতেই যেন কুফ্‌র্ ও শির্‌ক্-এর আমেজ লাগিয়া আছে; তাই বহু ভারতীয় বা বাঙ্গালী মুসলমান নিজেকে সৈয়দ বা আরব, অথবা ইরানী, পাঠান, মোগল বা তুর্কী বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। বাঙ্গালী বা ভারতীয় মুসলমানদের এই আত্মমর্য্যাদাবোধ-হীনতা তাহাদের পক্ষে—এবং আমাদের পক্ষেও বটে—এক হৃদয়-বিদারক, সর্বনাশকর ট্রাজেডি। পারস্যের মুসলমানেরা কখনও এইভাবে আত্মমর্য্যাদা হারায় নাই; ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে পারসীকেরা নিজ জাতির আভিজাত্য, তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য ভুলিতে চাহে নাই—বরং তাহাদের "শাহ্‌নামা" গ্রন্থে, মুসলমান-পূর্ব যুগের পুরাণ-কথাকে তাহারা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তুর্কী মুসলমানেরা তিন চার শতকের বিস্মৃতির পরে, আবার নূতন করিয়া তাহাদের জাতির গৌরব-কথা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে—তুর্কীরা এখন আরব ও ইরানী প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে মুসলমান উপাদান যেটুকু আসিয়াছে, এ তাবৎ তাহা বাঙ্গালীর জীবন ও বাঙ্গালীর প্রকৃতির সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য রাখিয়াই আসিয়াছে। এখন কোনও-কোনও দিক্ হইতে যে নবীন প্রয়াস হইতেছে, তদ্দ্বারা ভাঙ্গন ঘটিবে—কিন্তু তাহার দ্বারা বড় একটা কিছু গড়িয়া উঠিবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালী মুসলমানের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন মুসলমান জাতির মনের ও সভ্যতার প্রকৃতি—এগুলিকে ভাল করিয়া না বুঝিয়া, বাঙ্গালী মুসলমানের

মনকে চালিত করিবার চেষ্টা করিলে, একটা বিদ্ভুত-কিমাকার বস্তুই সৃষ্ট হইবে, সত্যকার জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হইবে না।

বাঙ্গালা দেশে যে সংস্কৃতি গত এক হাজার বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, যে যে বস্তু বা অনুষ্ঠান অথবা মনোভাবকে অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নীচে তাহার একটা দিগ্‌দর্শন বা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইতেছে।—

[১] বাঙ্গালার বাস্তব সভ্যতা—

বাঙ্গালায় খড়ের চালের কুটীর ; পূর্ববঙ্গের বেতের ও বাঁশের কাজ (লুপ্তপ্রায়) ; প্রাচীন কালের কাঠের কাজ—ঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুঁটী, চালের বাতা প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই করা (এই কাষ্ঠ-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু যুগের কাঠের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্যের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে) ; ইটের মন্দির ; পোড়া-মাটির ভাস্কর্য্য—ইটের উপরে নানারকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে-খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র-স্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)—ইটে-খোদাই ও মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত।

চিত্রবিদ্যা—পুঁথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় লুপ্ত), এবং অন্য প্রকারের খাঁটি বাঙ্গালী চিত্রপদ্ধতি, যথা—পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, কালীঘাটের পট, পূর্ব-বঙ্গের গাজীর পট, শরায় ছবি আঁকা—ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্ত ; মাটীর ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চাল-চিত্র আঁকা, মাটীর সঙের পুতুলে পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র—ইহাই আমাদের বার্ষিক পূজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে ; রঙ্গীন মাটীর পুতুল, কাঠের পুতুল,—গ্রাম-শিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প—জাপানী সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

দাঁইহাট-কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূর্তি-শিল্প ও অন্য ভাস্কর্য্য, মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাতীর দাঁতের কারুশিল্প—মূর্তি, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি (বাঙ্গালার হাতীর দাঁতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর পর্যন্ত পঁহুছিয়াছে) ; বিষ্ণুপুর

ও ঢাকার শাঁখের কাজ—শাঁখে খোদাই, আধুনিক মিহি কাজের শাঁখের সরু চুড়ি ইত্যাদি। সারা বাঙ্গালায় সোলার কাজ—খেলনা, ঠাকুরের সাজ; ডাকের সাজ।

এতদ্ভিন্ন, ঢাকার filgree work বা রূপার তারের কাজ; কলিকাতায় রূপার repousse work বা নকশাতোলা কাজ; কলিকাতার স্বর্ণকারদের অলঙ্কার-শিল্প, এবং বিলাতী ধরণের মীনার কাজ—এগুলিরও প্রভাব বাঙ্গালার বাহিরেও গিয়াছে।

বাঙ্গালার পিতল-কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদ-খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল কাঁসা ও ভরণের বাসন, দাঁইহাট-কাটোয়ার, বনপাস-বর্ধমানের এবং ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গের নানা স্থানের পিতলের বাসন; কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্বীপের মূর্তি-ঢালাই; শাসপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের ইস্পাতের কাজ।

বাঙ্গালার খাদ্য-দ্রব্য—বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট শাক শুক্তানি ঘণ্ট নিরামিষ ব্যঞ্জন ও তরকারী; (বাঙ্গালার বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গের) মৎস্য ও মাংস পাকের বিশেষ রীতি; বাঙ্গালার কাসুন্দী, ছড়া-তেঁতুল, আচার; খেজুরে' গুড়, পাটালী; মুড়ি, মুড়কী, চালের গুঁড়া, নারিকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারী নানা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন; বীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদানা ইত্যাদি; ছানার তৈয়ারী বাঙ্গালার নিজস্ব মিষ্টান্ন, নানা প্রকারের সন্দেশ, পানিতোয়া, রসগোল্লা।

বাঙ্গালার পরিধেয়—মিহি মল্‌মল, ঢাকার জামদানী (ফুলতোলা কাপড়), টাঙ্গাইল শান্তিপুর চন্দ্রকোণা ফরাসডাঙ্গা (চন্দ্রননগর) প্রভৃতি স্থানের ধুতি ও সাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতী সাড়ী, মুর্শিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর; বীরভূম বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রেশম; রাজশাহীর মট্‌কা; বীরভূম তাঁতিপাড়ার ও কড়িধার তসর; বিষ্ণুপুরের রেশম—কেটে', চেলি, নকশা-দার ও বুটিদার সাড়ী; অধুনা-বিলুপ্ত মুর্শিদাবাদের বালু-চরের সাড়ী; হিমালয়-প্রান্তের মোটা পশমী কম্বল; অধুনা-প্রচলিত বাঙ্গালার ছাপা রেশমের সাড়ী।

মেদিনীপুরের সূক্ষ্ম মাদুর, কুমিল্লা নোয়াখালী ও শ্রীহট্টের শীতলপাটী।

বাঙ্গালার নিজস্ব কৃষি-শিল্প—নানা প্রকারের ধান; পান; পাট; বাঙ্গালার মাছের চাষ।

বাঙ্গালার নৌশিল্প—বিভিন্ন প্রকারের নৌকা (এই নৌশিল্প এখন প্রায় অবলুপ্ত); বীরভূমের বুহিত্তাল, এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক

উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

[২] বাঙ্গালার অনুষ্ঠান-মূলক সংস্কৃতি—

বাঙ্গালার সামাজিক বিধি ও ধর্ম-সাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, বাঙ্গালার হিন্দুর সম্পত্তি-উত্তরাধিকার রীতি—দায়ভাগ; বাঙ্গালার সামাজিকতা—বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের রীতি, এবং জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও মিত্র সম্মিলনের বিশেষ রীতি; বাঙ্গালার পূজা—দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, রাস, সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, প্রভৃতি বিশেষত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ, এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর জীবনে দুর্গাপূজা; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বালিকা-ব্রত; পারিবারিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উৎসব—আটকৌড়িয়া, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাই-ষষ্ঠী, পৌষ-পার্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, নূতন-খাতা প্রভৃতি।

মেয়েদের আলিপনা-আঁকা, কাঁথা-সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্প।

বাঙ্গালার লাঠিখেলা ও ক্রীড়া-কসরৎ; রায়বেঁশে' নাচ ; পূজার সময়ে ঢাকী-ঢুলীদের নাচ; পূর্ব-বঙ্গের আরতি-নৃত্য; মেয়েদের ব্রত-নৃত্য; অন্য নানা প্রকারের নৃত্য।

বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব, মহরমের ও শাহ্ মাদারের অনুষ্ঠান; নানাবিধ নৃত্য ও কসরৎ।

[৩] বাঙ্গালার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি—

টোল-চতুষ্পাঠী; বাঙ্গলার সংস্কৃত বিদ্যা—জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার সংস্কৃত কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীর্তি; বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কোটালিপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সংস্কৃত পণ্ডিতদের পরম্পরা; নৈয়ায়িক ও স্মার্তগণ; আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্য্যগণ; মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ বৈদান্তিকগণ; বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক পদ; বৌদ্ধ চর্য্যাপদ; বড়ু চণ্ডীদাস; শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব; কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত'; ব্রজবুলী ভাষার সৃষ্টি ও ব্রজবুলি সাহিত্য; বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ; শাক্ত পদ—রামপ্রসাদ; রামায়ণ মহাভারতের বাঙ্গালা রূপ; বাঙ্গালা দেশে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর বিশিষ্ট অভিব্যক্তি; শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গল-কাব্যের উপাখ্যান—বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা; লাউসেন-কথা (অধুনা কম প্রচারিত); পশ্চিম-বঙ্গের ধর্মপূজা; বাঙ্গলার কথকতা; কীর্তনগান—কীর্তনের অভিব্যক্তি—গড়েরহাটী বা গরাণহাটী, মনোহরশাহী,

রাণীহাটী, প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন; বাউল ও ভাটিয়াল গান; বাঙ্গালার শ্লোক-পড়ার সুর; কবি, ঝুমুর, তরজা ও অন্য গ্রাম্য গীত; পাঁচালী; বাঙ্গালার 'যাত্রা'; জারি গান; মুসলমান মারফতী গান, মর্সিয়া গান; বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান পুঁথি-পড়ার সুর; বাঙ্গালার পয়ার; পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দীগানের বাঙ্গালায় প্রচার—বাঙ্গালার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রী, ঢপ, খেমটা।

বাঙ্গালার সাহিত্যে—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', চৈতন্য ও বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্রবিষয়ক পুস্তক, পদাবলী-সাহিত্য, প্রাচীন বাঙ্গালার কাব্যাবলী (মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি); ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ; বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্তু—গীতি-কবিতা।

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করিয়া, ইংরেজদের আগমন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অধুনা ইহার কতকগুলি বিষয় একেবারে লোপ পাইয়াছে, কতকগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং কতকগুলির আমরা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আছি। ইংরেজ-আমলে বাঙ্গালা কতকগুলি নূতন জিনিসে, তথা এই প্রাচীন জিনিসগুলির অনেকগুলিতে, সমগ্র ভারতের দ্বারায় স্বীকৃত বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক কালের বাঙ্গালীর সংস্কৃতির পরিচয়-স্বরূপ বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর মধ্যে উল্লেখ করা যায়—

[১] বাঙ্গালার ব্রহ্ম ধর্ম—রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী।

[২] বাঙ্গালায় হিন্দুধর্মের নবীন জাগৃতি—রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভূদেব, বিজয়কৃষ্ণ, হীরেন্দ্রনাথ। ধর্মকে অবলম্বন করিয়া জনসেবা—ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মিশন।

[৩] আধুনিক বাঙ্গালার সংস্কৃত-চর্চা—রাধাকান্ত দেব, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পঞ্চানন তর্করত্ন, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্তরত্ন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ।

[৪] বাঙ্গালার সাহিত্য—ঈশ্বরচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, কালীপ্রসন্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র।

[৫] বাঙ্গালার নবীন শিল্প-পদ্ধতি—ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধার চেষ্টা—অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও ইঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ।

[৬] রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বাঙ্গালা সঙ্গীতের নূতন ধারা; শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এবং অন্যত্র উদয়শঙ্কর প্রভৃতি বাঙ্গালী নৃত্যকলাবিদ্‌গণের দ্বারা প্রবর্তিত ভারতীয় নৃত্যের নূতন ধারা।

[৭] বাঙ্গালার সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা ও সংরক্ষণ-চেষ্টা—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র।

[৮] বাঙ্গালায় আরব্ধ রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন, এবং বঙ্কিম-প্রমুখ বাঙ্গালী কর্তৃক ভারত-মাতার কল্পনা। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, যাত্রামোহন সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

[৯] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের গবেষণা—আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ।

[১০] বাঙ্গালীর প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক সার্থক গবেষণা—রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র রায়।

বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে একাধারে পাণ্ডিত্য ও কৃতকারিতার অভাব নাই, তাহা আধুনিক বাঙ্গালার "বাচস্পত্য" সংস্কৃত অভিধানের সংকলয়িতা তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং বাঙ্গালা "বিশ্বকোষ"কার নগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

... ...

প্রসঙ্গতঃ বিশিষ্ট বাঙ্গালী সংস্কৃতির কতকগুলি লক্ষণায় অঙ্গ বা উপজীব্য বস্তু, অনুষ্ঠান ও প্রকাশের উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালার সংস্কৃতির গতির দিগ্‌দর্শনে ফিরিয়া আসা যাউক।

মোগল-যুগের মধ্যেই, বাঙ্গালা দেশে ইউরোপীয়—পোর্তুগীস, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ—আসিল। ইংরেজ ধীরে-ধীরে দেশের রাজা হইয়া বসিল। বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে, ইংরেজের সহিত সাহচর্য্যের ফলে, আর

একবার যুগান্তর উপস্থিত হইল।

এই যুগান্তর এখনও চলিতেছে। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত, এই যুগান্তর ব্যাপারে আমরা চারিটী পর্য্যায় বা ক্রম দেখিতে পাই। [১] রামমোহনের যুগ, [২] "ইয়ং-বেঙ্গল"-এর যুগ, [৩] বঙ্কিম-ভূদেব বিবেকানন্দ যুগ, ও [৪] অতি আধুনিক যুগ, বা লড়াইয়ের পরের যুগ।

[১] প্রথম যুগে ইউরোপীয় মনের সহিত বাঙ্গালী মনের প্রথম পরিচয়। এই প্রথম পরিচয়ের সময়ে, ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন একটু সাবধানতা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল, একেবারে নিজেকে বিকাইয়া দিতে চাহে নাই। রামমোহন এই যুগের প্রতীক। ইনি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তখনকার দিনের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আদর্শের উর্ধ্বে উঠিতে না পারিলেও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সার কথা উপনিষদ্‌কে আশ্রয় করিয়া তিনি ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সভ্যতা যে একটা dynamic বা গতিশীল ব্যাপার, উপনিষদেই ইহার পর্য্যবসান নহে,—এই বোধ আংশিক ভাবে রামমোহনের ও পরে তাঁহার বহু অনুগামীদের মনে না থাকায়, রামমোহনের প্রস্তাবিত সমাধান বা সামঞ্জস্য একদেশদর্শী রহিয়া গেল; এবং বৈরাগ্য-যুক্ত চিত্তের মানুষ না হওয়ায়, রামমোহন এদেশের মন যাহা চায়—তদনুরূপ ঈশ্বরে একান্তভাবে নিমজ্জিত লোকপূজিত ধর্মগুরু হইতে পারিলেন না।

[২] দ্বিতীয় যুগে, বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সহিত পরিচয়ের অভাবে ইহার প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহারা নানা উপায়ে ইউরোপীয় মনোভাব—এমন কি ইউরোপীয় রীতিনীতি ও জীবন-যাত্রার প্রণালী—সমস্তই ভারতবর্ষের উপর আরোপ করিতে চাহিলেন। এরূপ উলট-পালট করিবার মত সংখ্যা বা শক্তি তাঁহাদের ছিল না; কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত অথবা ইংরেজী-শিক্ষাকামী জনগণের মনে তাঁহারা একটী ছাপ দিয়া গেলেন।

[৩] তারপরে আসিল যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা—এই চেষ্টায় ছিল—প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাকে রক্ষা করিয়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও আমাদের পক্ষে হিতকর তাহা আত্মসাৎ করা। বঙ্কিম, ভূদেব ও বিবেকানন্দের যুগে—অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৬০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত—জীবন ধীর-মন্থর গতিতে চলিতেছিল; ইউরোপীয় সভ্যতা আজকালকার মত একটা সর্বগ্রাসী ভাবে আমাদের সমক্ষে তখন দেখা দেয় নাই, আমাদের জীবনে আজকালকার মত

এত জটিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাও আসে নাই। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধীরে-সুস্থে বিচার করিবার অবকাশ ছিল, তাই আমরা বঙ্কিমে ভূদেবে বিবেকানন্দে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে হিতকর—তাহার সংহতি-শক্তিকে দৃঢ় করিবার উপযোগী এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবার যোগ্য—কথা পাই; সমীক্ষা ও অনুশীলন ছিল বলিয়াই বঙ্কিম ও মধুসূদন বাঙ্গালীর জন্য এমন চিরন্তন রস-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা বাঙ্গালীর সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

[৪] এখন বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে যুগ চলিতেছে, তাহার মূল কথা হইতেছে —বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাত, বাঙ্গালীর জীবনে ক্রমবর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবনতি ও তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন, এবং আদর্শ-বিপর্যয়। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বনাশকর হিন্দু-মুসলমান বিরোধও এই যুগের চারিত্রিক এবং অর্থনৈতিক অবনতির একটা প্রধান কারণ। এখনকার কালে চারিদিক হইতে ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনে আসিয়া পড়িতেছে। এই যে দ্রুত ভাব-বিনিময় —সংবাদপত্রের ও সাহিত্যের বহুল প্রচার, চলচ্চিত্র ও সবাক্‌চিত্র প্রভৃতির যুগে এরূপটা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক অবস্থা-বৈগুণ্যে বাঙ্গালীর সামাজিক আদর্শও পরিবর্তিত হইতেছে; প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ, যাহা এতাবৎ কন্যাপণ ও কন্যার সংখ্যাল্পতা হেতু নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, অর্থনৈতিক সঙ্কটে বেশী করিয়া ক্লিষ্ট হওয়ায় তাহা মধ্যবিত্ত ঘরেও আসিয়া পড়িতেছে; অকৃতদার পুরুষ, ও অবীরা বা কুমারী নারী,—নূতন যুগের এই বৈশিষ্ট্য বহুশঃ বাঙ্গালী সমাজেও পরিব্যাপ্ত হইতেছে ও হইবে। সহশিক্ষা-রূপ নূতন সমস্যাও আসিতেছে।

বুদ্ধিমান্ জাতি বলিয়া বাঙ্গালীর খ্যাতি আছে। পূর্বে বিচারিত আধুনিক যুগান্তরের কালের তৃতীয় যুগে অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৪০ হইতে ১৯০০ পর্যন্ত, বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজের আনুগত্য করিয়া আসিয়াছে; ইংরেজের বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে তাহার অর্থনৈতিক সঙ্কট হয় নাই, সে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ জুড়িয়া বড় চাকুরী ও প্রভূত সম্মান, উভয় পাইয়া আসিয়াছে। অখ্যাত, অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত, সুদূর প্রান্তিক প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া দিল্লীতে বা অন্যত্র পাঁচজনের সমাজে, এতাবৎ বাঙ্গালী বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায় নাই। ইংরেজের অনুচর হইয়া এবং রাজধানী কলিকাতার অধিবাসী বলিয়া, এখন সে এক অতি উচ্চ স্থান দখল করিয়া বসিল; ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ মাথা-গরমও হইল। তাহার সে সুখের দিন আর নাই। এখন সে বাহির হইতে বিতাড়িত হইতেছে; অন্নাভাবে তাহাকে নিজ

বাসভূমেও পরবাসী হইতে হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দু এতদিন ধরিয়া যে সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহার গঠন-কার্য্যে বাঙ্গালী মুসলমানেরও সাহচর্য্য ছিল, সেই সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মূলোৎপটেনের চেষ্টা হইতেছে—নূতন প্রচারিত বিধ্বংসন-ধর্মী সাম্প্রদায়িক মুসলমান মনোভাবের ফলে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নিজেকে যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে, সে শিক্ষা তাহার আর জীবনে কার্যকরী হইতেছে না; সে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে নিজের বৃত্তি ও নিজের জীবন-যাত্রার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিতেছে না, কেবল ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। দেশে তেমন বড় চিন্তানেতা নাই, যিনি তাহাকে যথার্থ দিগ্‌দর্শন করান, তাহার কর্তব্য বলিয়া দেন, বজ্রনির্ঘোষ আহ্বানে তাহাকে পরিচালিত করেন।

এই অবস্থার মধ্যেও শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালী সাহিত্য-সৃষ্টি করিবার জন্য লালায়িত—কেবল যা-তা সাহিত্য নহে—বড় সাহিত্য। জাতির মধ্যে স্ফূর্ত জীবনী-শক্তি, অদম্য আশা, অটুট কর্মশীলতা না থাকিলে সে জাতির মধ্যে কি প্রকারের সাহিত্য জন্মলাভ করিবে? এই যুগের পূর্ববর্তী কালের দুই চারিজন সাহিত্যরথী বিদ্যমান, তাঁহাদের লইয়াই আমরা গৌরব করি; কিন্তু যুগ-ধর্মের ফলে বাঙ্গালীর অতি-আধুনিক সাহিত্য-চেষ্টা (অল্প দুই এক জন প্রতিভাশালী লেখককে বাদ দিলে) ব্যর্থতার একটা হৃদয়-বিদারক প্রকাশ মাত্র।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং তাহার কৃতিত্ব বিচার করিয়া, উপস্থিত সঙ্কট-কালে তাহার মানসিক চর্চা সম্বন্ধে এই কয়টী কথা বলা যায়—

[১] বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ জাতি, ইহা সত্য বটে,—কিন্তু এই ভাব-প্রবণতাই তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে। বাঙ্গালী লক্ষণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু সেই সাহিত্য, জগতে এমন অপূর্ব কিছু বস্তু নহে;—তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক কি শতখানেক বৈষ্ণব পদ এবং কতকগুলি আখ্যায়িকা, এবং আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে কতকটা মধুসূদনের কাব্যাংশ, বঙ্কিমের খানকয়েক উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতা, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ ও অন্য রচনা—মাত্র এই কয়টা জিনিস আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থাপিত করিতে পারি। ভাটিয়া বা মারোয়াড়ী, অথবা পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীর তুলনায় বাঙ্গালী ব্যবসায়-বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছে না; ইহার কারণ নির্দেশ করিবার জন্য অমনিই সিদ্ধান্ত করা হইল, বাঙ্গালী কবি জাতি, ভাব-প্রবণ জাতি, তাহার মধ্যে কর্মশক্তি

নাই, তাহার উৎসাহ ও উদ্যোগের সমস্তটাই ভাবুকের খেয়ালে, কবির কল্পনায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরাও এই কথাটা যেন পাকে-প্রকারে মানিয়া লইয়াছি; রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে, আমাদের সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ সচেতন গৌরব-বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, একটা গর্ব-সুখে আমাদের চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মতেরম্' গান কার্যতঃ ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-সঙ্গীত রূপে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে মারোয়াড়ীর মত কৃতিত্ব আমাদের মধ্যে না দেখিয়া, সকলেই আমাদের কল্পনা-শক্তিরই তারিফ করিতেছে; আমরাও সেই কথা সত্য ভাবিয়া, প্রেমানন্দে নাচিতেছি,—আমাদের ব্যর্থতাকে আমরা কেবল আমাদের প্রতিকূল অবস্থা অথবা দৈব-দুর্বিপাক হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাহার প্রতিকারের শক্তিকে খর্ব করিতেছি। আমাদের দেশের নেতারা কেহ-কেহ সাহিত্যে, কীর্তনের গানে, আমাদের ভাবুক প্রাণের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কবিতা ও গান, ইহাই যেন হইল আমাদের মানসিক সংস্কৃতির চরম ফল। বার-বার একটা কথা শুনিয়া, সেই কথা ক্রমাগত মন্ত্রের মত জপ করিয়া, আমরা সেই কথাটাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি।

কিন্তু বাস্তবিক এই কথাটাই কি ঠিক? আমরা কি কেবল ভাব-প্রবণ জাতি? আমাদের মধ্যে কি জ্ঞানের সাধনা, কর্মের সার্থকতা নাই—হয় নাই? আমার মনে হয়—ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা, সাহিত্য-রসে মশগুল হইয়া থাকা—ইহা আমাদের মানসিক সংস্কৃতির একটা দিক্ মাত্র—ইহা সর্বপ্রধান দিক্‌ও নহে। প্রাচীনকালে কীর্তনের সভায় ও কবি বা পাঁচালী গানের আখড়ায়, বাউলের জমায়েতে ও মারফতী গানের মজলিসে যেমন বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি পণ্ডিতের টোলে এবং বিচার-সভায় তাহার জ্ঞানের দিক্‌টা প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞান-মন্দিরে বাঙ্গালী রিক্ত-হস্তে যায় নাই। ভারতের সঙ্গীতোদ্যানে বাঙ্গালা কীর্তন একটী বিশিষ্ট সুরভি পুষ্প, সন্দেহ নাই; কিন্তু নব্য ন্যায়, বাঙ্গালার সংস্কৃত কাব্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব-গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রন্থাবলী; বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী, এবং আধুনিক কালে বাঙ্গালার রামমোহন, বাঙ্গালার বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার কেশবচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক—ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাড়াইতে ও ভারতের চিন্তাকে পুষ্ট করিতে ইঁহাদের দান কম নয়; ইঁহারা বাঙ্গালার মানসিক সংস্কৃতির অপর একটী দিক্—এবং একটী বড় দিক্,—নিছক ভাব-প্রবণতার

অত্যাবশ্যক প্রতিষেধক দিক্‌কে প্রকাশ করিয়া আছেন। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুর এখন জীবন-মরণ সঙ্কট উপস্থিত; আমাদের ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা সবই শুখাইয়া যাইতেছে এবং অন্নের অভাবে তাহা আরও শুখাইয়া যাইবে। জাতির জীবনের স্ফূর্তি, আশা, আনন্দ, উৎসাহ, জয়ের আগ্রহ না থাকিলে সেই জাতির মধ্যে সত্যকার প্রাণবন্ত সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন সাহিত্য-সৃষ্টির সাহিত্য-চর্চার চেষ্টা, কল্পনার আবাহন, ভাবুকতার সাধন,—সে যেন যে গাছের গোড়া শুখাইয়া আসিতেছে, শিকড়ে যাহার রস নাই, সেই গাছের আগ-ডালে বারি-সেচন করা। আমাদের জীবনে ভোগ করিবার, ত্যাগ করিবার কি আছে? অর্জন করিবার, জয় করিবার কি আছে? যেটুকু আছে, তাহা তো রক্ষা করিবারও পথ পাইতেছি না। এ অবস্থায় কি প্রকারের সাহিত্য আমাদের হাত দিয়া বাহির হইতে পারে? বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিয়াছে; রসচর্য্যা লইয়া মাতামাতি করা এখন তাহার পক্ষে নিতান্তই অশোভন দেখায়। এখন প্রাণধারণের, দুর্দিনের রাত্রে কোনও রকমে টিঁকিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। এখন তাহাকে সব বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এখন তাহার আত্মবিশ্লেষণ কার্য্যে তাহাকে জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির আবাহন করিতে হইবে; সে শক্তির পরিচয় সে দিয়াছে, সে শক্তি তাহার আছে, এবং সে শক্তি তাহার কল্পনা বা ভাবুকতা হইতে কোনও অংশে কম নহে।

[২] প্রত্যেক সমাজের মধ্যে দুই প্রকারের শক্তি কার্য্য করে—কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপসারী, আত্মসমাহিতকারী এবং আত্মপ্রসারকারী; এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালী সম্প্রতি একটু বেশী রকম করিয়া বহির্মুখী হইতে চাহিতেছে। এখানে জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া তাহাকে একটু অন্তর্মুখী করা, এখন তাহার প্রাণরক্ষার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিস্ফুরণের দোহাই দিয়া, ব্যক্তিগত জীবনে অবাধ স্বাধীন গতি এই কেন্দ্রাপসারিত্বের একটী বাহ্য প্রকাশ। কিন্তু সমাজ-গত সমষ্টির বিভিন্ন অংশ-স্বরূপ ব্যক্তি-গত ব্যষ্টি, যদি এই রূপে মুক্ত, স্বতন্ত্র ও সংঘ-বিচ্যুত হইয়া অবাধ গতি অবলম্বন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সমাজ-সমষ্টি আর সমষ্টি-বদ্ধ থাকে না। এক কথায়, Social Discipline বা সমাজগত চর্য্যা বা নীতি বা বিনয় না থাকিলে, সমাজ ও জাতি টিঁকিতে পারে না। এখন বাঙ্গালীর জীবনে বাহিরের ও ভিতরের নানা প্রতিকূলতার বিপক্ষে সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের অবাধ প্রসারের সময় ইহা নয়; একমাত্র সংঘ-গতভাবে অবস্থান দ্বারাই ব্যক্তিগত

ও সমাজগত জীবন ও স্বার্থ উভয়ই রক্ষিত হইতে পারে। বাঙ্গালীর জীবনে এখন এই রক্ষয়িত্রী শক্তির উজ্জীবন করিতে হইবে,—আবার সমাজকে, সঙ্ঘকে, জাতিকে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। কি ভাবে এ কার্য্য করা উচিত, তাহা অবশ্য বিচার-সাপেক্ষ। রক্ষয়িত্রী শক্তি অর্থে নিছক গোঁড়ামি নহে। দেশ ও কালের উপযোগী ভাবে, নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হইতে বিচ্যুত না হওয়াই হইতেছে সামাজিক জীবনে কার্য্যকর রক্ষণশীলতা। এ কাজের জন্য প্রথম আবশ্যক—জ্ঞান, আলোচনা, অনুশীলন; নিজের জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে, এবং বাহিরের জগতের প্রগতি বিষয়ে। বাঙ্গালীকে আবার একটা বাঁধা-ধরা discipline মানিতে হইবে—'ন্যায়-আঁকড়িয়া' হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে রাশ ছাড়িয়া দিলে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিতে হইবে।

[৩] বাঙ্গালী কর্মী নহে, তাহার এই একটা অপবাদ আছে। সত্য বটে, হাজারে-হাজারে লাখে-লাখে বাঙ্গালী অন্ন-উপার্জনের জন্য বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালার বাহিরে যায় নাই—যেমন পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালায় আসিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, এতাবৎ বাঙ্গালীর ঘরে একমুঠা ভাতের অভাব হয় নাই। সেদিন পর্য্যন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের অন্নচিন্তা ছিল না। গরীব লোকে দেশে বসিয়াই পেট ভরাইতে পারিত, বা আধ-পেটা খাইয়া কোনও রকমে থাকিতে পারিত, ১৫।২০ টাকার জন্য কাঁচা মাথা দিবার আবশ্যকতা তাহার ছিল না, 'রুটী-অর্জন' করিতে বাহিরে ছুটিতে হইত না। এখন সে আবশ্যকতা আসিতেছে। আমার মনে হয়, তথাকথিত ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী, কবি বাঙ্গালী, এখন দরকার পড়িলে কর্মী বাঙ্গালী হইতে পিছপাও হইবে না। আবশ্যকতা পড়িয়াছে বলিয়াই ময়মনসিংহের বাঙ্গালী কৃষক এখন ঘর ছাড়িয়া আসাম প্রদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, বর্মা ও শ্যামে গিয়া বসবাস করিতেছে। দেখা গিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী অন্য জাতির লোকেদের চেয়ে কিছু কম কৃতিত্ব দেখায় নাই। মানুষের কর্ম-শক্তি তাহার আভ্যন্তর urge বা তাড়নার উপরে নির্ভর করে। বাঙ্গালীর অবস্থা-বৈগুণ্যে সে তাড়না আসিতেছে। বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া শ্রমী ও কর্মী হইতেই হইবে। 'তুমি কবি ও ভাবুকের জাতি, তোমার দ্বারা এসব কিছু হইবে না',—এইরূপ নিরুৎসাহ-বাক্যে তাহার শত্রুরাই তাহাকে নিবৃত্ত করিবে।

[৪] বাঙ্গালীর বাঙ্গালীপনার বা বাঙ্গালীত্বের দিকে ঝোঁক দিয়া কেহ-কেহ তাহাকে অসম্ভব রকমে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার মনে শক্তি জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালীর মতন শিল্পী জাতি দুনিয়ায় নাই—প্রমাণ, বাঙ্গালী পটুয়ার

পট, বাঙ্গালী ছুতারের কাঠ-খোদাই, মধ্য-যুগের বাঙ্গালার ইটে-কাটা মন্দিরের নক্‌শা; বাঙ্গালীর নাচ অপূর্ব—প্রমাণ, বাঙ্গালীর মল্ল-নৃত্য; রায়-বেঁশে নাচ, বাঙ্গালার কোনও কোনও জেলার মেয়েদের মধ্যে বিলোপ-শীল ব্রত-নৃত্য। আমাদের দেশের গ্রাম-শিল্পকে আমরা প্রাণ দিয়া ভালবাসিব, যতটা সাধ্য তাহাকে রক্ষা করিব; এই শিল্প আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটী মনোহর অভিব্যক্তি; কিন্তু তাই বলিয়া, জগতের অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর জিনিসকে টেক্কা দিয়াছে আমাদের বাঙ্গালার এই শিল্প ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, এরূপ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালী মুখে হাস্যের উদ্রেক করিবে। সাহিত্যে একজন রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গমাতা অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই বলিয়া যেমন ইহা প্রমাণিত হয় না যে, বাঙ্গালী মাত্রই কবি, তেমনি একজন অবনীন্দ্র বা নন্দলাল ভারতীর নিজ হস্ত হইতে তুলিকা পাইয়াছেন বলিয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিল্প-বিষয়ে অসাধারণত্ব সূচিত হয় না।

আমরা ভারতের আর পাঁচটী জাতির মতই একটী প্রধান ভারতীয় জাতি। আমাদের ভাবুকতা আছে, আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের যথেষ্ট শিল্প-বোধ আছে; ভারতের সভ্যতার ভাণ্ডারে হাত পাতিয়া আমরা কেবল লই নাই, দিয়াছিও যথেষ্ট; আমাদের সাহিত্য, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের বিদ্যা, গবেষণা ও আবিষ্কার, আমাদের হিন্দু-যুগের ও মধ্য-যুগের মন্দির-শিল্প ও ভাস্কর্য্য, পট ও ইটে-খোদাই,—এসব গর্ব করিবার বস্তু, ভারতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ-স্বরূপ এগুলি বিশ্বজন-সমাজে দেখাইবার যোগ্য; এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব কোনও-কোনও বিষয়ে বিশ্বজনও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে, ও করিবে; এইখানেই আমাদের পূর্ণ সার্থকতা। আমরা অনুচিত গর্ব করিতে চাহি না; তবে যে কোনও অবস্থায় আমরা যে অকৃতকার্য্য হইব না, আমরা পূর্ব কৃতিত্ব আলোচনা করিয়া সেইটুকু আত্মবিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের মনে আনিতে চাহি।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। শেষ এই কথা বলি—অনার্য্য এবং আর্য্য পিতৃপুরুষ ও সংস্কৃতি-গুরুদের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গালীরা যে মনঃপ্রকৃতি পাইয়াছি, তাহা নিন্দার নহে; আমাদের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিক ও ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই—আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম দিয়া তাহাকে প্রবর্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে। উপস্থিত আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কল্পনা ও ভাবুকতা এবং রসানন্দের দিকে ঝোঁক না দিয়া, আত্মরক্ষার জন্য আমাদের জ্ঞান ও কর্মের দিকেই বেশী করিয়া ঝোঁক দিতে হইবে—ইহাই আমার নিবেদন॥

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

চল্লিশ বৎসর হইল, পুণ্যশ্লোক ভূদেবের পরলোক-গমন হইয়াছে।—কোনও প্রভাবশীল ব্যক্তি আমাদের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকিলে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া বা তাঁহার কৃতিত্বের পূরা পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন হয়। অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল হইল, প্রবন্ধ দ্বারা এবং আপনার জীবনের আচরণ দ্বারা ভূদেব বাঙ্গালী হিন্দুর সমক্ষে একটী আদর্শ ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের কার্য্যকারিতা এবং তাহার মধ্যে নিহিত চিন্তাপ্রণালীর সারবত্তা বিচার করিয়া দেখিবার সময় এখন আসিয়াছে। ভূদেব, আর দশজন বাঙ্গালীর মধ্যে একজন বাঙ্গালী থাকিয়াই, নিজেকে সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে নিমগ্ন রাখিয়াই জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে যাহা-কিছু ভাল এবং যাহা-কিছু মন্দ আছে, ইহার মধ্যে গৌরবের এবং নিন্দার যাহা-কিছু আছে, সেই ভাল-মন্দ এবং নিন্দা-গৌরব সমেত এই জীবনকে মানিয়া লইয়া, তাহার মধ্যে থাকিয়া, নিজের জ্ঞান-গোচর মত এবং চিন্তা ও অভিজ্ঞতা মত সেই জীবনকে পূত ও সংস্কৃত, সবল ও ঘাত-সহ করিতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। নিজ জাতিকে সম্পূর্ণ-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার মৌলিক প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়া, সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহার হিত-সাধনে আত্মনিয়োগ করা—এই ব্যাপারে একাধারে তাঁহার স্বাজাত্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও আত্মনির্ভরশীল বীরত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূদেবের জীবনে চটকদার ও চমকপ্রদ কিছুই ঘটে নাই। তিনি সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের সন্তান ছিলেন, পৈতৃক ব্যবসায় ছিল যাজন ও অধ্যাপনা। শিক্ষা-সম্পর্কীয় কার্য্যেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন, এবং তাঁহার উপজীব্য ব্যবসায়ই দেশ ও সমাজ-সেবার ব্রতে তাঁহার মুখ্য সাধনা-স্বরূপ হইয়াছিল। উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত যথার্থ ব্রাহ্মণ পিতার হাতে মানুষ হইয়া, প্রতিভাশালী বালক ভূদেব বিদ্যা-অর্জনে কৃতিত্বের পরিচয় দেন—আর পাঁচজন প্রতিভাশালী বাঙ্গালী ছেলেরই মত। কিন্তু প্রথম হইতেই তাহাদের চেয়ে তাঁহার চরিত্র-গত একটু বৈশিষ্ট্য, একটু লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাহার পরে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনার কার্য্য গ্রহণ করেন, ও তদনন্তর শিক্ষাবিভাগে পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে ভারতবাসীর ভাগ্যে যতটা উচ্চ পদ পাওয়া সম্ভব ছিল, তাহা অপেক্ষাও উচ্চ পদ নিজ যোগ্যতা-বলে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের

শিক্ষা-বিভাগের মুখ্য পরিচালক রূপে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার কথাও হইয়াছিল কেবল উচ্চ পদ হেতু তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্ব। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙ্গালীর সংকীর্ণ জীবনের গণ্ডীর মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব ছিল, বাহ্যতঃ ততটুকু তিনি করিয়াছিলেন ; কিন্তু উপদেশ দ্বারা এবং নিজ চারিত্র্যের প্রমাণ দ্বারা তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ করিয়াছিলেন—যদিও তাঁহার দেশ ও সমাজ, কাল-ধর্মের ফেরে, তাহা পূর্ণ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ যুগে, ইহার পরবর্তী যুগের (অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথম পাদ বা প্রথমার্ধের) বাঙ্গালী-জীবনের ধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায়। যে ভাবে সকলের জ্ঞাত-সারে এই নিয়ন্ত্রণ-কার্য্য ঘটে, তাহাতে অনুকূল এবং প্রতিকূল দুই দিক দিয়া ভূদেব অংশ গ্রহণ করেন। যে সকল মনীষীর হাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক বাঙ্গালীর (অতি আধুনিক তথা-কথিত তরুণ বাঙ্গালীর নহে) চরিত্র ও চিন্তাধারা মুখ্যতঃ যাঁহাদের আদর্শে ও ভাবে অনেকটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, ভূদেব তাঁহাদের অন্যতম। ভূদেবের সঙ্গে সঙ্গে আর তিনজনের নাম করিতে পারা যায়—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ

ভূদেব বিলাতে যান নাই—সিভিলিয়ান বা ব্যারিস্টার হইয়া আসেন নাই। Sensational অর্থাৎ রোমাঞ্চকর কিছু করিয়া বসেন নাই। নিজ সমাজের বা জাতির মধ্যে, আদর্শ এবং আচরণের মধ্যে বহুপ্রকার অসঙ্গতি দেখিয়া, বীররস দেখাইয়া, নাটুকে' কায়দায় স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের অভিশাপ আবাহন করেন নাই—রূপক-চ্ছলে বা বাস্তব-রূপে পৈতা ছিঁড়িয়া সমাজের উপরে পদাঘাত-পূর্বক সমাজের বাহিরে চলিয়া গিয়া, অন্যত্র আত্মবিসর্জন করেন নাই। আবার সমাজ বা জাতির সম্বন্ধে একেবারে উদ্দেশ্যহীন হন নাই ; কেবল ব্যক্তিত্বের দোহাই পাড়িয়া, cynic ('শ্ব-বৃত্ত') অর্থাৎ সমদর্শীর ভানে নিন্দা-বৃত্ত হইয়া, নিরপেক্ষ দর্শক বা বিচারকের উচ্চাসনে বসেন নাই, এবং কেবল বচন ও টিপ্পনী কাটিয়াই সমাজের প্রতি নিজ কর্তব্যের সমাধা করেন নাই। সমাজ-ত্যাগী, এবং স্বকীয় অধঃপতিত সমাজ সম্বন্ধে cynic, এই দুইটী বিপরীত চরিত্রের প্রথমটীতে যে বাহাদুরীর আভাস আছে, তদ্দর্শনে কখনও কখনও আমাদের মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগে ; দ্বিতীয়টীর পরিচয়ে,অনেক সময়ে উহার বাহিরের চটকের মোহে আমরা পড়িয়া যাই, আমাদের নিজেদের বোধ ও বিচার-শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হারাই—cynic-এর মনোভাব সাধারণ জনতার মনোভাবের উর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, ইহা আমাদের মনে একটা ভ্রম

আনিয়া দিলেও, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, এই দুই প্রকারের চরিত্রের মধ্যে যে একটু সূক্ষ্ম vulgarity বা ইতরামি আছে তাহা বুঝা যায়। ভূদেবের জীবনে ও চরিত্রে এই দুই প্রকারে তাক্ লাগাইয়া দিবার কিছু ছিল না বলিয়া, এবং নিজের ও নিজ পরিজনের জীবনযাত্রার সুনিয়ন্ত্রণের ফলে, কর্মজীবনে তাঁহাকে কখনও অভাবগ্রস্ত হইতে হয় নাই বলিয়া successful bourgeois অর্থাৎ 'অর্থাগম ও প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় কৃতকার্য্য বুদ্ধিজীবী' এই আখ্যা দিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে নাসিকা-কুঞ্চন পূর্বক তুচ্ছতা-পূর্ণ উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। ভূদেবের জীবন ও তাঁহার লেখার সহিত পরিচয়ের, তথা ভূদেবের সময়ের বাঙ্গালী সমাজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আলোচনার অভাবই এইরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ এবং অনুচিত উক্তির কারণ।

ভূদেবের কৈশোর ও যৌবনকাল বাঙ্গালীর পক্ষে এক বিষম সময় ছিল। তখন ইংরেজী সভ্যতার প্রথম বড় ধাক্কা বাঙ্গালীর জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে—সেই ধাক্কা অনেকেই সামলাইতে পারিতেছিল না; ইংরেজী শিখিয়া অনেক বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান, ইউরোপীয় সভ্যতা ও মনোভাবের কাছে যতটা না হউক, ইউরোপীয় রীতি-নীতি ও আদব-কায়দার কাছে আপনাকে একেবারে বিকাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। ১৮৪০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই ভাবটা প্রবল ছিল। এই সময় কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির আব-হাওয়া বাঙ্গালীর মানসিক সংস্কৃতির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর ছিল না। একদিকে যেমন ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি বাঙ্গালীর মনে নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা এবং নবীন প্রেরণা আনিতেছিল, অন্য দিকে তেমনি তাহার নূতন শিক্ষা তাহাকে নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ করিয়া রাখিতেছিল, এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাসহীন করিয়া তুলিতেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে এই সহায়হীনতার ভাব, এই জাতীয় মর্য্যাদা-বোধের অভাব, বাঙ্গালীর পক্ষে সব চেয়ে বড় দুঃখের ও লজ্জার কথা ছিল। ইংরেজের অধীনে আমরা; বুদ্ধিতে, শক্তিতে ও সঙ্ঘবদ্ধতায় ইংরেজ আমাদের অপেক্ষা উন্নত; ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানও আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। আবার ইহার উপর সমগ্র সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও যদি ইংরেজের রীতি-নীতি আমাদের অপেক্ষা উন্নততর ও শোভনতর বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই, তাহা হইলে কিসের উপরে আমাদের জাত্যভিমান, আমাদের আত্মমর্য্যাদা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? জাত্যভিমানের অভাব—ইহার অর্থই হইতেছে, সমষ্টি-গত ভাবে জাতির তাবৎ-

ব্যক্তিগণের মধ্যে আত্মসম্মানের অভাব। নিজ জাতির সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার রীতি-নীতি সম্বন্ধে কোন খবর রাখি না বলিয়াই, সেগুলি আমাদের কাছে uncouth বা অজ্ঞাত থাকে এবং কুৎসিত বলিয়া প্রতিভাত হয়, বিদেশী রীতি-নীতির সমক্ষে সেগুলিকে হীন বলিয়া বোধ হয়— মনে মনে নিজ জাতির জন্য সদাই একটা 'কিন্তু কিন্তু' ভাব, একটা inferiority complex অর্থাৎ আত্মলাঘবপূর্ণ ধারণা আসিয়া যায়। সত্যকার মনুষ্যত্ব-অর্জনের পথে ইহা একটা দুরপনেয় অন্তরায়। অনেকেই এই কথাটা বুঝিতেন না। অথবা বুঝিয়া, তদনুসারে কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা পরিচালিত করিতে পারিতেন না। তাই ভারতীয় হিন্দুর মত একটা সুসভ্য ও সাত্মাভিমান জাতির যুবকেরা, সবদিকের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া, আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করিত।

কিন্তু জাতির পক্ষে ইহা চরম রক্ষার কথা ছিল যে, সকলেই এই নবীন স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় নাই ;—আমাদের প্রাচীন সভ্যতার অনুশীলন ও সমাজ-গত আচারনিষ্ঠতাকে আশ্রয় করিয়া থাকায়, অনেকে বাহির হইতে আগত এই ভাব-বন্যায় অবগাহন করিয়া স্নান করিলেও, ইহার স্রোতে কুল-ভ্রষ্ট হইয়া বহিয়া যায় নাই, তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছিল। ভূদেবেরও অবস্থা তাঁহার সতীর্থ বহু ছাত্রের ন্যায়ই হইত, কিন্তু তাঁহার পিতার ঔদার্য্য, পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা তাঁহাকে প্রথম হইতেই রক্ষা করিয়াছিল।

ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত প্রথম সংঘাতের ফলে, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ কতকটা ভগ্ন হইলেও একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় নাই। 'বঙ্গদর্শন' লইয়া বঙ্কিম দেখা দিলেন ; প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার স্বপক্ষে হোরেস হেমান্ উইল্‌সন্, মাক্স্ ম্যুলর প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ দু'কথা বলিলেন, স্বদেশে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ও পরে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মনস্বী পণ্ডিত, বাঙ্গালীর লুপ্তপ্রায় আত্মমর্য্যাদা ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্ধমানের মহারাজা—ইঁহাদের চেষ্টায় মূল সংস্কৃত মহাভারতের দুইটী অনুবাদ হইল। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সানুবাদ রামায়ণ প্রকাশ করিলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির মূল সংস্কৃত উৎস হইতে বাঙ্গালী প্রাণবারি সংগ্রহ করিতে লাগিল। কর্ণেল টড্-এর রাজস্থানের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে হিন্দুর মধ্যযুগের বীরগাথা পড়িয়া বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাসও যেন কতকটা ফিরিয়া আসিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয় ও পাঠক্রম নির্ধারিত হইল, সংস্কৃত ভাষা পাঠ্য-বিষয়-সমূহের অন্তর্ভুক্ত হইল।

কেবল, ইংরেজী শিক্ষা হইলে যে একদেশদর্শিতা হইত, ইহার দ্বারা তাহার প্রতিষেধক মিলিল। ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন ও প্রতীক হইতেছে সংস্কৃত ভাষা; 'ব্যাকরণের উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' ও 'ঋজুপাঠ' লিখিয়া, সংস্কৃত চর্চাকে সহজ করিয়া দিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালী হিন্দুর এক মহান্ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই সব আলোচনা ও অনুশীলন আসিয়া পড়ায়, বাঙ্গালী হিন্দু ইউরোপের সভ্যতার সহিত প্রথম সংঘাতের ফলে যে মোহ দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে কাটাইয়া উঠিল। ইউরোপীয় রীতি-নীতি ও মনোভাব যতটা তাহার জাতীয় জীবনের সঙ্গে খাপ খাইল, ততটা সে আত্মসাৎ করিয়া লইল। কিন্তু এই আত্মসাৎকরণের মধ্যেই ভবিষ্যতে আবার নূতন করিয়া ইউরোপীয় শিক্ষার ক্রিয়ার বীজও উপ্ত রহিল।

এই সময়ে ভূদেবের কর্মজীবন, তাঁহার প্রৌঢ় ও পরিণত জীবন; ভূদেব স্বয়ং প্রথম পুরুষের Young Bengal-এর মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছেন; বংশমর্য্যাদা-বোধ এবং পিতার চারিত্র্যের প্রতি ভক্তি,—এই দুইটী জিনিস তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত হইতে দেয় নাই।

পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে, এবং রাজ-কার্য্য-ব্যপদেশে জাতীয় জীবনে, তাঁহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি প্রস্তাব ও প্রবন্ধের সাহায্যে দেশবাসিগণকে জানাইতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলি নিপুণ ভাবে দেখিয়া, সেই-সকল সমস্যা ও সেগুলির সমাধানও তিনি অপূর্ব সুন্দর ভাবে দেশবাসিগণের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে অনেকেরই চোখ ফুটিল,—অনেকের মনে স্বাজাত্যবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগিল। বঙ্কিম, ভূদেব, ও পরে বিবেকানন্দ, মুখ্যতঃ এই তিন জনের চেষ্টায় বাঙ্গালী হিন্দু অনেকটা আত্মস্থ হইতে পারিয়াছিল।

উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের আরম্ভ, বাঙ্গালীর জীবনে একটা সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণের পরে একটা নূতন যুগ আবার আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগের প্রথম দশকের পর হইতে, এবং বিশেষ করিয়া মহাযুদ্ধের পর হইতে ইউরোপীয় প্রভাব আবার নূতন মূর্তিতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে, এবং বাঙ্গালীর তথা অন্য ভারতবাসীর সভ্যতা ও জাতীয়তার সৌধের উপরে প্রবলবেগে আঘাত দিয়া, ইহাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ

এই ১৯৩৪ সালে যদি বাঙ্গালীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, নানা ব্যাপার দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বহু নূতন অভিজ্ঞতা আসিয়াছে; পুরাতনের বন্ধন আরও শিথিল হইয়া আসিতেছে; এবং বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্যই হউক, বা অকল্যাণের জন্যই হউক, বহু নূতন বস্তু আসিয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি, নানা নূতন ও বিচিত্র উপায়ে ইউরোপীয় সভ্যতা তাহার দরজায় হানা দিতেছে।

রক্ষণশীল মনোভাব অবলম্বন করিলে বলিতে পারা যায় যে, ইংরেজী শিক্ষার যে খাল কাটা হইয়াছিল, সেই খালের মারফৎ প্রথম যুগে পণ্যসম্ভারপূর্ণ বহু অর্ণবপোত বাহির হইতে আসিয়া বাঙ্গালীর জীবনের ঘাটে ভিড়িয়াছিল, এবং এখনও ভিড়িতেছে; কিন্তু সেই খাল বহিয়া কুমীরও আসিয়া তাহার খিড়কীর ঘাটে হানা দিতেছে। বাঙ্গালীর পেটে অন্ন নাই, গৃহে শ্রী নাই; অন্নাভাবে তাহার সংসার, ধর্মের সংসার না থাকিয়া এখন পাপের সংসার হইয়া দাঁড়াইতেছে। চারি পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালী হিন্দু যে পথে চলিতেছিল, এবং সম্প্রতি বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ নানা কারণে যে ভাবে বাঙ্গালীর জীবন প্রতিহত হইতেছে, তাহারই অপরিহার্য্য পরিণতি এখন আমরা দেখিতেছি।

পৃথিবীতে আশা-বাদী ও নৈরাশ্য-বাদী এই দুই প্রকারের মনোভাবের লোক আছে। আমি বিশ্বমানব বা সমগ্র মানবসমাজ সম্বন্ধে আশাবাদী, কিন্তু বিশেষ বিশেষ কতকগুলি সঙ্কীর্ণ মানব-সমাজ সম্বন্ধে নৈরাশ্যভাব পোষণ না করিয়া থাকিতে পারি না। ব্যাপক ভাবে, সুদূর ভবিষ্যৎ কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে, হয় তো বলা যাইতে পারে যে, মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতিই ঘটিবে; উপস্থিত ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া মানুষ শেষে দেবত্বেই গিয়া পঁহুছিবে। কিন্তু এই দেবত্বে গিয়া পঁহুছিবার পূর্বে, বহু প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ জাতির, তথা বহু অর্বাচীন ও নিম্ন-স্তরের জাতির বিলোপ ঘটিবে। হয় তো বা আমাদের হিন্দু ও ভারতীয় জাতিরও বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। একটী জাতির বিলোপ-সাধন ২০০।৫০০ বৎসরে হয়, আবার ৫০।১০০ বৎসরেও হয়। উপস্থিত হিন্দুসমাজের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজাতি (বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশের হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজাতি) সমষ্টি-গত ভাবে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়াছে, এবং রোগকে উপেক্ষা করিয়া এই সমাজ ও জাতি এখন মহোল্লাসে আত্মহত্যার পথে ধাবিত হইতেছে। একমাত্র ভগবান ইহাকে বাঁচাইতে পারেন—উহার বিপরীত বুদ্ধিকে দূরীভূত করিয়া, ব্যাপক ভাবে সমগ্র জাতির মধ্যে শুভ বুদ্ধির প্রণোদন করিয়া, ইহাকে জীবনের

পথে চালিত করিতে পারেন। এক্ষণে আমি আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির ও বিনাশোন্মুখতার নিদর্শনের তালিকা দিতে বসিব না। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে আশা ও আনন্দের কিছু যদি কেহ সত্য সত্যই দেখাইতে পারেন, আমাদের নৈরাশ্যের বোঝা হালকা করিতে সাহায্য করিলেন বলিয়া তাঁহার কথা আমরা মাথা পাতিয়া লইব।

বাঙ্গালীর জীবনে একটা প্রধান এবং লক্ষণীয় দৌর্বল্য বা কলঙ্ক—অন্ধ স্বার্থপরতা। আমাদের সমাজ-গত জীবনে নানা ভাবে ইহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে উচ্চ নৈতিক আদর্শ-সমূহ হইতে আমরা অহরহঃ ভ্রষ্ট হইতেছি—কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজ-গত বা সঙ্ঘ গত জীবনে। এই স্বার্থপরতা আমাদের মধ্যে এরূপ ভাবে আগে কখনও দেখা দেয় নাই। পূর্বে জীবনযাত্রা সরল ছিল, তাহাতে নীতিহীনতা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। এখন আমাদের জীবন আরও অনেক জটিল, আরও অনেক ব্যাপক হইয়াছে; ইহাতে স্বার্থান্ধতা আসিলে, তাহার কুফল আরও গভীর ও ব্যাপকভাবেই ঘটে। যাহা হউক, নৈতিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া নিজের ধৃষ্টতা বাড়াইতে চাহি না। এই স্বার্থ-পরতা-প্রমুখ আমাদের সমস্ত নৈতিক অবগুণ শেষে একটী প্রধান চরিত্রগত অবগুণে গিয়া ঠেকে—সেটি হইতেছে, ব্যক্তিগত ও সমাজ-গত জীবনে discipline বা দম-গুণের অভাব।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, ভারতবর্ষের চিন্তাশীল লোক-নিয়ন্তৃগণ জীবনে পালন করিবার জন্য তিনটি বড় নীতির অনুমোদন করিয়া গিয়াছিলেন। এই তিনটী নীতিকে তাঁহারা 'অমৃত-পদ' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। এই তিনটি হইতেছে—'দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ'; অর্থাৎ self-discipline বা আত্মদমন, renunciation বা অনাসক্তি, এবং preserving intellectual clarity অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রমত্ততা বা কলুষ হইতে মুক্ত রাখা। এই তিনটি অমৃত-পদ অন্য সমস্ত সদ্‌গুণের ও সদ্‌বৃত্তির আদি ও আধার। দুই হাজারের অধিক বৎসর পূর্বে একজন সুসভ্য গ্রীক, যিনি ভারতের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজেকে 'ভাগবত হেলিওদোর' বলিয়া পরিচিত করেন, তাঁহার নিকট এই 'দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ'-এর আদর্শ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, এবং তিনি লেখ-সংস্থাপন দ্বারা তাহার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির ও মনোভাবের এক বিশিষ্ট প্রকাশ এই তিনটি অমৃত-পদের প্রচারের দ্বারাই হইয়াছিল। ব্যক্তি-গত ও সমাজ-গত জীবনে এই তিনটীর মত কার্য্যকর নীতি আর কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু

আমাদের জীবনের কোনও দিকে আর এই 'দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ' কার্য্যকর হইতেছে না। অথচ আত্মবিস্মৃত, ভিতরে ও বাহিরে সর্বতোভাবে পর্য্যুদস্ত, সব দিক্ দিয়া বিপন্ন জাতির পক্ষে, আত্মসমাহিত হওয়া, তিতিক্ষাবৃত্তি পালন করা এবং চিন্তাশক্তিকে নিষ্কলুষ রাখা অপেক্ষা আশু আবশ্যক আর কি হইতে পারে ?

যুগে-যুগে যখনই ভারতের ধার্মিক ও আত্মিক শক্তির হ্রাস হইয়াছে, ভারত বিপন্ন হইয়াছে, তখনই ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ ভারতের মহাপুরুষগণ এই একই উপদেশ নবীন ভাবে ঘোষিত করিয়াছেন। উপনিষদে 'দাম্যত দত্ত, দয়ধ্বম্' রূপে এই বাণীই ঘোষিত। বুদ্ধদেব সর্বপাপ হইতে বিরতি, নিজ চিত্তের উন্নতি ও সকলের কুশলে আত্মনিয়োগ—এই রূপে এই বাণী প্রচার করিয়া যান। অপ্রমাদকে তিনিও অমৃত-পদ বলিয়া গিয়াছেন। শঙ্করের জ্ঞানের সাধনা অপ্রমাদযুক্ত চিত্তকে আশ্রয় করিয়াই হয়, দম ও ত্যাগ তো ইহার প্রথম সোপান। মধ্যযুগের ভক্তিবাদের মধ্যেও দম ও ত্যাগের দ্বারা আত্মশুদ্ধির, এবং অপ্রমাদের বা সত্যদৃষ্টির দ্বারা চিত্তশুদ্ধির শিক্ষা বিদ্যমান।

ভারতের তাবৎ সম্প্রদায়ের শিক্ষা এই-ই। তবে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ্য বিনয় বা মনঃশিক্ষার মধ্যে এই তিন গুণ অপেক্ষিত। বেদ, পুরাণ ও আগম—এই সকল বিভিন্ন শাস্ত্রকে একতাসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এমন একটী ভাবধারা বিদ্যমান, সে ভাবধারা হইতেছে ব্রাহ্মণ্যের ভাবধারা। বেদসংহিতার কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যুগে-যুগে নানা ভাবে বিদ্যমান এই ব্রাহ্মণ্যের ধারার মধ্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ নিহিত—এই আদর্শ লইয়াই আমরা জগতের সমক্ষে মস্তক উচ্চ করিয়া দাঁড়াইতে পারি।

ভূদেব আসিয়াছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দুকে আবার নূতন করিয়া এই ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ দেখাইতে, তাহাকে সে সম্বন্ধে সচেতন করিতে। ব্রাহ্মণ্যের আদর্শের একটা বড় দিক্ এই যে, আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহা সংসারকে একেবারে বর্জন বা উপেক্ষা করিতে চাহে না। বুদ্ধদেব-প্রচারিত বৈরাগ্য লইয়া চলিলে, জগৎ-সংসার বা মানব-সমাজ অচল হইয়া উঠে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের ফলে সমস্ত দেশ সংসার-ত্যাগী ভিক্ষু ভিক্ষুণীতে ভরিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ—আশ্রম-চতুষ্টয় ; ব্রাহ্মণ্যের উপাস্য—গৃহী উমাপতি শিব, শ্রীপতি বিষ্ণু। গৃহীর আশ্রম ব্রাহ্মণ্যের আদর্শে অবশ্যপালনীয়। পরিবারকে, স্ত্রী-পুত্র পরিজনকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের ব্যবহারিক প্রচেষ্টা। ব্রাহ্মণ গৃহস্থের আদর্শ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে ভূদেব চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও

হইয়াছিলেন। আধুনিক কালের ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনে এই প্রাচীন আদর্শ কি ভাবে কার্য্যকর হইতে পারে, ভূদেবের জীবন তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্থল।

দুইটী জিনিসের দ্বারা তাঁহার জীবনে এই আদর্শ যে সার্থক-ভাবে পালিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রথম—এই আদর্শ পালন দ্বারা বাড়ীর ভিতরে তিনি সকলের নিকট হইতে অনন্যলব্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আত্মীয় ও পরিজন সকলেই তাঁহার এই আদর্শে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন;—ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই আদর্শ সত্য-রূপে পালিত হইতে বাধা হয় নাই; ইহা একটী উপেক্ষা করিবার মত কথা নহে। ভূদেবের পুত্র-কন্যাগণ ও অন্য স্নেহাস্পদগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন, প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কেবল কর্তব্যবোধে এতটা হয় না; ভূদেবের যে সকল আত্মীয় তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপে এ বিষয়টী পরিস্ফুট হয়। ইহা কেবল প্রাচ্যদেশ-সুলভ গতানুগতিক গুরুজনের প্রতি ভক্তি মাত্র নহে। কথায় আছে—'যার সঙ্গে ঘর করি নাই সে বড় ঘরণী, যার হাতে খাই নাই সে বড় রাঁধুনী।' দূর হইতে মানুষকে চেনা যায় না, কাহাকেও স্বরূপে বুঝিতে হইলে তাহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করা চাই। আবার এ কথাও আছে—No one is a hero to his valet; এ কথা অবশ্য আদর্শ হইতে hero-র খাটো হওয়ার কারণে যেমন সম্ভব হয়, আবার তেমনি valet-এর hero-কে বুঝিতে পারিবার শক্তির অভাবেও সম্ভব হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে যাহারা আমার ভাল-মন্দ সব দিক্‌টা দেখিতে পায়, তাহাদের কাছে যদি আমি বড়ই থাকি, তাহা হইলে আমার মহত্ত্ব কিছু পরিমাণ স্বীকার করিতেই হয়। বাড়ীর বা দলের কর্তার মহত্ত্ব-প্রচার ব্যাপারে একটা dynastic বা domestic—একটা পারিবারিক বা ঘরোয়া বন্দোবস্ত থাকিতে পারে। এরূপও হইয়া থাকে যে, জীবনে মহাপুরুষের আদর্শ কার্য্যকর হইল না, আচারে-ব্যবহারে সেই আদর্শের কেবল অবমাননাই হইল—অথচ মহাপুরুষের নামটুকু কেবল exploit করা হইল, তাহা হইতে কেবল পার্থিব বা সামাজিক সুবিধাটুকু গ্রহণ করা হইল। কিন্তু কেবল ঘরোয়া চালাকির দ্বারা এইরূপ দেশব্যাপী ও দীর্ঘকালব্যাপী মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। বাহিরের লোকে আরও কিছু চায়। ভূদেবের নিকট হইতে বাহিরের লোকে তাহা পাইয়াছে। বাহিরের লোকে যাহা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহার আদর্শ-পরিপালনের সার্থকতার দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভূদেব বড় চাকুরী করিতেন, বাংলার শিক্ষাবিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল চাকুরী বজায় রাখেন নাই। তিনি তাঁহার চাকুরীকে দেশসেবার একটী উপায় বলিয়াই ভাবিতেন। এদেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্ত পাঠশালা ও ইস্কুলগুলিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় ও সেগুলির কার্য্য পরিবর্ধিত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে তিনি বিস্তারিত ভাবে অনুসন্ধান করিতেন, গভীরভাবে অনুশীলন করিতেন। তাঁহার কতকগুলি রিপোর্ট, আধুনিককালের উত্তর-ভারতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যতটা পারা যায় ততটা প্রচার করিতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন, আবার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, পিতৃপুরুষগণ হইতে লব্ধ অমূল্য রিক্‌থ, সংস্কৃত বিদ্যা, যাহাতে অধীত ও সংরক্ষিত হয়, তজ্জন্য আজীবন প্রয়াস করিয়াছিলেন, নিজ উপার্জনের একটী বৃহৎ অংশ তদুপলক্ষে দান করিয়া গিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতের হিন্দুদের সংস্কৃতি কেবল সংস্কৃতাশ্রয়ী হিন্দী ভাষার সহায়তায় বাঁচিতে পারে, তজ্জন্য বহু পূর্বে এ বিষয়ে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিহার ও সংযুক্ত-প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে শতকরা ৯০-এর উপর অধিবাসী হিন্দু, অথচ তাহাদের মধ্যে ব্যবহৃত কায়থী বা দেবনাগরী অক্ষর আদালতে গ্রাহ্য ছিল না; ভূদেব এই অনুচিত ব্যাপারের সংশোধনের জন্য যত্ন করেন, এবং তাঁহারই চেষ্টার ফলে বিহার-অঞ্চলে 'নাগরী-প্রচার' হয়, আদালতে কায়থী ও দেবনাগরীর আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; ভোজপুরিয়া গ্রাম্য কবি, দেহাতী বুলীতে ভূদেবের এই চেষ্টার সাধুবাদ করিয়া গান বাঁধিয়া গিয়াছেন, সে গান স্যর্ জ্যর্জ গ্রিয়ার্সন সংগ্রহ করিয়া স্বরচিত ভোজপুরিয়া ভাষার ব্যাকরণে ছাপাইয়া দিয়াছেন। দেশে শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষার সুনিয়ন্ত্রণের জন্য ভূদেব যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রবহমাণ কার্য্যস্রোতের মধ্যে পড়িয়া, কাল-ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে, সরকারী কাগজ-পত্রের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের কথা আমরা সকলেই জানি, কারণ এই ব্যাপারের মধ্যে লোক-চক্ষে একটা চমক-প্রদতা আছে। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিতে-করিতে শিক্ষা-সংস্কারের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বাঙ্গালীর সংস্কৃত ও অন্য বিদ্যা শিক্ষা কতটা সরল, সহজ ও কার্য্যকর হইয়াছে, তাহার খবর কে রাখিত? শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শ্রমশীল ঐতিহাসিক, পুরাতন নথী-পত্র ঘাঁটিয়া সে সব কথা বাহির করিয়া আমাদের গোচরে না আনিলে, আমরা সে বিষয়ে অজ্ঞই থাকিয়া যাইতাম—সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের আড়ালে শিক্ষা-নেতা বিদ্যাসাগর চিরকালই গুপ্ত

থাকিতেন। ভূদেব-সম্বন্ধে এই সব কথার কিছু আভাস তাঁহার উপযুক্ত পুত্র-কর্তৃক রচিত জীবন-চরিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা আবশ্যক।

শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে ও প্রাচীন সংস্করণ-কল্পে ভূদেব যাহা করিয়া গিয়াছেন, তদ্ভিন্ন মানুষের দুঃখমোচনের জন্য তিনি যে দান, যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার কল্যাণব্রত ও তাঁহার আদর্শের উদ্‌যাপন ঘরের বাহিরেও কি ভাবে হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। তাঁহার কর্মজীবনে দান—বিশেষতঃ গোপন দান—একটী লক্ষণীয় আচরণ ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার সাধ্বী পত্নীর সহযোগিতা উল্লেখ করিতে হয়। নিজ বাসস্থানে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপার্জন কেবল নিজের ও নিজের পরিজনের জন্য ছিল না—পরিবার-বহির্গত আর্ত ও দুঃস্থেরও তাহাতে অধিকার আছে, এ বোধ তাঁহার ব্রাহ্মণ্য আদর্শ হইতে তিনি পাইয়াছিলেন; এবং ইহার দ্বারাই তাঁহার অর্থোপার্জন করা সার্থক হইয়াছিল, অর্থোপার্জন তাঁহার সম্মুখে সদা রক্ষিত উচ্চ আদর্শের অনুসারীই ছিল।

ভূদেব যে আদর্শ নিজে পালন করিতেন ও নিজ লেখায় যাহাকে চিরস্থায়ী সাহিত্যিক রূপ দান করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শের কয়েকটী বিশিষ্ট দিক্ বা লক্ষণ আলোচনা করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিব। এই আদর্শ, উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দুর এই ভীষণ আপৎকালে, কতদূর পালিত হইতে পারে, এবং পালন করিলে তাহা কি ভাবে জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে, তাহা সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

ভূদেবের আদর্শের মধ্যে একটী জিনিস সব চেয়ে বেশী করিয়া চোখে ঠেকে—সেটী হইতেছে তাঁহার অন্তর্নিহিত আত্মমর্য্যাদা-বোধ। এই আত্ম-মর্য্যাদার জ্ঞান, ব্রাহ্মণ্যের একটী প্রধান বাহ্য প্রকাশ। ইহা সমীক্ষা এবং আত্মদমনের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা আভ্যন্তর সাধনার এবং শক্তির ও তেজের পরিচায়ক। এইরূপ আত্মমর্য্যাদা-বোধ মানুষকে মাথা তুলিয়া নিজ মহিমায় দাঁড়াইতে শিক্ষা দেয়, ইহার সমক্ষে inferiority complex বা আত্মলাঘব-ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। যেখানে সত্যকার সাধনা ও কৃতিত্ব, সেইখানেই শক্তি, সেইখানেই সেই শক্তির সত্তায় নির্ভীকতা থাকে। ভূদেব নিজের জাতির সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন; প্রথমতঃ তাঁহার পিতার প্রসাদে, ও পরে অনুশীলন দ্বারা হিন্দুজাতির কৃতিত্ব কোথায় তাহা

তিনি ভাল করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু প্রতীচ্য বিদ্বৎসভায় তিনি সহজেই তুল্য আসনে বসিতেন। এই আত্মমর্য্যাদার ফলে তিনি একটা urbanity বা মনঃসম্বন্ধীয় নাগরিকতা বা ভব্যতার অধিকারী হইয়াছিলেন—তাঁহার মধ্যে গ্রাম্য সঙ্কোচ বা অভব্যতা ঠাঁই পায় নাই। যেখানে বিদেশীর কৃতিত্ব, সেখানে সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে তাঁহার দ্বিধা হয় নাই; আবার যেখানে আমাদের যথার্থ গৌরব বা আমাদের সুবিবেচনার প্রমাণ আছে,—সেখানে বিদেশের একপত্রিগণের মত প্রতিকূলে হইলেও পরম আত্মনির্ভরতার সহিত তিনি স্থির থাকিতেন। 'তেরা দরবার শাহানা, মেরী সুরৎ ফকীরানা'—এই বলিয়া ইউরোপের ঐশ্বর্য্য ও শক্তির ঔজ্জ্বল্যে আত্মহারা হইয়া, নিজের জাতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকেও বিকাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভূদেবের সমগ্র জীবনে, এবং তাঁহার সমগ্র লেখায়, এই গুণটী ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান। হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে শ্লেষ করিয়া বালক ভূদেবকে বলিয়াছিলেন—'পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল—কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা এ কথা স্বীকার করিবেন না।'—সে শ্লেষপূর্ণ উক্তি ভূদেব মাথা পাতিয়া লন নাই—পিতার নিকট হইতে এ বিষয়ে হিন্দুজাতির প্রাচীন মত কি তাহা জানিয়া লইয়া, যথাকালে শিক্ষকের গোচরে আনিয়া, তাঁহার ত্রুটী স্বীকার করাইয়া তবে স্থির হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার ভূদেবের সহপাঠী মধুসূদনের মত উদার-হৃদয় কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; জাতীয় মর্য্যাদাবোধ-সম্পন্ন প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে ভূদেবের বাল্য-জীবনের এই ঘটনা আকৃষ্ট করিবে।

হিন্দুজাতির কৃতিত্ব সম্বন্ধে ভূদেবের যে ধারণা ছিল, হয় তো সে ধারণার সঙ্গে এখন আমাদের সকলের ধারণার মিল হইবে না; হিন্দু সভ্যতার পত্তন ও ইহার আপেক্ষিক বয়ঃক্রম সম্বন্ধে এবং ইহার সৃজন ও পরিবর্ধনে আর্য্য ও অনার্য্যের সাহচর্য্যের কথা লইয়া আমাদের কেহ-কেহ হয় তো নবীন, এবং ভূদেবের সময়ে অজ্ঞাত, মত পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা হইলেও, একটী প্রাচীন ও সুসভ্য জাতি, যে জাতির সংস্কৃতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া বংশপরাম্পরা-ক্রমে চলিয়া আসিতেছে, সেই জাতির ঘরের ছেলেরই মত তিনি আধিমানসিক বিষয়ে আচরণ করিতেন। হিন্দু আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধেও তাঁহার আস্থা ও বিশ্বাস প্রগাঢ় ছিল, এখানে তাঁহার পক্ষে আত্মাভিমান-সম্পন্ন হওয়া বিশেষ ভাবে স্বাভাবিক ছিল।

আজকাল আমরা এই আত্মমর্য্যাদা-বোধ হারাইতে বসিয়াছি। জাতির প্রাচীন প্রতিষ্ঠাকে একেবারে বর্জন করার ফলে, অথবা তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বনের

ফলেই বহু স্থলে ক্রটী ঘটিতেছে। বাহ্য-জীবনে থাকিবার ঘর আমরা যেমন ফিরিঙ্গীদের পরিত্যক্ত শস্তা আসবাবে ভরতী করি, নিজেদের হাস্যাস্পদ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি, মনোজগতে তেমনি ইউরোপের পরিত্যক্ত বুলি এবং ইউরোপের অসমাপ্ত প্রয়াস লইয়া, পরম ও চরম পদার্থ পাইয়াছি ভাবিয়া অশোভন মাতামাতি করি—একটু চিত্তস্থৈর্য্যের ও ধৈর্য্যের সঙ্গে বস্তুটী বা অবস্থাটী বুঝিবার চেষ্টা করি না। এ বিষয়ে ভূদেবের দৃষ্টান্ত ও তাঁহার শিক্ষাকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আত্মমর্য্যাদা-বোধের সঙ্গে-সঙ্গে স্বাজাত্য-বোধ এবং স্বজাতি-প্রীতি ভূদেবের চরিত্রের একটী বড় কথা। আজকাল একটু উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ ভাগ্যবান্‌দের মধ্যে দেখা যায় খাঁটী বাঙ্গালী ভাবে, হিন্দু ভাবে জীবন-যাপন করা যেন লজ্জার কথা, ঘরের মধ্যেও তাঁহারা international হইতে চাহেন। যিনি যত বড়, তাঁহার চাল-চলনও ততটা তাঁহার জাতি ও সমাজের বিশিষ্ট চাল-চলন হইতে পৃথক্। নিজের জাতির নিকট হইতে ও নিজের সমাজের পারিপার্শ্বিক হইতে পলাইয়া গিয়া যেন ইঁহারা বাঁচেন। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, কলিকাতার ও অন্য কোন-কোনও স্থলের সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী, দেশের বুকের মধ্যে বাস করিয়াও সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিজের দেশের মাটি হইতে আপনাদিগকে deracine বা মূলোৎখাত করিয়া ফেলিয়াছেন ও ফেলিতেছেন। এই যে স্বজাতি ও স্বশ্রেণীর লোকদিগকে কার্য্যতঃ বর্জন করা, ইহার মধ্যে কতটা ভাবদৈন্য, কতটা প্রচ্ছন্ন আত্মাবনতি বিদ্যমান, তাহা আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। আমাকে জনৈক ভিন্ন-প্রদেশীয় উচ্চপদস্থ হিন্দু ভদ্রব্যক্তি, আমাদেরই একজন বাঙ্গালী ভাগ্যবান্ হিন্দু গৃহস্থ-সন্তানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, একবার উক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণের সম্ভাবনা ঘটায় বাঙ্গালী হিন্দুসন্তানটী তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—I hope you are not orthodox, because I do not keep any Hindu servants। অবশ্য অনেক superior বা উচ্চশ্রেণীর উদারচেতা ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা পারিবারিক জীবনেও জাতি এবং ধর্মভেদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। আমরা মাটী ছুঁইয়া চলি, আমাদের মধ্যে সে ঔদার্য্য আসিবে না। কিন্তু উক্ত বিভিন্ন-প্রদেশীয় ভদ্রব্যক্তিটীর স্বরে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে আমার স্বজাতীয় ভাগ্যবান্ পুরুষদের কাহারও-কাহারও আন্তর্জাতিকতার বহর এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখিয়া আমাকে অধোবদন হইতে হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া তো শিখিই না, ঠেকিয়াও শিখি না; এবং আমরা

এমনই সুবিধাবাদী হইয়া পড়িতেছি যে ক্ষণিক সাশ্রয় বা লাভ হইবে বলিয়া নিজেদের বিকাইয়া বা বিলাইয়া দিতেও প্রস্তুত থাকি।

ভূদেবের মত স্বাজাত্য-বোধ না আসিলে, বাঙ্গালী হিন্দুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ভূদেবের এই শিক্ষাকে বিশ্বাসীর কাছে গুরু-দত্ত উপদেশ বা দীক্ষামন্ত্র যেমন, সেইভাবে জীবনে কার্য্যকর করিয়া তুলিবার সময় এখন আসিয়াছে।

ভূদেবের আদর্শের দ্বিতীয় কথা—আচারনিষ্ঠতা। হিন্দুর জীবন বাহ্য বা ব্যবহারিক দিকে যে সকল চর্য্যা ও অনুষ্ঠান এবং বিধি ও নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আছে, ভূদেব সেগুলির উপযোগিতায় পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। দেশের জলবায়ু ও দেশের লোকের প্রকৃতি অনুসারে যে আচার দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে হিতকর, ভূদেব বিশ্বাস করিতেন সেই আচারই শাস্ত্রে লিপি-বদ্ধ হইয়া আছে, এবং দেশের পুঞ্জীভূত, বহুসহস্রবর্ষ-ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল-স্বরূপ সেই আচার অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রে নিহিত বিধি-নিষেধ পালন করিয়া চলিলে, ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। এখন সুবিধাবাদী আধুনিক জীবনের সঙ্গে আচারনিষ্ঠতা তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না বলিয়াই প্রধানতঃ আমরা আচার-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। এক প্রকার আচারের পরিবর্তে অলক্ষ্যে আমরা বহু স্থলে আবার অন্য প্রকারের আচারের নিগড়ে আমাদের বদ্ধ করিয়া থাকি। একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভূদেবের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের অবস্থা যাহা ছিল, এখন তাহা বদলাইয়া পূর্বাপেক্ষা অন্য প্রকারের হইয়া গিয়াছে। ১৮৩৪ সালে যে আচারনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল, ১৯৩৪ সালে তাহা পূর্ণ ভাবে পালিত হওয়া সম্ভবপর নহে। যুগে যুগে সামাজিক বিধি-নিষেধ পরিবর্তিত হয়। আমাদেরও এ বিষয়ে আবশ্যক মত পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ভূদেব এখন জীবিত থাকিলে, এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতেন। নিত্য-ধর্ম তাঁহার কাছে লৌকিক-ধর্ম অপেক্ষা বড়। আতিথ্যকে আচার-নিষ্ঠতা অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিবার শিক্ষা তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে লাভ করেন। হরিজন-আন্দোলন ভূদেবের সময়ের কথা না হইলেও, তাঁহার পিতা এ বিষয়ে কতটা যে উদার ছিলেন, তাহা ভূদেবের মুসলমান ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বৃদ্ধ পিতার ব্যবহারে বুঝা যায়; ঐ ছাত্রেরা বাড়ীতে আসিলে, তিনি তাহাদের জলপানের

জন্য পৃথক্ পিতলের গেলাস ও রেকাবী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশ্য এই ভদ্রতার পিছনে ব্রাহ্মণের যে আচার-নিষ্ঠা ও যে জাত্যভিমান বিদ্যমান ছিল, তাহা আজকালকার দিনে আমাদের পক্ষেও মানিয়া লওয়া কঠিন হয়, এবং তাহাতে সাত্মাভিমান বা অন্য অহিন্দু হয় তো তৃপ্ত হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্রের সীমাকে অস্বীকার করিলে তো চলিবে না।

এখন হিন্দু সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে স্পর্শদোষের আতিশয্য আর থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। বিবেকানন্দ ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। জাতির গোঁড়ামি—বিশেষ ছোঁয়া-লেপায় এবং খাওয়া-দাওয়ায়—ধরিয়া রাখিতে গেলে, হিন্দুয়ানী এবং হিন্দুজাতি টিঁকে না; হয় জাতির গোঁড়ামি অর্থাৎ স্পর্শদোষ যাইবে,—নয় হিন্দু জাতি যাইবে, এবং উহার সহিত স্পর্শদোষেরও সহমরণ ঘটিবে। নানা ব্যাপার দেখিয়া ইহাই আমার মনে হয়। এখন ভূদেব বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার মত কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থার এবং তদনুসারে মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তন দেখিয়া, লোকাচার বা সমাজ অনুসরণ করিয়া, শাস্ত্রও বদলাইতেছে।

ভূদেবের জীবনে প্রধান শিক্ষা তিনি তাঁহার পারিবারিক-প্রবন্ধে এবং সামাজিক-প্রবন্ধে লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম বইটীতে সমাজ-জীবনের ব্যষ্টি-স্বরূপ পরিবারের সুনিয়ন্ত্রণ-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই; দ্বিতীয় বইটী, জাতি ও সমাজের সমষ্টি-গত জীবন সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার ফল। যে ধরণের পরিবারের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, যাহার কথা তিনি মুখ্যতঃ আলোচনা করিয়াছেন, সেটী হইতেছে বাঙ্গালা দেশের আত্মীয় ও কুটুম্ব-বহুল, চতুর্দিকে প্রসারিত, বাঙ্গালী হিন্দু যৌথ পরিবার। এই পরিবারের গড়নে এখন ভাঙ্গন ধরিয়াছে;—ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ও প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে পিতা মাতা পুত্র পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী পিতৃষ্বসা ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদি বহু পরিজনময় যৌথ পরিবারের পবিবর্তে, স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাময় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইতেছে; ভূদেব কিন্তু এই ভাঙ্গা যৌথ পরিবার, আধুনিক ধরণের শহরের ফ্লাট্-বাসী পরিবারের কথা ধরেন নাই। কিন্তু আমাদের আধুনিক পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিস্তর পরিবর্তন আসিয়া গেলেও, ভূদেবের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা পরিবারের পরিচালন বিষয়ে প্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে পারি। গার্হস্থ্য জীবনকে সুখময় করিতে সহায়তা করিবার জন্য এই বইয়ের উপযোগিতা এখনও আছে। লোকচরিত্রের সহিত, এবং পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের উদ্দেশ্য ও ভাবের সহিত ভূদেব এই বইয়ে

গভীর পরিচয়ের নিদর্শন দিয়াছেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী মূল্যবান প্রামাণিক বই ; সাহিত্যের সহিত জীবনের বিশেষ সংযোগ আছে বলিয়া, এবং এই বইয়ে সত্য-দর্শনের সঙ্গে জীবনেরই কথা আছে বলিয়া, ইহা যথার্থ-সাহিত্য-পদ-বাচ্য।

পারিবারিক জীবনকে ভূদেব অতি পবিত্র বোধ করিতেন। সেই কারণে এবং মুখ্যতঃ বোধ হয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দুঘরের ছেলে বলিয়া, তিনি বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান অনুমোদন করিতে পারেন নাই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ঘরে এ বিষয়ে তাঁহার আপত্তি না থাকিলেও, তাঁহার মতে আভিজাত্য-সম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুঘরে বিধবা-বিবাহ হওয়া অনুচিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার মতানৈক্য ছিল। এ ক্ষেত্রেও বলিতে হয়, ভূদেব পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে অবস্থিত বিশুদ্ধ আদর্শের প্রতি এরূপ নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিলেন যে, নিম্নে পৃথিবীর উপরে কি হইতেছে বা হইতে পারে, সেদিকে দেখিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। ভূদেবের সময়ে বিধবা-বিবাহ হিন্দু-সমাজের একটা গুরুতর সমস্যা-রূপে দেখা দেয় নাই। এখন হিন্দু-সমাজের সমক্ষে নূতন অনেকগুলি সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে। বিষয়-কর্মের ও অর্থাগমের অভাব ঘটিতেছে বলিয়া বহু শিক্ষিত যুবকের বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করার সঙ্কল্প ; নির্মম হৃদয়হীনতার সহিত পণ-প্রথার প্রসার ; বহু পিতা কর্তৃক বাধ্য হইয়া, কন্যাদের স্বীয় আজীবিকার জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রেরণের উদ্দেশ্যে, স্কুল ও কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা ; 'সহশিক্ষা'-র প্রসার লাভ, অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার ও "বন্ধুত্ব"র সুযোগ, এবং তাহার আনুষঙ্গিক, নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা ; পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বা পুরুষদের সঙ্গে, মেয়েদের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ ; ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ে কোনও সমাধান বা সমাধানের ইঙ্গিত ভূদেবের রচনায় মিলিবে না, কারণ তাঁহার যুগে এগুলি বাঙ্গালীর জীবনে প্রকটিত হয় নাই। কিন্তু এই সব বিষয়ে তাঁহার মনের ভাব (আজকালকার অনেকের মত) যে অন্ধ-ভাবে রক্ষণশীল হইত না, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পারিবারিক-প্রবন্ধে ভূদেব যেমন আমাদের সমাজের ও ঘরের কথা বলিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলার ক্ষেত্রে কোনও খুঁটিনাটি বিষয়ের বাদ দেন নাই, সামাজিক প্রবন্ধে তিনি একটু ব্যাপক ভাবে বাহিরের কথা শুনাইয়াছেন। এই বইখানিও পড়িয়া এখন আমরা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিতে পারি, সামাজিক ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে ইহা হইতে কতকগুলি প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শন পাইতে পারি। এ

বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তবে ভূদেবের ঈপ্সিত ভারতীয় nationalism বা জাতীয়তা সম্বন্ধে একটী কথা আমার মনে লাগে, এবং সেই কথাটী বিশেষ করিয়া প্রণিধানের যোগ্য। সংস্কৃতি-বিষয়ে বাঙ্গালী ভূদেব হইতেছেন পুরাপুরি ভারতীয়,—আধুনিক একদল বাঙ্গালী লেখক, সংস্কৃতি-বিষয়ে 'ভারত-বনাম-বাঙ্গালা'র যে বুলি ধরিয়াছেন, ভূদেব সে পথের পথিক ছিলেন না। আমাদের অনেকের কাছে, বিরাট্ বিশাল হিমাদ্রিবৎ ও মহাসাগরবৎ সুবিস্তৃত ভারতীয় সভ্যতা ও মনোভাবের সমক্ষে, তাহারই অংশীভূত এই বাঙ্গালীয়ানার বড়াই অত্যন্ত বিসদৃশ, এবং অজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়া লাগে। ভারতের সনাতন আত্মা আমাদের সাত-আট শত কি হাজার বৎসরের বাঙ্গালীত্বের চেয়ে অনেক বড় জিনিস। আমাদের বাঙ্গালীত্বের পিছনে পট-ভূমিকা স্বরূপে বিদ্যমান, ইহার আধার ও প্রতিষ্ঠা স্বরূপে অবস্থিত প্রাচীন মুসলমান-পূর্ব যুগের হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন) সংস্কৃতি ও সাধনা। বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক সংস্থানও যেন এই বিষয়েরই ইঙ্গিত করিতেছে—বাঙ্গালা দেশ গঙ্গার দান, যে গঙ্গার উৎপত্তি উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের ক্রোড়-মধ্যে গঙ্গোত্তরীতে—যে গঙ্গা উত্তর-ভারতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত; প্রয়াগে যে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিধার মিলন হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে সেই যুক্ত ত্রিবেণী মুক্ত হইয়া, বাঙ্গালার নদীবহুল সমতট-ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর-ভারতের সংস্কৃতি, উত্তর-ভারতের প্রাকৃত ভাষা—বাঙ্গালায় আসিয়া, এখানকার জলবায়ুর গুণে ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া, পরন্তু তাহার মূল ভারতীয় প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বাঙ্গালা দেশের প্রাদেশিক সংস্কৃতিতে, বাঙ্গালা ভাষায় পরিবর্তিত হইয়াছে। উত্তর-ভারতের সঙ্গে যোগ আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে বা ভুলিতে পারি না। অবস্থা-বৈগুণ্যে এখন আমরা বাঙ্গালার বাহিরের, অন্য প্রদেশের লোকের হাতে নিজের ঘরের মধ্যেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি—তাহারা আসিয়া আমাদের বাড়া-ভাতে ভাগ বসাইতেছে। এখন বাহিরের লোকদের শোষণ হইতে আমাদের আত্মরক্ষা করিতে হইবেই; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে অস্বীকার করিয়া কোনও লাভ নাই। উত্তর-ভারত হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া, 'আমরা খাঁটী বাঙ্গালী, আমরা পৃথক্ "আত্মবিস্মৃত" জাতি, আমাদের সব বিষয়েই ভারতের অন্য প্রদেশের জাতি-সমূহ হইতে একটা বৈশিষ্ট্য ও একটা শ্রেষ্ঠতা আছে',—ইত্যাদি চীৎকার, কতকটা যে ঘর সামলাইয়া লইবার চেষ্টা হইতে উদ্ভূত, কতকটা যে ঘরের কুমীরের ভয়ে জাত, ইহা বুঝিতে দেরী লাগে না। ভূদেবের সময়ে এ সমস্ত কথা উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন ভারতীয় সংস্কৃতির

ইতিহাসে অনার্য্য-বাদ আসে নাই, হিন্দু-সন্তান মাত্রেই আর্য্যামির স্বপ্ন রচনা করিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে আর্য্য-গরিমার চিন্তায় বিভোর ছিল। এবং বাঙ্গালী তখন 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'ও হয় নাই, তখন সামান্য দুই-পাতা ইংরেজী পড়িয়া বাঙ্গালী ইংরেজের তল্পীদার সাজিয়া উত্তর-ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়া 'বৃহত্তর বঙ্গ' (!) সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত ছিল। বিচার করিয়া দেখিলে এই 'বৃহত্তর বঙ্গ' সৃষ্টিতে তাহার কোনও গৌরব নাই। 'অখণ্ড বা অখিল ভারত'—এই বোধ, বঙ্কিম-ভূদেব-হেমচন্দ্র-রঙ্গলাল-রমেশচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রমুখ ভাবুক ও মনীষীদের হাতে, বিগত শতকের চতুর্থ পাদে ধীরে-ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে—ভারত তথা বাঙ্গালার সংস্কৃতির দিক্ হইতে এই বোধ একটী বড় সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহারিক বা বাস্তব জীবনে আমাদের স্বার্থকে বাহিরের বা অন্য প্রদেশের চাপের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না—প্রাণ দিয়া বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিব; কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালা যাহার অংশ মাত্র, সেই ভারত—সেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না।

পরিবার হইতে সমাজ, সমাজ হইতে রাষ্ট্র—এই সমস্ত বিষয়ে ভূদেব আমাদের শ্রোতব্য কথা শুনাইয়াছেন। বহুস্থানে ভূদেবের চিন্তা বা উক্তি এখন ভবিষ্যদ্বাণীর মত শুনায়। সামাজিক প্রবন্ধের বহু অংশ শ্রেষ্ঠ বিচার এবং বিবেচনার ফল। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ছোট কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৯২ সালের পূর্বেই তিনি সমগ্র ভারতের একতার অন্যতম সাধন-স্বরূপ হিন্দী ভাষার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তখন খুব অল্পসংখ্যক লোকই এদিকে অবহিত হইয়াছিলেন।

নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, ভূদেবের আদর্শ—অন্ততঃ ইহার কোন-কোন অংশ—এবং তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশের যৌক্তিকতা ও উপকারিতা, আমাদের সমাজের পক্ষে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ভূদেবের প্রবন্ধাবলী ও তাঁহার পত্রাদি হইতেও কিছু-কিছু চয়ন করিয়া, তাঁহার চত্বারিংশ শ্রাদ্ধ-বাসরের স্মারক স্বরূপ একটী ভূদেব-বাণীময় পুস্তক আধুনিক কালের তরুণ-তরুণীদের পাঠের জন্য প্রকাশিত করিলে, এবং তাহা পাঠে ইহাদের প্ররোচিত করিলে, ফল ভাল হইতে পারে।

বিবেকানন্দের মত তূর্য্যধ্বনি করিয়া সুপ্ত হিন্দুসমাজকে ভূদেব জাগ্রৎ করিবার চেষ্টা করেন নাই,—তাঁহার ছিল বৃদ্ধ জ্ঞান-তাপসের স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠ। বিবেকানন্দের অগ্নিময় বাণী এবং ভূদেবের বাণীর স্থির জ্যোতি—ভারতীয় হিন্দুর জাতীয় জীবনে উভয়েরই আবশ্যকতা আছে। ভূদেবের বাণী আমাদের বলিতেছে

—আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জানো, নিজের প্রতি বিশ্বাস আনো, নিজের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করো। ভগবানের আশীর্বাদে ভূদেবের শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের এই বড় দুর্দিনে যেন কার্য্যকর হয়, যেন আমরা এই শিক্ষা পালন করিয়া জাতি-হিসাবে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি।

বৃহত্তর বঙ্গ

"বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটী আজকাল আমরা খুবই ব্যবহার করিতেছি। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের "প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্য সম্মেলন"-এর যে সকল অধিবেশন হইতেছে, সেগুলিতে "সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান" শাখা ভিন্ন, উপরন্তু একটী "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখাও স্থান পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন, পত্র-পত্রিকাতেও "বৃহত্তর বঙ্গ"কে হালের বাঙ্গালীর অন্যতম গৌরব বলিয়া আমরা নানা জল্পনা-কল্পনা, উচ্ছ্বাস-আলোচনা করিতেছি। কথাটা কিন্তু বেশী দিনের নহে। আমার মনে হয়, ১৯২৬ সালে ভারতের বাহিরের দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচারের ইতিহাস আলোচনার উদ্দেশ্যে যখন কলকাতায় "বৃহত্তর ভারত পরিষৎ" স্থাপিত হয়, তাহার পরে "বৃহত্তর ভারত"—এই সংযুক্ত পদ দুইটীর দেখাদেখি "বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটীও ব্যবহৃত হইতে থাকে। আগে আমরা "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" জানিতাম, "প্রবাসী বাঙ্গালী" জানিতাম। ১৯০০ সালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে "বৃহত্তর বঙ্গ" শব্দদ্বয় ও তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাব দুর্বোধ্য হইত; ১৮৫০ সালের বাঙ্গালীর পক্ষে কথাটী ও তাহার অর্থ উভয়ই অবোধ্য লাগিত। অথচ এই কয়েক বৎসরে এই কথাটী হালের বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গৌরববোধ, আত্মপ্রসাদ ও শক্তিসংগ্রহের (এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মবঞ্চনার) একটা মস্ত বড় সহায়ক হইয়া পড়িতেছে।

জিনিসটা আমাদের তলাইয়া বুঝা দরকার।

"বৃহত্তর বঙ্গ"—এই কথাটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ এই—ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে, অর্থাৎ অ-বাঙ্গালী যাহারা বাঙ্গলা ভাষা বলে না, এমন লোকেদের মধ্যে, ব্যক্তি-গত বা সমাজ-গত ভাবে আজীবিকা-সংগ্রহের চেষ্টায় বা অন্য উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীরা গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বসবাস-

কালে যে সকল কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব-বর্ধন করিয়াছে, মুখ্যতঃ সেই কৃতিত্বের বিচার, এবং সেই কৃতিত্ব-জনিত আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক শক্তির আবাহন। সঙ্গে-সঙ্গে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীদের সুখ-দুঃখের, আশা-আশঙ্কার ও বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতির আলোচনা, ও যথাযথ ইহাদের বিবর্ধন বা প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়া, প্রবাসী বাঙ্গালীদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষা করা, তথা আধুনিক ভারতের জাতিবৃন্দের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্থানকে গৌরবের ও সম্মানের স্থান করিয়া রাখা।

সন ১৩০৮ সালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন প্রয়াগ হইতে "প্রবাসী" পত্রিকা বাহির করেন, তখন হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী বা বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত জনগণ একটু বেশী করিয়া সচেতন হইতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে "প্রবাসী" পত্রিকার মারফৎ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়, "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" শীর্ষক জীবন-চরিতাত্মক প্রবন্ধাবলীতে যে সব কৃতী বঙ্গ-সন্তান বিগত দুই পুরুষ ধরিয়া (এবং ক্বচিৎ তাহার পূর্বেও) বাঙ্গালার বাহিরে পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে গিয়া স্বীয় বিদ্যা- ও চরিত্র-গুণে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হন, ধারাবাহিক ভাবে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের নিকটে তাঁহাদের সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সুপরিচিত "বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকের দুইটী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে—এই বইয়ের দ্বারা বৃহত্তর বঙ্গের বোধ বাঙ্গালী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা খুবই বাড়িয়া যাওয়ায়, পশ্চিমের দূরতম প্রদেশ মাত্র দুই-এক রাত্রির, ক্বচিৎ তিন-চারি রাত্রির রেল-ভ্রমণের পথে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে প্রবাসী বাঙ্গালী আর সত্য-সত্য প্রবাসী থাকিতেছেন না, দেশের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতর যোগ রাখা সম্ভবপর হইতেছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা—প্রাচীন ভারতের নাবিক, বণিক্, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, শিল্পী ও সাধারণ ব্যক্তি—ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া, ধর্ম ও সভ্যতায় সেই সব দেশে এক অভিনব বৃহত্তর ভারতের পত্তন করিয়াছিলেন। "বৃহত্তর ভারত", ভারতের এক গৌরবময় অবদান। ইহারই অনুকরণে "বৃহত্তর-বঙ্গ", এই ভাবময় সমস্তপদের সৃষ্টি। "বৃহত্তর ভারত"—মুসলমান-পূর্ব ভারতের কৃতিত্বের

পরিচায়ক ; ব্যাপক-ভাবে, আধুনিক ভারতের প্রসারের কথাও ইহার মধ্যে নিহিত। "বৃহত্তর বঙ্গ"—মুখ্যতঃ উনবিংশ শতকে ভারতের অন্য প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা।

এখন, এই কয় বৎসর ধরিয়া "বৃহত্তর বঙ্গ" লইয়া আমরা একটু বেশী সাত্মাভিমান হইয়া পড়িয়াছি। ইহার দুইটী কারণ আছে। এই কারণ দুইটী প্রবাসী বাঙ্গালী ও ঘরবাসী বাঙ্গালী উভয়েরই মধ্যে পরিদৃশ্যমান।

প্রথমতঃ—বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই বাঙ্গালী যেমন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর অবস্থা তেমনই (কোথাও কম কোথাও বা বেশী) খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে বঙ্গের বাহিরে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীর যে সম্মান, যে প্রতিষ্ঠা ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। অনেক ক্ষেত্রে আবার বাঙ্গালীর সম্মানপূর্ণ অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালী আর ইংরেজ সরকারের প্রিয়পাত্র নহে ; ইংরেজের আশ্রয়ে উন্নতি-প্রাপ্ত বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালার বাহিরের বহু স্থানের লোকদের মনে যে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষ্যা ছিল, তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ফলে, রাম এবং রাবণ উভয়েরই হাতে তাহার লাঞ্ছনা। এ ক্ষেত্রে উচ্চ পদের প্রতিষ্ঠা এবং সম্ভবতঃ অর্থের প্রতিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত প্রবাসী বাঙ্গালীকে নৈতিক প্রতিষ্ঠায় অটল থাকিতে হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অন্ন-সংস্থানের জন্য, অর্থোপার্জনের জন্য, বাঙ্গালার বাহিরে গিয়াছিল সত্য ; কিন্তু ইহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদের কারণ যে, যে-যে স্থানে চিরতরে সে বাসা পাতিয়াছে, সেই-সেই স্থানে শিক্ষা ও মানসিক সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য সে অনেক কিছু করিয়াছে। ইহা তাহার জাতির পক্ষে গৌরবেরই কথা। এই ইতিবৃত্তের আলোচনা ও অনুশীলন তাহাকে যথেষ্ট শক্তি দিতে পারে। এই জন্য বৃহত্তর বঙ্গের চর্চা।

দ্বিতীয়তঃ—বাঙ্গালা দেশের মধ্যে আমাদের ভিতরে একটা পরাজয় ও পরাভবের হাওয়া বহিতেছে। সকলেরই মনে এই ভাবটী অল্প-বিস্তর জাগরিত হইতেছে যে—আমাদের অবস্থা বনের হরিণের মত—"হরিণ জগতবৈরী আপনার বাসে।" বাঙ্গালাকে সকলে মিলিয়া লুঠিতেছে, আমরা দেখিয়াও তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছি না। অন্য বিষয়েও আমরা হটিয়া পড়িতেছি। আমাদের এখন অর্থনৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সব রকমের আশ্রয় আবশ্যক হইয়াছে। "বৃহত্তর বঙ্গ" আমাদের একটী বড় আধ্যাত্মিক আশ্রয়। দৈব-দুর্বিপাকে পড়িয়া

খাওয়ায়, এখন আমাদের কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। হাতী পাঁকে পড়িলে, বেঙেও তাহাকে লাথি মারিয়া যায়। আমরা অতীতে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছি; যখন হইতে ভারতে ভারতীয় এবং প্রাদেশিক জাতি-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তখন হইতে বাঙ্গালী ভারতের অন্য জাতিদের পশ্চাতে কখনও থাকে নাই। "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর"—বঙ্গ-মাতাকে আমরা আত্মবিশ্বাসপূর্ণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে একথা বলিতে পারি। "বৃহত্তর বঙ্গ" বাঙ্গালীর অধুনাতন কৃতিত্বের একটী লক্ষণীয় নিদর্শন, ইহার চর্চায় আত্মবিশ্বাস আসিবে, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুঝিবার শক্তি আমরা পাইব,—সমগ্র বাঙ্গালী-জাতি হিসাবে এই শক্তি পাইব।

বাহিরে ও ভিতরে, অন্য প্রদেশে ও বঙ্গদেশে, "বৃহত্তর বঙ্গ"-বাদ আমাদের কতটা শক্তি দিতে পারে, আমাদের বাঙ্গালী-জীবনে কি ভাবে ইহাকে সার্থক করিতে পারা যায়—তাহার আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু এই আলোচনা ঐতিহাসিক বিচার দিয়া আরম্ভ না করিলে বিশেষ কিছু ফল হইবে না।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা করিতে গেলে, তিনটী কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সে তিনটী কথা এই—

[১] বাঙ্গালা-দেশ ভারতেরই অংশ।

[২] বাঙ্গালী জাতি ভারতীয় জাতি-মণ্ডলীরই অন্তর্ভুক্ত, ভারত-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তা তাহার নাই।

[৩] বাঙ্গালার সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিরই অংশ—ভারত-বিরোধী পৃথক্ বাঙ্গালী-সংস্কৃতি নাই।

এইরূপে ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ-সূত্রে সংযুক্ত হইলেও বাংলা-দেশের সংস্কৃতিতে দুই-একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যকে আশ্রয় করিয়া, সংস্কৃতি-বিষয়ে, "বাঙ্গালা-বনাম-ভারত" এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

সংস্কৃতি-বিষয়ে এক হইলেও, অর্থ-নৈতিক ও অন্য বিষয়ে পার্থক্য বা বিরোধ আসিতে পারে। যেমন ইংলাণ্ডের ইংরেজ ও আমেরিকায় উপনিবিষ্ট ইংরেজদের মধ্যে ঘটিয়াছিল; সেরূপ বিরোধ আসিলে, সংস্কৃতির ঐক্য কিছুই করিতে পারে না। তখন আত্মরক্ষা করিবার জন্য বা নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, প্রত্যেক সম্প্রদায় বা সমাজকে সচেষ্ট হইতে হয়। নিজ অস্তিত্ব বা নিজ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য বাধা প্রদান করা তখন কর্তব্য হইয়াই দাঁড়ায়।

বাঙ্গালী জাতির পূর্ব কথায় "বৃহত্তর বঙ্গ" এই আদর্শ কত প্রাচীন? বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি অজ্ঞাত। তবে এটা ঠিক যে, মগধ হইতে আর্য্যভাষা ও ভারতের আর্য্যানার্য্য-মিশ্র গাঙ্গ সভ্যতা, ভারত-বিজয়ী সভ্যতা-রূপে বাঙ্গালা-দেশে আসিবার পূর্বে, এদেশে অস্ট্রিক (কোল ও মোন-খ্মেরে) জাতীয় এবং দ্রাবিড় জাতীয় অনার্য্য জাতি বাস করিত। ইহাদের নিজস্ব পৃথক্-পৃথক্ সংস্কৃতি ছিল; এবং ইহা অসম্ভব নহে যে, কোথাও-কোথাও ইহাদের মধ্যে সংস্কৃতি-গত এবং শোণিত-গত মিশ্রণও হইয়াছিল। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির লোকেরা কিন্তু নিজ জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইতে পারে নাই। তাহা হইলে, আজ পর্য্যন্ত ইহাদের ভাষা-সংস্কৃতি জীবিত থাকিত—অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালা দেশ পুরাপূরি আর্য্যভাষী হইয়া পড়িত না। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপজাতির লোক—ইহাদের মধ্যে কোনও সংহতি-শক্তির উদ্ভব হয় নাই; দুইটী পৃথক্ জগৎ—অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়—দুইয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় কখনও হইতে পারে নাই; ঐক্যবিধায়ক এমন কিছু বাঙ্গালা দেশে গড়িয়া উঠে নাই, যদ্দ্বারা উত্তর-ভারতের আর্য্য ভাষা ও উত্তর-ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা প্রতিহত হইতে পারিত। খ্রীঃ পূঃ ৩০০-র দিকে মৌর্য্য-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। অনুমান হয়, ২৫০ খ্রীঃ পূঃ মধ্যে বঙ্গদেশ মৌর্য্যরাজগণের আমলে কোনও সময়ে বিজিত হয়। মৌর্য্য যুগে পূর্ব-বঙ্গে "সংবঙ্গ" নামে সঙ্ঘ-বদ্ধ বঙ্গীয় গণ-সঙ্ঘের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সময়ে বঙ্গবাসিগণের প্রাদেশিক গৌরব বা স্বাতন্ত্র্য-বোধের কোনও পরিচয় আমরা পাই না।

মৌর্য্য যুগের পরে সুঙ্গ ও কুষাণ যুগ আসিল, গুপ্ত ও পাল যুগ আসিল। পাল যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেন রাজাদের শাসনকাল আসিল। তার পরে ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ হইতেই বিজাতীয় ও বিধর্মী তুর্কীদের দ্বারা বঙ্গদেশ বিজিত হইল। তুর্কী বিজয়ের বহু পূর্বেই বঙ্গদেশের অধিবাসীরা আর্য্য-ভাষী হইয়া গিয়াছে, এবং উত্তর-ভারতের সভ্যতার অংশ গ্রহণ করিয়া, আর্য্যাবর্তের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের আর্য্যীকরণ চলিতেছিল; জাতির সেই যুগান্তরের সময়ে বঙ্গবাসিগণের পক্ষে সাত্মাভিমান হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

আমাদের আজকালকার প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার মূল হইতেছে সমভাষিত্ব। খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে এই সমভাষিত্ব বঙ্গদেশে ছিল বলিয়া মনে হয় না, তখন দেশের লোকে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর নানা ভাষা বলিত, এবং অনার্য্য ভাষা ত্যাগ করিয়া আর্য্য ভাষার বাঁধন মানিয়া লইয়া তখন এদেশের লোকেরা সবে-মাত্র

একতার পথে পদার্পণ করিয়াছে। গুপ্ত এবং প্রথম পাল যুগে, বাঙ্গালার সহিত বিহার ও কাশী অঞ্চলের ভাষাগত সাম্য ছিল বলিয়া মনে হয়; তখন একই প্রাকৃত বা অপভ্রংশ (খুব খুঁটী-নাটী প্রাদেশিক ভেদ হয় তো ছিল, কিন্তু তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে) সারা পূর্ব-ভারতে আর্য্যভাষা-রূপে সর্বজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল পাল-বংশীয় রাজাদের রাজত্বের শেষ-ভাগে—খ্রীষ্টীয় দশম শতকের দিকে। তখন বঙ্গদেশবাসীর—গৌড়-বঙ্গ জনের —"বাঙ্গালী প্রাদেশিকতা" জন্মলাভ করে নাই; বাঙ্গালারই মত, ভারতের অন্যত্র কোথাও এরূপ ভাষাশ্রয়ী প্রাদেশিকতা তখন উদ্ভূত হইতে পারে নাই। বাঙ্গালী তাহার ঘরোয়া ভাষাকে "প্রাকৃত" বলিত, ঘরোয়া ভাষায় সে অল্প-স্বল্প লিখিত; এবং তাহা ছাড়া পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষাতেই সে বেশী লিখিত; এই ভাষা যেন ছিল সে কালের হিন্দী; এবং এতদ্ভিন্ন, উচ্চকোটির সাহিত্য-রচনার জন্য নিখিল ভারতের সর্ব-প্রধান ভাষা সংস্কৃত তো ছিলই।

তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেদের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনই, একটী প্রান্ত-নিবদ্ধ বিশেষভাবে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় গৌরব অনুভব না করিয়া বঙ্গদেশের রাজা, পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক, কবি, শিল্পী, এক নিখিল-ভারতীয় সভ্যতার পুষ্টিসাধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতটুকু উপায়ন ভারত-মাতার চরণ-তলে সেদিনের গৌড়বঙ্গ-বাসী আনয়ন করিয়াছে, তাহা সে প্রাদেশিক আত্মসত্তা, অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবাসীর সত্তা বা চেতনা উপলব্ধি না করিয়াই করিয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে, গৌড়-বঙ্গ-মগধ-পতি মহারাজ ধর্মপালের আমলে একবার বঙ্গবাসী উত্তর ভারতের কনোজের রাজা চক্রায়ুধকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; এতদ্ভিন্ন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে দক্ষিণ ভারত পর্য্যন্ত জয়যাত্রা করিয়াছিল। রাজনৈতিক প্রভাব ও দিগ্বিজয় আদি ব্যাপারে বঙ্গবাসিগণের কৃতিত্ব বিশেষ কিছু ছিল না; মাটি আঁচড়াইলেই যে দেশে ধান মিলিত, সে দেশের লোকেদের বাহিরে যাইবার অবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু সংস্কৃতির বিষয়ে প্রাচীন বঙ্গবাসীরা ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে লক্ষণীয় দান যোগাইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ যুগের ইতিহাসে বাঙ্গালার স্থান অতি উচ্চে। বৃহত্তর ভারতের পত্তনে বাঙ্গালার সহায়তাও যথেষ্ট ছিল। বিশেষ করিয়া ব্রহ্মদেশ ও সুবর্ণ-দ্বীপ বা সুমাত্রা এবং যবদ্বীপের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগ ছিল। বাঙ্গালার তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বন্দর, ভারতের সভ্যতার বাহিরে প্রসারের জন্য এক প্রধান পথ ছিল। ভারতে প্রাচীন শিল্পের ইতিহাসে গৌড়-মগধ রীতির

ভাস্কর্য্য একটী প্রধান বস্তু—এই রীতির বিকাশে বাঙ্গালার বরেন্দ্র-ভূমির ধীমান্ ও বীতপাল নামক ভাস্করদ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসেও বঙ্গদেশের দান অল্প নহে।- "গৌড়ী রীতি" নামক সংস্কৃত কাব্য রচনার রীতি বাঙ্গালা দেশেই উদ্ভূত হয় বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। বাঙ্গালী কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ভারতীয় সাহিত্য-গগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ব্যাকরণ, শব্দকোষ, টীকা-টিপ্পনী গ্রন্থেও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণও পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

মোটের উপর, বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ ভারতের সাধারণ সংস্কৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য যথোপযুক্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই অংশগ্রহণ-কার্য্য যখন ঘটিয়াছিল, তখন তাহাদের বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় অর্থাৎ বাঙ্গালী বলিয়া বিশেষ গৌরব-বোধ হওয়া সম্ভবপর ছিল না,—তখন বাঙ্গালা ভাষা সূতিকাগারে, এবং বাঙ্গালী জাতির বা অন্য কোনও প্রাদেশিক জাতির মধ্যে এই প্রকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনা আসে নাই। চন্দ্রগোমী, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ভট্ট ভবদেব, জয়দেব, বন্দিঘাটীর সর্বানন্দ প্রভৃতি—ইঁহারা প্রাচীন ভারতের, ইঁহাদের লইয়া সমস্ত ভারত গৌরব করেন—বাঙ্গালী বলিয়া বিশিষ্ট বোধ বা চেতনা ইঁহাদের সময়ে ছিল না।

মুসলমান যুগে বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালী তখনও পূর্ণভাবে সাত্মাভিমান হয় নাই। তুর্কী-বিজয় প্রথমটা বাঙ্গালীর জীবনের অঞ্চল-দেশ মাত্র স্পর্শ করিয়াছিল; ইহা তাহার জীবনকে পুরা-পুরি পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে যে একটা উন্মুখ আন্তর্ভারতিকতা জাগিয়া উঠিতেছিল—হিন্দু আমলে স্বাধীন-ভাবে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া তাহা বাঙ্গালীর প্রাদেশিক জীবনকে সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছিল; কিন্তু মুসলমান রাজশক্তি আসিয়া অন্ততঃ কিছু কালের জন্য তাহা ব্যাহত করিয়া দিল। আসন্ন আপদ্ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্গালী কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিল, বাধ্য হইয়া সে তাহার গ্রাম্য জীবনের মধ্যেই অঙ্গ-সংহরণ করিয়া লইল। খ্রীষ্টীয় ১২০০ সালের পর হইতে, ১৮৫০ সালের দিকে ইংরেজের সঙ্গে মিলিয়া ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, সাড়ে-সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর যে জীবন ছিল, তাহা মোটের উপর গ্রাম্য জীবন ছিল। যখন রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ, উড়িয়া, তেলুগু, কানাড়ী, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, এই সব জাতি মারামারি কাটাকাটি করিয়া বা মিলন করিয়া ভারতের মধ্যযুগের বা মুসলমান-যুগের ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে

নিযুক্ত, তখন, কবির ভাষায়—

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে,
পায়নি সংবাদ,
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ !
শান্ত-মুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্মল
শ্যামল উত্তরী,
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লী-সন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি' ॥

মুসলমান যুগে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে নিজ সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার প্রয়াসের ফলে, বাঙ্গালীর সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিল। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে একটা গেঁয়ো ভাব কায়েমী হইয়া গেল। হিন্দু যুগে বাহিরকে লইয়া তাহার যেটুকু কারবার ছিল—ভারতের অন্য প্রদেশকে লইয়া, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, সিংহল, তিব্বত প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের দেশকে লইয়া ছিল,—সেটুকু আর বজায় রহিল না। বাঙ্গালী নিজ সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য সমাজ ছাড়িয়া কচিৎ বাহিরে যাইত—সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য মিথিলা ও কাশী, এবং তীর্থ-যাত্রার জন্য পুরী, গয়া, কাশী, পরে বৃন্দাবন, কচিৎ কাঞ্চী, রামেশ্বর, দ্বারকা—ইহাই তাহার দৌড় ছিল। এতদ্ভিন্ন, কখন-সখন (বিশেষতঃ মোগল বিজয়ের পরে) কোনও-কোনও বাঙ্গালী জমিদার, দিল্লী-আগ্রা পর্য্যন্ত যাইতেন,—বাদশাহের দরবারে সেলাম দিবার জন্য, জমীদারীর সনদ আনিবার জন্য। বাঙ্গালী মুসলমান এবং সম্ভবতঃ দুই চারিজন বাঙ্গালী হিন্দুও বহির্বাণিজ্যের জন্য ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত জাহাজে করিয়া এদিকে বর্মা, মালয়দেশ ও দ্বীপময় ভারত, ওদিকে দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল, গোয়া, গুজরাট, এবং আরবদেশ পর্য্যন্ত যাইত। কিন্তু এই সাগর-যাত্রাটুকুও ফিরিঙ্গী "হর্মাদ" বা পোর্তুগীস বোম্বেটিয়াদের উৎপাতে বন্ধ হইয়া গেল, বাঙ্গালী পুরাপুরি ঘরবাসী হইয়া দাঁড়াইল, তাহার জীবনে সাগরের ছাপ আর পড়িল না। কালাপানি পার হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, এবং তখন পণ্ডিতেরা এই কলিযুগে সাগর-যাত্রা নিষিদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর একটা গৌরবের পথ এই ভাবে অবস্থা-গতিকে রুদ্ধ হইয়া গেল ; মুসলমান রাজশক্তি-ও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিল, কোনও সাহায্য করিতে পারিল না। মোগল-পূর্ব যুগে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কবিভারতীর মত এক-আধজন বাঙ্গালী, বৌদ্ধ হইয়া সিংহলে গিয়া

বাঙ্গালার সঙ্গে বাহিরের যোগের পুনরানয়নের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তখন গেঁয়ো ঘরমুখা বাঙ্গালীর কাছে তাহার কুঁড়েঘরের প্রদীপটাই প্রিয় হইয়া গিয়াছিল, সে বাহিরের আলো-কে আলেয়া ভাবিয়া তাহার পিছনে ঘুরিতে ভয় পাইল।

"বৃহত্তর বঙ্গ" বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, তদনুরূপ বাঙ্গালীর প্রসার, মোগল-পূর্ব যুগে একমাত্র চৈতন্যদেবের প্রভাবে নূতন করিয়া ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখানেও আমাদের সময়ের মত সজ্ঞান গৌড়িয়াপনা বা বাঙ্গালীয়ানা একেবারেই ছিল না। চৈতন্যদেব আসিয়া বাঙ্গালীকে আর "ঘ'রো" ও "কুণো" থাকিতে দিলেন না; তিনি যে নাম-প্রচারের আহ্বান শুনাইলেন, তাহাতে সে আর নিজ কুটীর বা গ্রামে নিবদ্ধ থাকিতে পারিল না, তাহাকে বাহিরে আসিতে হইল; রাজনৈতিক বিষয়ে না হউক, আধ্যাত্মিক জীবনে তাহাকে আর একবার বড় হইতে হইল, ভারতীয় হইতে হইল। চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর মধ্যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল বাঙ্গালা দেশের নহেন—তিনি বাঙ্গালীত্বের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া কেবল বাঙ্গালীয়ানার বড়াই করা অশোভন ও অনুচিত হইবে, এবং সেরূপ করিলে তদ্দ্বারা চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্রের অমর্য্যাদা করা হইবে। পুরীতে জনৈক উড়িয়া পণ্ডিতের কাছে শুনিয়াছিলাম—চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে গভীর ভক্তির সহিত তিনি বলিতেছিলেন—"মহাপ্রভু লোকোত্তর পুরুষ ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের কোনও বিশেষ জাতির নন; তাঁহার বাল্য-জীবন ও প্রথম-যৌবন অতিবাহিত হইয়াছিল বাঙ্গালীদের মধ্যে, দক্ষিণীদের মধ্যে ও হিন্দু-স্থানীদের মধ্যে মধ্য-জীবনের কিয়দংশ তিনি অতিবাহিত করেন, এবং তাঁহার শেষ জীবন তিনি যাপন করেন উড়িয়াদের মধ্যে।" চৈতন্যদেবের শিক্ষায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইল; বাঙ্গালী পুরীতে গেল, সুদূর বৃন্দাবনের তীর্থগুলির উদ্ধার করিল, বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব চিন্তা ও দর্শনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিল। হিন্দু যুগের পরে, আবার বঙ্গের বাহিরে, গৌড়-বঙ্গের পণ্ডিতের, ভক্তের ও কর্মীর গমন ও অধিষ্ঠান হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসারের সঙ্গে, বাঙ্গালী ভাবের—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের—প্রচার, বাহিরের প্রদেশে কিছু-কিছু হইল বটে, কিন্তু তখনও এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর সজ্ঞান ও সাত্মাভিমান বাঙ্গালীয়ানা দেখা দিল না।

মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মানসিংহ আসিয়া পূর্ব-বাঙ্গালার দেবমূর্তিকে আম্বেরে লইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী

ব্রাহ্মণ পুরোহিত গেল। বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেব ঠাকুর জয়পুরে হিন্দু রাজার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজপুতানার কতকগুলি রাজ্যে, মথুরা বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালী গোস্বামীদের অধিষ্ঠান হইল। বাঙ্গালী জ্যোতিষী, পণ্ডিত বিদ্যাধর, জয়পুর-নগর স্থাপনের সময়ে, সবাই রাজা জয়সিংহের সহায়ক হইলেন। ষোড়শ শতক হইতে শ্রীরূপ-সনাতন-জীব প্রমুখ বৈষ্ণব গোস্বামিগণের অবস্থানের ফলে, বৃন্দাবন বাঙ্গালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটী প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। এই সব কৃতিত্বের জন্য বাঙ্গালী মর্য্যাদার বড়াই কেহ করেন নাই—ভারতের আর পাঁচটী জাতির মধ্যে অন্যতম জাতি-হিসাবে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ এই কার্য্য করিয়াছিলেন।

মোগল-যুগে উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাঙ্গালার যোগ-সূত্র আরও সুদৃঢ় হইল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ফারসীর চর্চা বাড়িল। উত্তর-ভারতের রাজ-দরবারে বাঙ্গালার মলমলের চাহিদা বেশী করিয়া হইতে লাগিল। বাঙ্গালার বাঁশের কুঁড়ের চাল-রচনার ধাঁচা, রাজপুত-মোগল বাস্তুশিল্পে pavilion বা বিমান-গৃহ নির্মাণে গৃহীত হইল, ইহার ফলে রাজপুত-মোগল বাস্তুশিল্পে "বেওটী" নামক বাঁকা-ছাত বিমানের উদ্ভব হইল।

মুসলমান যুগের চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়া বাঙ্গালাদেশ হইতে আর কোনও লক্ষণীয় আন্তর্ভারতীয় আন্দোলন উদ্ভূত হয় নাই। ধর্ম-সম্বন্ধীয় আন্দোলন বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীয়ানার কোনও স্থান ছিল না। সজ্ঞান "বৃহত্তর বঙ্গ" তখন হয় নাই, যদিও প্রশংসনীয় ভাবে বঙ্গভাষীর প্রভাব বঙ্গের বাহিরে কোনও কোনও দেশে গিয়া পহুঁছিতেছিল।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতে বাঙ্গালাদেশে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাদুর্ভাব ঘটিতে থাকে। পারস্য-রাজের আর্‌মানী-জাতীয় প্রজারা ষোড়শ শতক হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত, বাঙ্গালা দেশেও তাহাদের গতায়াত ছিল। ১৩৫০ সালের পূর্বেই আর্মানীরা কলিকাতায় একটী ব্যবসায়-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল; ইহাদের দ্বারা তৈয়ারী ক্ষেত্রে, ১৬৯১ সালে ইংরেজ যোব চার্নক ইংরেজদের একটা আড্ডা স্থাপিত করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে দেশ-মধ্যে ইংরেজদের প্রভাব ও প্রভুত্ব বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে দুর্বল সিরাজুদ্দৌলার রাজ্যকালে, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল। অজ্ঞান, স্বার্থান্ধ, কুচক্রী, মনুষ্যত্ব-বিহীন জনকয়েক বাঙ্গালী ও বঙ্গ-প্রবাসী জমীদার, সমাজ-নেতা, সেনানী ও ধনী ব্যক্তি মিলিয়া, স্বদেশকে ইংরেজের হাতে

তুলিয়া দিল।

অষ্টাদশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে বাঙ্গালীর যে অধোগতি হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরেজ বাঙ্গালাদেশে রাজা হইয়া বসিল, এবং বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষময় ইংরেজের রাজ্যের প্রসার ঘটাইল। বাঙ্গালারই পয়সায়, এবং কেবল পয়সার জন্য যাহারা কাঁচা মাথা দিতে প্রস্তুত, এরূপ তেলেঙ্গা ও ভোজপুরিয়া সিপাহীর সাহায্যে, ইংরেজ ধীরে-ধীরে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রায় সমগ্র ভারত জয় করিয়া ফেলিল। ইংরেজ শাসনের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে, ইংরেজের তল্পীদার-হিসাবে বাঙ্গালীরও বিস্তার ঘটিল। যেখানে-সেখানে ইংরেজের ছাউনী, ইংরেজের তহশীল, ইংরেজের পুলিস, ইংরেজের দপ্তর, ইংরেজের আদালত, ইংরেজের ইস্কুল, ইংরেজের দোকান ও ইংরেজের ডাকঘর বসিল, যেখানে-সেখানে ইংরেজী-জানা কেরানী, রাজকর্মচারী, শিক্ষক, উকীল দরকার হইল, এবং বাঙ্গালী অল্প দু'পাতা বা বেশী করিয়া ইংরেজী পড়িয়া, সেখানকার ইংরেজী-নবীস লোকের অভাব দূর করিল। হাসপাতাল হইল, ইংরেজ ডাক্তারের নীচে বাঙ্গালী ডাক্তার গিয়া হাজির হইল। কেবল বাঙ্গালী মজুরের যাইবার দরকার হইল না—উত্তর-ভারতে দৈহিক শ্রমের দ্বারা যাহারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে এমন অশিক্ষিত লোকের অভাব ছিল না। আর বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কেহ গেল না, কারণ ইংরেজের সাহচর্য্যে আসিয়া ব্যবসায়-কার্য্যে বাঙ্গালীর উৎসাহ ও প্রবৃত্তি অষ্টাদশ শতকের মধ্য-ভাগ হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। ওদিকে উত্তরভারত হইতে দলে-দলে মজুর, চাকর, দরোয়ান, বণিক্ আসিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে কায়েম হইয়া বসিল, পরে বাঙ্গালা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। বিহারী আসিল, হিন্দুস্থানী আসিল, উড়িয়া আসিল; পরে মারওয়াড়ী ও পাঞ্জাবী আসিল—এখন ভাটিয়া ও গুজরাটী আসিতেছে, নেপালী আসিতেছে, তেলুগু আসিতেছে, অন্য মাদ্রাজীও আসিতেছে।

এইরূপে বাঙ্গালার বাহিরে ইংরেজের আমলে ও ইংরেজের আশ্রয়ে নবীন যুগের এক "বৃহত্তর বঙ্গ" যেমন প্রতিষ্ঠিত হইল,—তেমন—সে দিকে আমরা কোনও দৃষ্টি দেই নাই—সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এক-একটী "বৃহত্তর বিহার," "বৃহত্তর হিন্দুস্থান," "বৃহত্তর মারওয়াড়," "বৃহত্তর উড়িষ্যা" এবং হালে "বৃহত্তর পাঞ্জাব," "বৃহত্তর গুজরাট," "বৃহত্তর অন্ধ্র," "বৃহত্তর তামিল্-নাড়ু," "বৃহত্তর কেরল"-ও স্থাপিত হইতে লাগিল। "বৃহত্তর বঙ্গ" এখন অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার বুকের ভিতরে এই সকল "বৃহত্তর অন্ধ-

প্রদেশ" বেশ বাড়-বাড়ন্ত অবস্থায়, বেশ জাঁকাইয়া বিদ্যমান; আমরা স্বেচ্ছায় ইহাদের নিগড় পরিয়া রহিয়াছি, এবং ইচ্ছা করিলেও নিজেদের মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

ইংরেজ-আমলে এই যে "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা খুব সচেতন, খুব সাত্মাভিমান বটে,—কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীর গর্ব করিবার বড় কিছুই নাই; একদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, নবীন যুগের এই "বৃহত্তর বঙ্গ" বাঙ্গালী জাতির পক্ষে চরম অগৌরবের। ভারতবর্ষের রাজধানী হইতে সুদূর কোণে অবস্থিত একটী প্রদেশের অধিবাসী, একটী গেঁয়ো জাতি,—মধ্য-যুগের ভারতের ইতিহাসে যাহার কোনও স্থান ছিল না, রাজপুত, মারহাট্টা, কানাড়ী, তেলুগুর মত উত্তর ভারতের হিন্দু আর মুসলমানের মত, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস গড়িতে যে কোনও লক্ষণীয় সহায়তা করে নাই, যাহার একমাত্র গর্বের বস্তু হইতেছে কিছু পরিমাণে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা এবং মধ্য-যুগের আন্তর্ভারতিক ভাব-জগতে চৈতন্যের ব্যক্তিত্বকে দান করা,—সেই অনাদৃত গেঁয়ো জাতি, তাহার নেতাদের অশ্রুত-পূর্ব নীচতা ও মূর্খতার বশে, মুষ্টিমেয় বিদেশীর হাতে স্বদেশকে বিকাইয়া দিল; এবং পরে যখন তাহার দেশে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সেই অর্থ দিয়া বাহির হইতে সিপাহীদের কিনিয়া, এই বিদেশীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জয় করিতে লাগিল, বাঙ্গালীরা অম্লান-বদনে নহে, মহোল্লাসে—বিদেশীর পিছনে পিছনে চলিল। গরীবের হঠাৎ বড়-মানুষী ঘটিল, আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল। সাহেবদের সঙ্গে-সঙ্গে, বড়-সাহেবের নীচে বাঙ্গালী ছোট-সাহেব হইয়া উঠিল। উড়িষ্যা-প্রদেশের জনৈক বিখ্যাত জন-নেতার ভাষায়—ruling race-এর সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালীর একটী intermediate ruling race হইয়া দাঁড়াইল।

এক ময়ূর-পুচ্ছে দেহ আবৃত করিয়া বাঙ্গালীর মন অহমিকায়—"হাম-বড়া" ভাবে পূর্ণ হইল; ইংরেজ-কর্তৃক নূতন বিজিত প্রদেশে তাহার সর্দারী করিতে যাওয়ার মধ্যে যে কতখানি দৈন্য ছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না, স্থানীয় লোকেরাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না; তবে ইহাতে তাহাদের মনের অন্তস্তলে অজ্ঞাত বা প্রচ্ছন্ন-ভাবে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যে একটুখানি জুগুপ্সা, বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব না আসিয়া গেল, তাহা নহে। ইংরেজের সাহচর্য্যের বলে, নূতন-লব্ধ ইংরেজী শিক্ষার দম্ভ ও মোহে, সে ভারতের সুপ্রাচীন সুসভ্য জাতিগুলিকে বহুস্থলে হেয় ভাবিতে লাগিল। সূর্য্যের তাপ লোকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু বালির তাপ কেহ সহিতে চাহে না। বঙ্গের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালীদের যে স্থানীয় লোকে আর তিষ্ঠিতে দিতেছে

না, তাহার অন্তর্নিহিত অন্যতম কারণ বোধ হয় এই,—বিশেষতঃ এখন, যখন সকলেই বুঝিতেছে যে, সরকার-বাহাদুর আর বাঙ্গালীর প্রতি মোটেই প্রীত নহেন। পূর্বেই বলিয়াছি, হাতী পাঁকে পড়িলে বেঙেও আসিয়া লাথি মারিয়া যায়—এ প্রবাদ অতি সত্য অভিজ্ঞতার ফল।

গভীর-ভাবে তলাইয়া দেখিলে, এই "বৃহত্তর বঙ্গ" লইয়া হৈ-চৈ করা খুব শোভন ব্যাপার হইবে না। বাঙ্গালীদের "বৃহত্তর-বঙ্গ"-র দেখাদেখি মহারাষ্ট্রীয়েরা বৃহন্মহারাষ্ট্র" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—"বৃহন্মহারাষ্ট্র" লইয়া সভা সমিতিও হইয়া গিয়াছে। সকলেই বৃহৎ, সকলেই মহান্। কিন্তু "বৃহন্মহারাষ্ট্র" যে-ভাবে প্রসারিত হইয়াছিল, সে-ভাবে "বৃহত্তর-বঙ্গ" প্রসার লাভ করে নাই। আবার প্রাচীন কালে (অর্থাৎ মুসলমান ও হিন্দু-যুগে) যদি আমরা "বৃহত্তর বঙ্গ"-র কথা কল্পনা করি, তাহা হইলে তাহার প্রতিষ্ঠাও যে সম্পূর্ণ-রূপে পৃথগ্-ভাবে হইয়াছিল, তাহা বুঝিতেও দেরী লাগে না। আধুনিক কালের "বৃহত্তর বিহার" "বৃহত্তর উড়িষ্যা" যেভাবে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইতেছে, তাহা আবার বঙ্গদেশের বুকের উপরে প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর-মারওয়াড়", "বৃহত্তর গুজরাট" ও "বৃহত্তর পাঞ্জাব" হইতে পৃথক্। ইংরেজের "বৃহত্তর ইংলাণ্ড" লইয়া ইংরেজ জাতি গর্ব করিয়া থাকে, তাহাদের গর্ব করিবার অধিকারও আছে; আরবের "বৃহত্তর আরব", যাহা আরব দেশ ছাপাইয়া এরাক বা মেসোপোতোমিয়া, শাম বা সিরিয়া, মিসর, সূদান, ত্রিপোলি, তুনিসিয়া, আল্-জযাইর বা আল্‌জিয়র্স, মগ্‌রব বা মরোক্কো পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, স্পেন, কর্সিকা, সিসিলি, মাল্‌টা, পারস্য, মধ্য-এশিয়া এক সময়ে যে "বৃহত্তর আরবদেশ"-এর পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল, সেই "বৃহত্তর আরব" লইয়া খালি আরব কেন, আরব-জাতির মাওয়ালী বা শিষ্য, অথবা ভাব-জগতের প্রজা, অন্য মুসলমান জাতিও গর্ব করিয়া থাকে। প্রাচীন-কালে ভারতের ভাব-রাজ্যের, ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রসারের ফলে, এশিয়ার প্রায় সর্বত্র যে "বৃহত্তর ভারত" সংস্থাপিত হইয়াছিল, যাহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা সেরিন্দিয়া বা প্রাচীন মধ্য-এশিয়ায়, ইন্দোচীন বা ব্রহ্ম-শ্যাম-কম্বোজ-চম্পায়, ইন্দোনেসিয়া বা মালয়দেশ ও দ্বীপময়-ভারতে, তথা ভোট বা তিব্বত, চীন, আনাম, কোরিয়া ও জাপানে দেখিতেছি, তাহা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের অবদান,—আমরা অধঃপতিত ভারতীয়েরা এই কথা স্মরণ করিয়াও এখন ধন্য হইতে পারি। কিন্তু এখনকার "বৃহত্তর ভারত"? যে ভাবে আড়কাঠির সাহায্যে কুলী চালান দিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা, ফিজি, গায়েনা প্রভৃতি দেশে নূতন বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কি আমাদের বুক দশ হাত

হইতে পারে? এই বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে—অথবা নিগ্রো ক্রীতদাসদের আগমনের ফলে আমেরিকার সংযুক্তরাষ্ট্রে যে "বৃহত্তর আফ্রিকা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে—কেহও কি "বৃহত্তর ইংলাণ্ড"-এর তুলনা করা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিবে?— "রামচন্দ্র" ও "রামছাগল", উভয়ের মধ্যে "রাম" "শব্দটী সাধারণ—অতএব এই দুই শব্দ সামান্য-ধর্মী—ইহা এই ধরণের হাস্যজনক কথা হইবে।

আধুনিক "বৃহত্তর বঙ্গ" আমরা জানি। ইহার যে কোনও সার্থকতা ছিল না, ইহার দ্বারা যে ভারতের কোন কাজ হয় নাই, তাহা কেহ বলিবে না। কিন্তু রামদাস দ্বারা অনুপ্রাণিত শিবাজী কর্তৃক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বৃহন্মহারাষ্ট্র যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও যে ভাবে তাহা অষ্টাদশ শতকে পেশওয়াদের দ্বারা ভারতবর্ষময় বিস্তৃত হয়, তাহা বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া পশ্চিমে ও দক্ষিণে একটু ঘুরিয়া আসিলেই বুঝিতে পারা যায়; এবং তদ্দর্শনে মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী ও মহারাষ্ট্র-সরস্বতীর নিকটে, মহারাষ্ট্র-শক্তি ও মহারাষ্ট্র-বুদ্ধির সমক্ষে, মস্তক অবনত না করিয়া পারা যায় না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতে হিন্দু-সংস্কৃতির সংরক্ষণ এই বৃহন্মহারাষ্ট্র দ্বারাই হইয়াছিল। এ কথা সত্য বটে, সর্বত্রই যে বৃহন্মহারাষ্ট্র, রামদাস ও শিবাজীর এবং রামশাস্ত্রী ও বালাজী বাজী রাওয়ের মহান্ আদর্শ— "গো-ব্রাহ্মণ" রক্ষার আদর্শ (অর্থাৎ হিন্দুর সংসার ও সমাজ এবং হিন্দুর জ্ঞান ও সাধনা রক্ষার আদর্শ) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা নহে; বাঙ্গালাদেশে নাগপুর হইতে কতকগুলা মারহাট্টা লুঠেরা ("বারগীর") আসিয়া, পশ্চিম বাঙ্গালার প্রজাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি "বর্গী" নামের সঙ্গে এখনও জড়িত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ অপচার দুই-দশ স্থলে হইয়াছিল বলিয়া, আদর্শের মহত্ত্ব এবং অন্যত্র তাহার কার্য্যকারিতা খর্ব হয় না। উত্তর-ভারতের হিন্দী কবি ভূষণ যে বলিয়াছিলেন, শিবাজী আসিয়া হিন্দুর "চোটী বেটী রোটী" অর্থাৎ হিন্দুর মাথায় শিখা বা ধর্ম, হিন্দুর মেয়ের সম্মান, এবং হিন্দুর রুটী অর্থাৎ অন্ন বা অর্থ-নৈতিক জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য উক্তি। বিজেতা ধর্মান্ধ মুসলমান—কি বিদেশী মুসলমান, কি হিন্দু-সন্তান মুসলমান—যেখানে যাহা ভাঙ্গিয়াছিল, ধ্বংস করিয়াছিল, লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুশক্তি তাহার উদ্ধার করিয়াছে, তাহাকে জীয়াইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে উত্তর-ভারতে, কাশীতে এবং অন্যত্র, সংস্কৃত-বিদ্যা রক্ষা পাইয়াছিল—অনেকটা পেশোয়াদের পৃষ্ঠ-পোষিত মহারাষ্ট্র-পণ্ডিতদের

চেষ্টায়। গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির, কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মন্দির, মহারাষ্ট্রীয় রাণী অহল্যাবাঈয়ের কীর্তি। উজ্জয়িনীতে গিয়া দেখিলাম, মহারাষ্ট্র রাজশক্তির প্রভাবেই অত বড় হিন্দুতীর্থটী পুনরায় প্রাণ পাইয়া টিঁকিয়া আছে। সুদূর দক্ষিণে তামিলদেশ তাঞ্জোরেও মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুর পূর্ণ প্রভাব। এ একেবারে অন্য জিনিস; এ জিনিস উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে ও তৃতীয়-পাদে বাঙ্গালী কিছু-কিছু বুঝিতে পারিত—কিন্তু হিন্দু নামের মর্য্যাদা যাহারা ভুলিতে বসিয়াছে এমন অতি-আধুনিক বাঙ্গালী এ জিনিস বুঝিবে না।

ইংরেজদের middlemen হইয়া, অর্থাৎ তাহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া আমাদের হালের বৃহত্তর-বঙ্গের প্রসার। ইহা নায়েবী গোমস্তাগিরি দারোগাগিরির মতই ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে সত্যকার আত্মপ্রসাদের যে কিছুই নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালী তাহার এই তল্পিদারীর, এই ফরিয়াগিরির অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। ইংরেজী শিখিয়া বাঙ্গালী যে জিনিসটী ভারতবর্ষের অন্য সব জাতির তুলনায় অনেক আগেই পাইয়াছিল—তাহার মনের আধুনিকতা, মনের সংস্কার-মুক্ত ভাব—তাহা তাহাকে এমন একটী স্থানে উন্নীত করিয়াছিল যেখানে উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধেও সাধারণ ভারতবাসীর (বিশেষতঃ অ-বাঙ্গালী ভারতবাসীর) পক্ষে পঁহুছানো, একেবারে অসম্ভব না হইলেও, বিশেষ কঠিন ব্যাপার ছিল। দুইটী জিনিস বাঙ্গালী তাহার ইংরেজ গুরুর নিকট পাইয়াছিল,—জ্ঞানলিপ্সা অর্থাৎ নূতন খবর, বাহিরের জগতের খবর জানিবার আকাঙ্ক্ষা;—এবং স্বাধীন চিন্তা। তাহার স্বাধীনতার স্পৃহা এবং জাতীয়তার উন্মেষও এই স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই উদ্ভূত হয়।

বঙ্গের বাহিরে গিয়া বাঙ্গালী চাকুরিজীবী এই দুইটী বস্তু ভারত-মাতার সেবায় উপস্থাপিত করিল। প্রবাসী বাঙ্গালী উত্তর-ভারতে ও অন্যত্র যেখানে-যেখানে গিয়াছে, প্রায় সর্বত্রই ইংরেজী ইস্কুল খুলিয়াছে, অথবা ইংরেজী ইস্কুল খুলিতে সাহায্য করিয়াছে; ইংরেজী শিক্ষার—অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। টাকা-কড়ি দিয়াছে, জমি দিয়াছে, বিনা বেতনে পরিশ্রম করিয়াছে। এই শিক্ষা-প্রচার দ্বারা, বিচার করিয়া দেখিলে, এক হিসাবে সে নিজের পায়েই কুড়ুল মারিয়াছে; স্থানীয় লোকেরা ইংরেজী-শিক্ষিত হইলে, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা যে ও-সব দেশে আর থাকিবে না, সে কথা প্রবাসী বাঙ্গালীরা চিন্তা করেন নাই;—এই সকল ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠায় প্রাদেশিক স্বার্থবোধ তাঁহাদের একেবারেই ছিল না, সমগ্র ভারতের হিতৈষণা ইহার মধ্যে বিদ্যমান

ছিল। বাঙ্গালী উকিল ও অন্য স্বাধীন ব্যবসায়ীর হাতে ইংরেজী সংবাদপত্র দ্বারা রাজনৈতিক শিক্ষাও প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালীই ভারত-মাতার কল্পনা ও বোধ ভারতময় প্রচার করে, "স্বদেশী" মন্ত্র বাঙ্গালীর দ্বারাই প্রচারিত। রাজসরকারে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা আগে যাহা ছিল, তাহার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, শিক্ষা ও দেশাত্মবোধের মন্ত্র বাঙ্গালী যখন প্রচার করিল, ভারতের লোকেরা তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল না,—বাঙ্গালার বাহিরের লোকেদের চরিত্রে এ বিষয়ে গ্রহণ-শক্তিও যথেষ্ট ছিল।

আধুনিক বৃহত্তর বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে চাকুরিগত-প্রাণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের দ্বারা। এইরূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতে সব প্রদেশে নাই, বা ছিল না। চাকুরি-জীবী ছাড়া, বাঙ্গালী কারিগর ও ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরে ও কাশীতে কিছু-কিছু আছে, এবং বহু তীর্থবাসী কাশী ও বৃন্দাবনে প্রবাসী হইয়া আছেন। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা, উভয়ই বৃহত্তর বঙ্গে বিদ্যমান। নিজের সম্প্রদায়ের বা সামাজিক গণ্ডীর বাহিরে কিছু দেখিলে, সে জিনিসকে সহজে বুঝিতে না পারা, বা বুঝিবার জন্য তাদৃশ চেষ্টা না করা—ইহা এক সাধারণ সঙ্কীর্ণতা; বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত নহে। এই সঙ্কীর্ণতার আনুষঙ্গিক আর একটী অবগুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বিদ্যমান—অনুচিত দম্ভ বা অহমিকা। অ-বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত কতকগুলি সাধারণ গালি এই সঙ্কীর্ণতা ও দম্ভ হইতে উদ্ভূত। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে-সঙ্গে আবার আত্মভোলা উদারতাও দেখা যায়।

বাঙ্গালী যেখানে-যেখানে বাস করিয়াছে, তাহার শিক্ষা ও রুচি অনুসারে সে সাধ্য-মত সেখানকার লোকেদের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু—

The evil that men do lives after them ;
The good is oft interred with their bones,

—প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। ইংরেজী শিক্ষার ফলে, উত্তর-ভারতের নানাস্থানে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। যেখানে এই শ্রেণীর অভাব বা অল্পতা ছিল, ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ায়, এবং ইংরেজী-শিক্ষিত কেরানী ও কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক ইত্যাদির আবশ্যকতা হওয়ায়, এই শ্রেণী বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্বত্র দেখা দিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী ইংরেজী ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া, এবং শিক্ষাদানে ও অন্য রূপে, ইংরেজের সহায়তা করিয়া, বাঙ্গালার বাহিরে এই শ্রেণীর উদ্ভবে অংশ-গ্রহণ

করিয়াছে। যেমন-যেমন এক-এক পুরুষের লোক অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, তেমন-তেমন এখন তাহাদের কৃত জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা বাঙ্গালার বাহিরের লোকেরা ভুলিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালীর উদারতার কথা ভুলিয়া যাইতেছে,—কিন্তু বাঙ্গালী যে সরকারের পিয়ারা ছিল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ-কেহ যে তুচ্ছতার সহিত বাহিরের লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার করিত, সে কথা তাহারা মনে করিয়া রাখিতেছে। এখন সরকার ও জনসাধারণ এক হইয়াছেন—অবস্থা-গতিকে প্রবাসী বাঙ্গালীর উচ্ছেদসাধন ঘটিতেছে। ইহার উপর বিধাতার মার আছে; বিহারের ভূমিকম্পে কয়েক মিনিটের মধ্যে, বিগত তিন-চারি পুরুষ ধরিয়া বিহারে বাঙ্গালী যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার অনেকখানি ভূমিসাৎ হইয়া গেল; বিহারে প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর বঙ্গ" এখন হতশ্রী, মৃতপ্রায়।

দক্ষিণ ভারতে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর যেন আবশ্যকতা হয় নাই, কাজেই বাঙ্গালী চাকুরিয়াকে সেখানে যাইতে হয় নাই। ওদিকে বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইনের প্রসাদে তেলুগু, তামিল ও মালয়ালী কেরানী আসিয়া এখন বাঙ্গালীর ঘরের ভিতর চড়াও হইতেছে।

এই অবস্থার প্রতীকার কি? "বৃহত্তর বঙ্গ"র দুরবস্থা বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী জাতির নিজের দুরবস্থারই অংশ মাত্র। বাঙ্গালা দেশের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর—জীবন-সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। অথচ এ-দিকে তেমন কেহ চিন্তা করিতেছেন না। "ওরিএন্টাল" নৃত্য, তরুণী-নৃত্য, বিভিন্ন সিনেমাওয়ালাদের নব-নব "অবদান", যৌনতত্ত্ব লইয়া রচিত উপন্যাস, সহ-শিক্ষা, ফুট্‌বল, এবং অবসর মত একটু-আধটু নিজ পঙ্গু সমাজের নিন্দা-কটূক্তি ও সঙ্গে-সঙ্গে "রাশ্যা" অর্থাৎ রুষদেশের প্রগতির প্রশংসাময় আলোচনা—এই পথে আমাদের যুবকদের মন চালিত হইতেছে। নিজ পারিপার্শ্বিকের, অর্থাৎ যে সমাজের মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার কোনও কাজ করিবার কথা উঠিলে, সমগ্র ভারতীয় অথবা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রসঙ্গ তুলিয়া এ সমস্ত ছোট কথা চাপা দিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। হিন্দু হিন্দু-সমাজের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে আমরা communalism বলিয়া গালি দেই। দেশের ভিতরে তো আমাদের এই অবস্থা। বাহিরের অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিবারই সময় পাই না —প্রতীকারের চিন্তা তো দূরের কথা।

বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলের কতকগুলি চিন্তাশীল প্রবাসী বাঙ্গালী, যাঁহারা নিজেদের অবস্থার সম্বন্ধে চিন্তিত এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের

সম্বন্ধে ভীত, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি—চাকুরির দিকে তাকাইয়া থাকিলে "বৃহত্তর বঙ্গ" আর টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই প্রবাসী বাঙ্গালীকে ঝুঁকিতে হইবে। এ-দিকে প্রতিযোগিতা খুবই আছে, তবে ঈর্ষাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, আত্মলঘুতাবোধপূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই,—যে প্রকারের প্রতিযোগিতা চাকুরির ক্ষেত্রে ও "ভদ্রলোক"-শ্রেণীর লোকের ব্যবসায়ে বিদ্যমান দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালীদের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে সকল বাণিজ্য ও ব্যাপার, সেগুলির একটা বড় অংশ প্রবাসী বাঙ্গালীদের হাতেই থাকা উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বেনারসী কাপড়ের কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্র-গৃহস্থের বিবাহে বেনারসী জোড় ও সাড়ী (অভাবে বিষ্ণুপুরের চেলীর জোড় ও সাড়ী) না হইলে চলে না। বেনারসীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এমন জরীর কাজযুক্ত চেলী বা রেশমের বস্ত্র বিষ্ণুপুরে এখনও তৈরী হয় নাই, তবে হওয়া উচিত; এতদ্ভিন্ন, বেনারসী জরীর কাজের কাপড়ের একটী আভিজাত্য আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে বেনারসী কাপড়ের এত আদর থাকায়, এ ভীষণ দুর্দিনেও বেনারসী বস্ত্র-শিল্প কতকটা রক্ষা পাইয়াছে—এ-কথা বেনারসী কাপড়ের ব্যবসায়ীর মুখে শুনিয়াছি। এই কাজ কাশী-প্রবাসী বাঙ্গালী কিছু-কিছু হাতে লইয়াছেন। আরও বেশী লোকের এই প্রকারের কাজে নামা উচিত। বাহির হইতে যে ঘিয়ের, মাছের ও অন্য খাদ্য-দ্রব্যের চালান আসে, সেদিকেও আমাদের অবহিত হইতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের মাল যাহা বাঙ্গালার বাহিরে অন্য প্রদেশে যায়, তাহা যথা-সম্ভব প্রবাসী বাঙ্গালীর হাত দিয়া যাহাতে যাইতে পারে তদ্বিষয়েও চেষ্টা করা উচিত। ব্যাপারটী সোজা বা সহজ-সাধ্য নহে। এক তো আমাদের বাণিজ্যের উপযুক্ত বুদ্ধি বা তদ্বিষয়ে রুচি নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রতিকূলতা অনেক। পয়সা উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনও sentiment বা সুকুমার ভাব নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যে যাহারা টাকা করিতে নামে তাহারা (অন্য বহু ব্যবসায়েরই মত) অনেক সময়ে নির্মম হৃদয়হীনতার ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙ্গালার সহিত গুজরাটের কলওয়ালা ও বণিক্‌দিগের ব্যবহার আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত।

বৃহত্তর বঙ্গে বাঙ্গালীর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য চেষ্টা—আমার মনে হয়, এ বিষয় এখন কিছুকালের জন্য ধামা-চাপা থাক্। এখন ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সাহিত্যিক ব্যসনের সময় এখন নাই। প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েরা ঘরে বাপ-মায়ের সঙ্গে বাঙ্গালা বলিবে, এবং অন্ততঃ বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে শিখিবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে

এইটুকু হইলেই যথেষ্ট। যাতায়াতের সুবিধার প্রসাদে বঙ্গের সঙ্গে "বৃহত্তর বঙ্গ"র যোগসূত্র সহজে নষ্ট হইবার নহে ; বৈবাহিক আদান-প্রদান যতদিন স্বশ্রেণীর বা স্বজাতির মধ্যেই হইবে, ততদিন প্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা আম্বেরের 'শিলামাতা' যশোহরেশ্বরীর পুরোহিতদের মত অথবা করৌলীর গোস্বামীদের মত আর সহজে হইবে না। স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ বন্ধ হইলে, অর্থাৎ বিবাহ-বিষয়ে আধুনিক হিঁদুস্থানী যে ভাবে চলিতেছে তাহা অচল হইলে, প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ঘুচিবার বেশী দেরী আর থাকিবে না।

"বৃহত্তর বঙ্গ" যাঁহাদের লইয়া, তাঁহারা আর একটী জিনিস সহজে করিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা বঙ্গদেশের তথা ভারতের সেবা করিতে পারেন। বাঙ্গালীর সহিত অন্য প্রদেশের লোকেদের, এবং অন্য প্রদেশের লোকদের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় তাঁহাদেরই দ্বারাই ভাল করিয়া হইতে পারে। এই কাজের জন্য তাঁহাদের মাতৃভাবা ভাল করিয়া শেখা উচিত, এবং স্থানীয় ভাষাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষার মত করিয়া লওয়া উচিত। হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া সাহিত্যে কতকগুলি বাঙ্গালী সম্মানের স্থান করিয়া লইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে কম আনন্দের ও গৌরবের কথা নহে। রাধানাথ রায়, অমৃতলাল চক্রবর্তী, বাবু যমুনাদাস, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—ইঁহারাই যথার্থ বৃহত্তর-বঙ্গের সেবক। হিন্দী, উর্দু, রাজস্থানী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, মারহাট্টী প্রভৃতি ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করা—এ দিক্ দিয়াই তাঁহাদের বঙ্গবাণীর সেবা সার্থক হইতে পারে। অবশ্য যাঁহার শক্তি আছে, যে অবস্থায় থাকুন না কেন সেই অবস্থাতেই তিনি সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর বঙ্গ" ধরিব না—সেখানে "বৃহত্তর ভারত" বিদ্যমান, —সেখানে দু-পাঁচজন বাঙ্গালী থাকিলে একত্র মিলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা গান, বাঙ্গালার বিশিষ্ট সংস্কৃতি লইয়া আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু বিদেশীর সমক্ষে বিশেষ ভাবে বাঙ্গালার তিলক কপালে পরিয়া বেড়াইলে, সমগ্র ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য একত্বের বিরুদ্ধেই কার্য্য করা হইবে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ভারতের বাহিরে কোথাও "বৃহত্তর বঙ্গ গড়িয়া উঠে নাই। বর্মা— সে তো এতাবৎ ভারতের অংশ হইয়া ছিল। বর্মায় প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালী মুসলমান (কৃষক ও নাবিক শ্রেণীর লোক) যায়, কিছু-কিছু কেরানী যায় ; অন্য

প্রদেশ হইতে তেলুগু ও তামিল কুলি, শিখ পাহারাওয়ালা, হিন্দুস্থানী দরোয়ান, উড়িয়া মালী ও মিস্ত্রী, এবং খোজা ও ভাটিয়া, চেট্টি, চুলিয়া ও লাব্বে যায়। তাহারা এতাবৎ বর্মীদের সংস্কৃতিতে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। সকলের এক উদ্দেশ্য —কোনও রকমে বর্মার লোকেদের কাছ হইতে পয়সা উপার্জন করা, অথবা চাকুরি-জীবী হইলে, কোনও রকমে চাকুরিটুকু বজায় রাখা। বর্মায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অভাব নাই; এবং বর্মী জানেন, বেশ ভাল রকম বর্মী জানেন, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীও অপ্রচুর নহে। কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী হিন্দু বর্মার বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা বাড়াইয়া তুলিতে পারিয়াছেন? ভারতবর্ষীয়েরা বর্মীদের কাছে "কালা খোয়ে" অর্থাৎ "সাগর পারের কুকুর" মাত্র রহিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে ক্রমে একটা তীব্র ভারতীয়-বিদ্বেষ দেখা যাইতেছে—তাহার বহু নিষ্ঠুর পরিচয় আমরা খবরের কাগজে পড়িতেছি। ভারতীয় সংস্কৃতি বর্মীদের দ্বারে পহুঁছাইয়া দিতে কয় জন চেষ্টা করিয়াছেন? বর্মীদের সম্বন্ধেও আমরা কতকটা অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছি—তাহাদের ব্যবহারিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোনও খবর আমাদের কাছে পহুঁছায় নাই।

বর্মার বাহিরে অন্যত্র বাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য। শ্যামদেশে দুই এক জন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কেরানী; মালয়েও তাই, অধিকন্তু দুই চারিজন ব্যারিস্টার; পূর্ব-আফ্রিকায়, কেনিয়ায় ও তাঙাঞ্জিকায় দুই-চারিজন বাঙ্গালী আছেন শুনিয়াছি। ইংলাণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্মানীতে কিছু কিছু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী গুরুকুল-বাস করিতে যান মাত্র, স্থায়ী ভারতীয় অধিবাসী খুবই কম। সুতরাং ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর বঙ্গ"-র কথা উপস্থিত ক্ষেত্রে কাজের কথা নহে।

উপসংহারে খালি এই কথা বলিতে চাই—বাঙ্গালী ঘরে বড় হইলেই বাহিরেও বড় হইবে। "বৃহত্তর বঙ্গ"-কে একটি জীবন্ত আদর্শ হিসাবে সার্থক করিতে গেলে, প্রবাসী বাঙ্গালীর দায়িত্ব খুবই আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ দায়িত্ব, ঘরবাসী বা বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর। বাঙ্গালা চারিত্র্য যুক্ত হইলে, ঘরে-বাহিরে, পথে-প্রবাসে সর্বত্র তাহার জয় হইবেই।

"বৃহত্তর বঙ্গ", "বৃহত্তর বঙ্গ" বলিয়া চীৎকার করিয়া কোন লাভ নাই। ইংরেজের middleman হইয়া, ইহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া যে বৃহত্তর-বঙ্গের প্রতিষ্ঠা, তাহার কোনও স্থায়ী ফল দেখা যাইতেছে না। উৎকট বাঙ্গালীয়ানা লইয়া বাঙ্গালী ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্য যে

অস্ত্র, আত্ম-প্রসারের জন্য সে অস্ত্র অনেক সময়ে মোটেই উপযোগী হয় না। সমগ্র ভারতের একাত্মতা-বোধ ভিন্ন আন্তঃপ্রাদেশিক ঐক্য হওয়া সম্ভবপর নহে। এক প্রদেশ কর্তৃক অন্য প্রদেশের উপরে আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রভাব চলিতে পারে না; অর্থ-নৈতিক প্রভাব বা চাপ কখনও কেহ সহ্য করিবে না। গুজরাট, মারওয়াড়, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের অর্থ-নৈতিক exploitation বা শোষণ আমাদের প্রাণপণে প্রতিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু ঐ সব প্রদেশ হইতে যদি আমরা কোনও মানসিক বা আধ্যাত্মিক বস্তু পাই, তাহা সাদরে গ্রহণ করিব। সমগ্র ভারত এক, ভারতের অখণ্ড ও অচ্ছেদ্য একত্ব—এই বোধ আমাদের হিন্দু সংস্কৃতিতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান; ইংরেজের শাসনে নূতন যুগে এই কথাই বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে শুনাইয়াছে—ইহাতেই তাহার প্রধান গৌরব; বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ ভূদেব রবীন্দ্রনাথের বাণী, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ভারতের একতাবোধকে দৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছিল; তাই ১৯০৪ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নেতৃত্ব সমস্ত ভারত এক রকম মানিয়াই লইয়াছিল। অবশ্য বাঙ্গালীর কল্পনা ও চিন্তাশক্তি এবং শিক্ষা-বিষয়ে যোগ্যতা ইহার মূলে ছিল। এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেমন জ্ঞান ও শক্তির বৃদ্ধি হইতেছে, এদিকে তেমন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া আমরা শক্তিহীন হইতেছি। ঘর সামলাইয়া লইলেই বাহির আপনা হইতেই নিজেকে সামলাইবে। জ্ঞানে, চারিত্র্যে, কর্মশীলতায় বাঙ্গালা আবার যখন বড় হইবে, এবং উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত যথার্থ মানুষের সংখ্যা যখন বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশী করিয়া হইবে, তখনই বাঙ্গালী যেখানেই যাইবে, সেখানেই নূতন-ভাবে এক গৌরবময় "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে॥

কাশী

তিন বৎসর ধরিয়া ভারতের বাহিরে গুরুকুল-বাস করিয়া দেশে ফিরিয়াছি। বিদেশের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নগর দেখিয়া আসিয়াছি—এডিন্‌বরা, অক্‌স্‌ফোর্ড, প্যারিস্‌, বার্লিন, ড্রেস্‌ডেন, ন্যুর্‌ন্‌ব্যার্গ্‌, মিউনিক্‌, মিলান, জেনোয়া, পিসা, ভেনিস, ফ্লরেন্স, রোম, নেপল্‌স্‌, আথেন্স; সৌধে দেবায়তনে চিত্রশালায় অমরাপুরীবৎ সুন্দর এক-একটী নগরী; আবার ইহাদের প্রত্যেকটীই কোনও-না-কোনও প্রকারের শিল্প-কার্য্যের জন্য বিখ্যাত—ফরাসীতে যাহাকে বলে Ville d'Art —কলা-নগরী বা শিল্পসুষমাময় নগরী। ইহাদের মধ্যে একটীতে—পারিস্‌-এ—প্রায় বৎসরকাল ধরিয়া বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, এবং এই শহরকে মনে-প্রাণে ভালবাসিতেও আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই সমস্ত শহর কত প্রাচীন কীর্ত্তি, মধ্য-যুগের ও কচিৎ প্রাচীন-যুগের ইউরোপের কত প্রাচীন স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যমান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও এই নগরগুলি অতুলনীয়—কোথাও নদী, কোথাও বা পর্বত, কোথাও বা সাগর এই সকল স্থানকে নয়নাভিরাম করিয়া রাখিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মানুষের কৃতিশিল্প, দুইয়ে যেন প্রতিযোগিতা করিয়া, এই সব শহরকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ইউরোপে বাস ও ভ্রমণের কালে যখন এই সব নগর দেখিতাম, তখন অহরহঃ আমাদের দেশের একটী নগরের কথা মনে জাগিত, এবং আবার ভাল করিয়া সেই নগর দেখিবার জন্য ও তাহার ভাব-ধারায় স্নান করিবার জন্য মনে এক বিপুল আকাঙ্ক্ষাময় আবেগ আসিত। সেই নগরটী হইতেছে কাশী। বাহিরের অনেক ভাল জিনিস দেখিয়া আসিয়া, তুলনা করিয়া ঘরের কোনও জিনিস যে সত্যই সুন্দর তাহা যখন বুঝিতে পারা যায়, তখন বাস্তবিকই মনে একটা আনন্দ জাগে। সত্যই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দর Ville d'Art গুলির মধ্যে যে কাশী অন্যতম, একথা জোর গলায় বলা যায়। আমরা বাঙ্গালীরা এই হিসাবে দুর্ভাগ্য—কাশী বা মথুরা, জয়পুর বা আগরার মত একটী কলা-নগরী বাঙ্গালা দেশে গড়িয়া উঠিল না। এইরূপ একটীমাত্র নগরী সারা বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দেখা যায়,—সেটী হইতেছে বিষ্ণুপুর; বিষ্ণুপুর প্রাচীন মন্দিরে ও নানাবিধ শিল্পকার্য্যে বাঙ্গালা-দেশের সমস্ত নগরগুলির শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরকে বাঙ্গালী জন-সাধারণ চিনিল না, দেখিল না, আদর করিতে শিখিল না।

এমন বাঙ্গালী কে আছে, এমন ভারতীয় হিন্দুও কে আছে, কাশী যাহার ভাল লাগে না? কোন্ কৈশোর বয়সে, সেই দূর স্বপ্নের মত ২৫।২৬ বৎসর পূর্বেকার কালে, প্রথম কাশী দেখিয়াছিলাম। তখন কাশীর প্রবহমাণ জীবনের দৃশ্যপটগুলিতে যে মোহন তূলিকাপাত দেখিয়াছিলাম, সে তূলির টান আমার সোনার কাশী হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। রাজঘাট স্টেশনে নামিয়া, একখানি এক্কা করিয়া সুদীর্ঘ পথ ধরিয়া বাঙ্গালীটোলায় আসি, আমার এক পিসিমা কাশীবাস করিতেছিলেন, তাঁহার বাসায় উঠি। কলিকাতায় ট্রাম ও ঘোড়ার গাড়ী মুখরিত, জনাকীর্ণ ও আমার চোখে বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যহীন রাস্তার অতি সুপরিচিত এক-ঘেয়েমির পরে—তবুও সে যুগে তখন মোটর-গাড়ীর এত ছড়াছড়ি ছিল না, এবং বাস্ তখনও হয় নাই—কাশীর রাস্তাতেই আমার চিত্ত হরণ করিল। এ জিনিস যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত-রূপে সুন্দর; কলিকাতায় বসিয়া, প্রাচীন-ভারতের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা যেন মূর্তিমতী হইয়া এই কাশীতেই আমার নিকট ধরা দিল। কলিকাতায় কাশীর লোকের অসদ্ভাব নাই—কিন্তু কাশীর রাস্তায় তাহাদের দেখিয়া অন্য রকম লাগিল। গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে আলোকিত ও উত্তপ্ত রাস্তা; বিরাট্‌কায় তিনটী করিয়া বলীবর্দের দ্বারা বাহিত গোযান,—গোরু ও গাড়ীর আকার এবং গাড়ীর চাকা, সবই আমাদের বাংলা-দেশের তুলনায় কতটা বড় এবং কতটা শক্তির ব্যঞ্জক! খোলার-চালের বাড়ীর শ্রেণীর মাঝে-মাঝে দুই-একখানা করিয়া ইটের বা পাথরের ইমারত; সব-চেয়ে চমৎকার বাগিল, পাথরের বারান্দাগুলি—বাড়ীর ছাতের ধারে অস্বচ্ছ পাতলা-পাতলা পাথরের আলিসাগুলি যেন রোমান্সের আকর স্বরূপ দণ্ডায়মান—সেগুলিতে আবার একটু করিয়া রেখা টানিয়া বা পদ্মপাতার নক্‌শা কাটিয়া খুদিয়া দেওয়া হইয়াছে। জরীর পাড় দেওয়া লাল হ'ল্‌দে সবুজ বেগুনে' নানা রঙের দুপট্টা বা চাদর পরিয়া অত্যন্ত শালীনতার সহিত সমস্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া, কাশীর মেয়েরা—গিন্নী ঝী বৌ সকলে গঙ্গা-স্নান সারিয়া ফিরিতেছে; ইহাদের গতি-ভঙ্গী কেমন শুদ্ধ ও সুন্দর লাগিল! নথ-নাকে, হ'ল্‌দে কাপড়-পরা দুই একটী ছোট মেয়ে—কন্যা-রূপিণী গৌরী-মাতা হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়া যেন কাশীর রাস্তায় অবতীর্ণা। এক্কা গাড়ীর গাড়োয়ান, গাড়ীর সামনে মেয়েরা আসিয়া পড়িলে হাঁক দিতেছে—'এ মাঈ, এ মা-জী!' পুরুষ আসিলে বলিতেছে 'এ ভৈয়া, এ দাদা!'—কই' ইহারা তো কলিকাতার গাড়োয়ানদের মত পথচারী পথিকের সঙ্গে গর্বদৃপ্ত-ভাবে দুর্ব্যবহার করে না! পরে যখন কাশীর ঘাটের শোভা দেখিলাম—পিসিমার সঙ্গে

ঘাটের উপর দিয়া হাঁটিয়া-হাঁটিয়া কেদার-ঘাট হইতে বিশ্বনাথ-দর্শনের জন্য দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত আসিলাম, তখন উদার প্রস্তরময় সোপানরাজি ও উচ্চশীর্ষ প্রাসাদাবলী আমাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। 'কি সুন্দর! কি সুন্দর!'—এই এক কথার আবৃত্তি ছাড়া ভাষায় আর কথা কুলাইল না।

তার পরে বহুবার কাশী গিয়াছি। কিন্তু কাশীর সেই প্রথম দিনের মোহ আর কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না। কাশীর পরিবর্তন অনেক হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু কাশীর ভিতরকার রহস্য, কাশীর কাশীত্ব—এখনও যেন যাইয়াও যায় নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার কাশীখণ্ডে সামসময়িক কাশীর যে জীবন্ত ও উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন, আধুনিক কাশীতে সেই চিত্রের অনেকটা এখনও পাওয়া যায়। ভেনিস্-এর কানাল্-গ্রাণ্ডের খালের পাড় দিয়াই বেড়াই, বা মিউনিকে Isar ইজার নদীর সগর্জন দ্রুত বেগই দেখি, বা পারিসে বিকালে এক পশলা বৃষ্টির পরে আকাশে মেঘের গায়ে আর শহরের পুরাতন বাড়ীর দেওয়ালে আর রাস্তার ধারের গাছপালায় নানা অপূর্ব-সুন্দর রঙের সমাবেশই দেখি—কাশীর ঘাটে বসিয়া, লোকেদের স্নান-আহ্নিক দেখিতে-দেখিতে গঙ্গার সুশীতল বায়ুর জন্য প্রাণের ভিতরে যেন হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিত।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে আবার কাশীতে আসিলাম—এক পূজার ছুটীতে। বোধ হয় পাঁচ বৎসর পরে কাশীর পুনর্দর্শন। ইহার মধ্যে অনেক কিছু দেখিয়া আসিয়াছি, জীবনে অনেক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। পিসিমা বহুদিন হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন—এবার উঠিলাম অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। হালের বিলাত-ফেরত—আমার স্নানের জন্য ঘরের ভিতরে জলের ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া, নিজেই একটু তেল চাহিয়া লইয়া, গামছা কাঁধে ফেলিয়া, গঙ্গায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। অগত্যা আত্মীয়টীও সঙ্গে চলিলেন—কিন্তু ইহাতে তিনি যে অখুশী হইলেন তাহা বলিতে পারি না। খালি পায়ে বাঙ্গালীটোলার চির-পরিচিত সেই-সব সরু গলি দিয়া আসিলাম। হাতীফটকের কাছে দেওয়ালের গায়ে কালো রঙে আঁকা হাতীটা এখনও রহিয়াছে, কিন্তু রঙটা জুবড়িয়া গিয়াছে, রেখাগুলি আর তেমন সুস্পষ্ট নাই। পাঁড়ে-ঘাট বাড়ীর কাছে পড়ে, পাঁড়ে-ঘাটেই আসিলাম। ছোট ঘাটটী, ঠিক যেন ঘরোয়া ব্যাপার। যাহারা নাহিতে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালীই বেশী—ঘাটটী বাঙ্গালা দেশের কোনও স্থান বলিয়া যেন ভ্রম হয়। পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচ চাতালের উপর জল দিয়া এক ঘাটোয়াল ব্রাহ্মণ, বিরাট

বাঁখারির ছাতার তলে বসিয়া স্নান-নিরত 'যজমান'দের কাপড় আগলাইতেছে, কোথাও বা সদ্য-স্নাত শিশুদের চন্দন পরাইয়া দিতেছে। জল অনেকটা নামিয়া গিয়াছে—ঘাটের উপরিভাগে সিঁড়ির ধাপের পাশে পাশে দণ্ডীদের জন্য যে কতকগুলি ঘর আছে, জল চলিয়া যাওয়ায় তাহার দুই একখানা খালি হইয়াছে। শরতের রৌদ্রে চারিদিক উদ্ভাসিত। পাশেই মুন্সী-ঘাট ও দারভাঙ্গা-ঘাটের বিরাট্ ও সু-উচ্চ প্রস্তরময় সৌধাবলী—কল-নাদিনী প্রসন্ন-সলিলা গঙ্গার পবিত্র কূলে বাস্তু-শিল্পের ধ্রুপদ-সঙ্গীত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিছু দূরে অহল্যা-ঘাটের পরেই দশাশ্বমেধ-ঘাটের লাল পাথরের মন্দিরটী, চূড়ার উপর বট ও অশ্বত্থ গাছ গজাইয়াছে। ঘাটের মাথার উপরে, পাথরের ফটকের পাশে দুই-একটী অশথ গাছ, হাওয়ায় তাহাদের সবুজ পাতা কাঁপিতেছে। আকাশের হাসি, নদীর স্বচ্ছ জলের একটানা স্রোতে যেন প্রতিফলিত হইয়াছে। বহুক্ষণ ধরিয়া মুগ্ধ নেত্রে এই শান্ত সৌন্দর্য্য দেখিলাম—নয়ন যেন তৃপ্ত হইতে চাহে না। তারপরে গঙ্গায় স্নান—সে স্নানে কি তৃপ্তি! যদিও শহরের সমস্ত ময়লা জল দুই-তিনটা নহর দিয়া এই সব ঘাটের পাশ দিয়াই বহিয়া আসিয়া গঙ্গার জলকে কলুষিত করিতেছে, ইহা চোখের দেখা বলিয়া মনের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে অপ্রসন্নতা আসিতেছিল তাহা হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি নাই।

কাশীর আবর্জনা, কাশীর পঙ্কিলতা সত্ত্বেও, বাস্তবিকই কাশী অপূর্ব স্থান। এই শহর আমাদের হিন্দু সভ্যতার যথার্থ পীঠস্থান। স্থান-হিসাবে আধুনিক কাশী বিশেষ পুরাতন শহর নহে। উত্তর-বাহিনী গঙ্গার তীরে অবস্থিত আধুনিক কাশীতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্বেকার কোন গৃহাদি নাই। কাশীর সব-চেয়ে পুরাতন বাড়ী হইতেছে প্রাচীন বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। আকবরের সময়ের তৈয়ারী রাজা মানসিংহের প্রাসাদ—আধুনিক মান-মন্দিরের প্রাচীন অংশ, যে অংশে ভারতীয় বাস্তুশিল্পের এক অপূর্ব সৃষ্টি, মান-মন্দিরের বিখ্যাত ঝরোখাটী, ঘাটের উপরে প্রলম্বিত হইয়া আছে—মানমন্দিরের সেই অংশ আর একটী উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ইমারত। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দির অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক প্রস্তুত হয়। মুখ্যতঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকেই আধুনিক কাশী গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন কাশী ছিল সারনাথের দিকে, বরুণার ধারে। তাহার পরে কাশী দক্ষিণে গঙ্গা ধ'রিয়া বিস্তৃত হয়। উপনিষদের যুগ হইতে কাশি-জাতির কথা শুনা যায়। বুদ্ধদেব যখন তাঁহার বাণী প্রথম প্রচার করিতে ইচ্ছুক হন, তখন তিনি সারনাথের নিকট অবস্থিত কাশীতেই আগমন করেন। কাশী শিব-স্থান

রূপে পরিচিত হয় ইহার বহু পরে। বিগত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া কাশী হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

বিদেশের একটী মাত্র শহর আমাদের কাশীর কথা প্রতিপদে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই শহরটী হইতেছে ভেনিস্। কেবল এখানে গঙ্গার বদলে ভেনিসের বৈশিষ্ট্য খালের ছাড়াছড়ি, আর হিন্দু মন্দিরের বদলে রোমান-কাথলিক ধর্মের গির্জা। কাশীর গলিগুলিতে যেখানে-সেখানে যেমন শিবলিঙ্গের ছড়াছড়ি, ভেনিসেও তেমনি যেখানে-সেখানে, লোকের বাড়ীর দেওয়ালে ছোট-ছোট কুলুঙ্গীতে যীশু বা মা-মেরীর মূর্তি। সকালে স্নানের পর মেয়েরা কাশীতে যেমন এই সব শিবের মাথায় এক কুশী করিয়া গঙ্গাজল আর এক-একটি করিয়া ফুল বা বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিয়া যায়, তেমনি ভেনিসে এই সব যীশু বা মেরীর মূর্তির সামনে মেয়েরা সন্ধ্যায় একটী করিয়া বাতী জ্বালাইয়া দিয়া যায়, হাত যোড় করিয়া প্রার্থনার মন্ত্রও পড়ে। কাশীতে হিন্দু মধ্য-যুগের জগতের আব-হাওয়া পূরামাত্রায় বিদ্যমান; ভেনিসে তেমনি মধ্য-যুগের ইতালির রোমান-কাথলিক ভাবই প্রবল। কাশীর কাঠের খেলনা, পাথরের কাজ, পিতলের কাজ, সোনা-রূপার কাজ, রেশমের কাজ, কিংখাব, নানা-প্রকার বিলাসের দ্রব্য বিখ্যাত; ভেনিসও তেমনি কতকগুলি বিশিষ্ট শিল্পের কেন্দ্র—পিতলের ঢালাই কাজ, কাচের শিল্প, পাথরের কাজ, সাটিন, কিংখাব। পার্থক্য এই যে, ভেনিসের লোকেরা তাহাদের প্রাচীন নগরের গৌরব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, নগরে প্রাচীন সৌন্দর্য্য সংরক্ষণে তাহারা বিশেষভাবে সচেষ্ট; কিন্তু কাশীর লোকেরা যেন সে বিষয়ে নিতান্তই উদাসীন।

কাশীর গৌরব—তাহার গঙ্গার তীরের ঘাট, এবং তাহার সরু গলিগুলি। ভেনিস্ এবং নেপল্‌স্-এ এইরূপ সরু গলির অসদ্ভাব নাই। তবে সেখানে এগুলিকে যথাবৎ রক্ষা করা হইতেছে, গলিগুলিকে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখিবার জন্য উপযুক্ত অর্থব্যয়ও করা হইতেছে। কাশার মত, গলিগুলিকে অশ্রদ্ধার চোখে না দেখিয়া, এবং পুরাতনপ্রাসাদ ও অন্য বাড়ী ভাঙ্গিয়া সেগুলিকে দূরীভূত করিয়া, চওড়া-চওড়া রাস্তা তৈয়ারী করিয়া 'আধুনিক' হইবার চেষ্টা, ইউরোপের ঐ সব শহরের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে দেখা যায় না। ভারতবর্ষের মত উষ্ণ দেশে চওড়া রাস্তায় দিনে অন্ততঃ তিনবার করিয়া প্রচুর জল দিবার ব্যবস্থা না রাখিলে, সেগুলি ধূলায় ধূলাকীর্ণ হইয়া থাকে। রৌদ্রে ও হাওয়ায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ধূলায় কাশীর বড় রাস্তাগুলি যখন নিতান্ত অস্বস্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর হয়, তখন পাথরে-মোড়া বাঙ্গালী-টোলা ও অন্য পুরাতন মহল্লার গলিগুলি পাশের বাড়ীর ছায়ায় কেমন

ঠাণ্ডা থাকে, সেখানে ধূলার উৎপাত মোটেই হয় না। সেক্রোল্-এর রাস্তায় একবার হাঁটিয়া ঘুরিয়া আসিলে দস্তুর-মত ধূলি-স্নান হইয়া যায়, পুনরায় ভাল করিয়া স্নান না করিলে গা ঘিণ-ঘিণ করে ; পুরাতন কাশীর গলির সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। অথচ সেক্রোল্-এর প্রতি যত্ন খুবই করা হয়, পুরাতন কাশীর গলিগুলিকে সাফ রাখিবার জন্য তেমন কোনও চেষ্টা হয় না।

কাশীর ঘাটগুলি ভারতের মধ্য-যুগের বাস্তু-শিল্পের এক অবিনশ্বর কীর্ত্তি, আধুনিক ভারতের—খালি আধুনিক ভারতের কেন, জগতের মধ্যে অন্যতম—অত্যাশ্চর্য্য দ্রষ্টব্য বস্তু এই ঘাটগুলি। ইহা কেবল ভারতবাসীরই সম্পৎ নহে, ইহা বিশ্বমানবের সাধারণ-ভাবে উপভোগ্য, প্রাচীন জগৎ হইতে প্রাপ্ত একটী রিক্থ। প্রতি বৎসর লক্ষ-লক্ষ ভারত-সন্তান কাশীর ঘাট দেখিয়া ধন্য হইয়া যান—সহস্র-বিদেশীও কাশীর ঘাটের শোভা দেখিতে আইসেন, এবং ফোটোগ্রাফের কামেরায় বা তূলির আঁচড়ের সাহায্যে ঘাটের সৌন্দর্য্যের কণামাত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে এবং তাহাদের দর্শন জনিত আনন্দকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের এখনকার হিন্দু জীবন ও হিন্দু সভ্যতা বিদ্যমান, তথাপি এই জীবনেরই একটা বড় অংশ-স্বরূপ কাশীর ঘাট, সাধারণতঃ বিরুদ্ধ-ভাবে অনুপ্রাণিত বিদেশীরও মন হরণ করিয়া থাকে। এই ঘাটগুলি National Monument বা ভারতের জাতীয় বাস্তুসম্পৎ-স্বরূপ ভারত সরকার হইতে উপযুক্ত অর্থব্যয় করিয়া সংরক্ষিত হওয়া উচিত। কিন্তু হায়, তাহা হইবার নহে। সরকারের এ বিষয়ে মন দিবার সময় বা ইচ্ছা নাই। কাশীর লোকেরাও উদাসীন, অথবা এ সম্বন্ধে কিছু করিবার উপযুক্ত জ্ঞান ও অর্থবল উভয়ই তাহাদের নাই। অথচ কাশীর ঘাটের সম্বন্ধে মাঝে এক ভীতিপ্রদ কথা শুনা গিয়াছিল ; ঘাটগুলি যে উন্নত ভূখণ্ডে অবস্থিত, উত্তর-বাহিনী গঙ্গার চাপে নাকি সেই ভূখণ্ড অনতিদূর ভবিষ্যতে ধ্বসিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। এইরূপ ব্যাপার ঘটিলে কাশীর ঘাটগুলি গঙ্গা-গর্ভে বিলীন হইয়া অতীতের বস্তু হইয়া যাইবে। এই বিপৎপাত হইতে ঘাটগুলিকে যে-করিয়াই-হউক বাঁচানো আবশ্যক। নদীর জল অন্য পথে চালাইয়া, উত্তর মুখে কাশীর অপর পারের কোল দিয়া বহাইতে পারা যায়, কিন্তু তাহা হইলে ঘাটগুলির সামনে আর জল থাকিবে না, কাশীর ঘাট কেবল সিঁড়ির কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইবে—বৃন্দাবনের ঘাট হইতে যমুনা সরিয়া যাওয়ায় বৃন্দাবনের যে দুর্দশা হইয়াছে কাশীরও সেই দুর্দশা হইবে। গঙ্গার জল যাহাতে এখনকার মত ঘাটের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, অথচ তাহার গতিবেগে যে ভূভাগের উপরে ঘাটগুলি

অবস্থিত সেই ভূভাগও বিপন্ন না হয়, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কাশীর মিউনিসিপ্যালিটি এ বিষয়ে একটু চিন্তিত হইয়াছেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ পূর্তবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মতও লইয়াছিলেন—কিন্তু শেষে কি ব্যবস্থা ইহারা করিলেন তাহা জানিতে পারি নাই। সমবেত-ভাবে সমগ্র হিন্দুজাতির চিন্তা ও পরামর্শের, এবং রক্ষার জন্য উপায় নির্ধারণের ব্যাপার এইটী।

যাঁহারা কাশীর মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্যের কণা-মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কাশীর মত নগর মানুষের চিত্তকে শুদ্ধ শান্ত ও সমাহিত করিতে কতদূর পর্য্যন্ত সমর্থ হয়। বাস্তবিক, একটী নগরী, মানব-জীবনের পক্ষে কত বড় একটা আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রভাবের আকর-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা বার-বার কাশী দেখিয়া, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমরা বলিতে পারি। রোম, যেরূশালেম প্রভৃতি সুপ্রাচীন ধর্মক্ষেত্র সমগ্র জাতিকে-জাতির জীবনে কিরূপ অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, তাহা আমরা ইউরোপের ইতিহাস হইতে, য়িহুদী জাতির ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। একটী প্রাচীন দেবক্ষেত্রে বা ধর্মক্ষেত্রে, মন্দিরের অবস্থানে ও ভক্তদের সমাগমে যে ভাব-প্রবাহ বিদ্যমান, মনে হয় যেন তাহার সহিত অদৃশ্য জগতেরও যোগ আছে। একটী বিরাট্ দেবমন্দির, বিরাট্ অরণ্যানী, দিক্‌চক্রবাল-বেষ্টিত মহাসাগর, অথবা, আকাশ চুম্বী পর্বতের ন্যায়ই মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে। অন্য প্রকারের শিল্পের মত বাস্তু-শিল্পের বিরাট্ সৃষ্টির যে একটা আধ্যাত্মিক বাণী আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। মদুরার বা শ্রীরঙ্গম্-এর সুবৃহৎ মন্দির, বা মিলান-এর সুবিশাল গির্জা, অথবা ফ্রান্সের কোনও গথিক গির্জার সহিত শিশুকাল হইতে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করাকে জীবনের একটী কাম্য সৌভাগ্য বলিয়া গণনা করা যায়। এই সকল বিরাট হর্ম্ম্য, সু-উচ্চ স্তম্ভাবলী, প্রশস্ত অলিন্দ, সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাবের ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সমস্ত মিলাইয়া যেন ঈশ্বরারাধনার ঐকতান সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এগুলির মধ্যে বিচরণ করিয়া, ইহাদের মধ্য দিয়া প্রবহমাণ অমৃতধারা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে পান করা বা সেই অমৃত-ধারায় স্নান করা, জীবনে নিরতিশয় দুর্লভ বস্তু ; বই না পড়িয়া, জীবনের সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ বস্তু-সমূহ দেখিয়া যে শিক্ষা হয়, সেই শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, এইরূপ কোন নগরের আব-হাওয়ার মধ্যে শিশুকাল হইতে পরিবর্ধিত হওয়া। সমগ্র কাশী নগরী যেন একটী বিরাট মন্দির—কাশীর ঘাটগুলি, কাশীর গলিগুলি, কাশীর প্রধান ও অপ্রধান সমস্ত মন্দির, যেন একটী

অখণ্ড দেবায়তনেরই বিভিন্ন অংশ। সর্বোপরি, কাশীতে বিশ্বপিতার ও বিশ্বমাতার যে প্রকাশের আবাহন ও আরাধনা অহরহঃ চলিতেছে, শিব-উমা-ময় সেই প্রকাশ অপেক্ষা ঐশী শক্তির গভীরতর ও ব্যাপকতর কল্পনা আর কোথাও হয় নাই। হিন্দু দর্শন ও চিন্তার এবং হিন্দুর আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরম প্রতীক—শিব ও উমা, এবং বিষ্ণু ও শ্রী। জ্ঞানময় ঈশ্বর ও প্রেমময় ঈশ্বর—শিব ও বিষ্ণু—এই দুই মহনীয় মূর্তির পাদপীঠের নিকটে আর কোন্ দেব-কল্পনা পঁহুছিতে পারে? সর্বজাতির ও সর্বধর্মের সমন্বয় এই দুই প্রতীকের মধ্যেই বিদ্যমান। মানুষের প্রকৃতি ও শিক্ষা এবং রুচি ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে এই দুই ভাবের মধ্যে অন্যতর ভাবটী মানুষকে অভিভূত করে। আমাদের কাশী-নগরী এই শিবেরই মহিমা দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দিকে শিবের লিঙ্গময় মূর্তি বিরাজমান; পথ-ঘাট মন্দির-প্রাঙ্গণ সমস্তই শিবের নামে মুখরিত—'হর হর বম্ বম্', 'শিব শিব শম্ভো', 'মহাদেব মহাদেব', দেবতার জন্য এই সব আহ্বান-বাণী, কাশীতেই যেন এক বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। ঊর্ধ্বে শরতের সন্ধ্যা-গগন যখন ধূসর-বর্ণ, কোয়াসার মধ্যে দুই একটী নক্ষত্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, এবং নিম্নে গঙ্গার সলিল, ঘাটের পাথরের গায়ে লাগিয়া 'ছলচ্ছল্-টলটল্-কলকল্ তরঙ্গে' চলিয়াছে; ঘাটের পাথরের উপরে, কিংবা জলের উপরে কাঠের পাটাতনে বসিয়া, সন্ধ্যা-বন্দনায় তন্ময় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মুখে ভক্তি-ভাবের অপূর্ব প্রকাশ; ওদিকে রাত্রির আরতির জন্য নাট্টুকোটা-চেট্টীদের সত্র হইতে সন্ন্যাসীরা, 'শম্ভো শিব শিব' রবে ভক্তের প্রাণে অপূর্ব উন্মাদনা ও আকুলতা আনিয়া, রাজমার্গ দিয়া পূজার রৌপ্যময় তৈজস-পাত্র ও গঙ্গাজল ও দুগ্ধাদি উপকরণ লইয়া যাইতেছে; কেদার-ঘাটে তামিল ভক্ত বসিয়া, মাণিক্ক-বাশগর্-এর মধুস্রাবী স্তোত্র গাহিয়া যাইতেছে—ভাষা না বুঝিলেও, সেই স্তোত্রের ধ্বনির ঝঙ্কার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রাণের মধ্যে এক আলোড়ন আনিয়া দেয়, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া দেয়; নির্জন প্রাসাদের পদ-তলে গঙ্গার উপরে চবুতরায় মৃগ-চর্মের উপর বসিয়া সন্ন্যাসী শ্রুতি-সুখকর স্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠে শিবমহিম্ন স্তোত্রের শিখরিণী ও মালিনী ছন্দোময় সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে; এবং শেষ—বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের শয়নারাত্রিকের ঘণ্টাধ্বনি ও পুরোহিতের সমবেত কণ্ঠে স্তবপাঠ;—এইরূপ মানবকণ্ঠোত্থিত সমস্ত আবেদন ও অর্চনা, যেন বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত, মানব-ভাষাতীত বাণীর সহিত মিলিত হইয়া—অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়কে সমীক্ষা, কল্পনা ও অনুভূতির সাহায্যে, জ্ঞাত ও পরিচিত এবং কচিৎ বা উপলব্ধ করিয়া লইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইতেছে। মানুষ নিজের অবস্থান-

ভূমির পারিপার্শ্বিককে দেবশক্তির পদচ্ছায়াতলে আনিয়া কত সুন্দর ও শোভন করিতে পারে ; জীবনের দৈনন্দিন কর্মের পটভূমিকা-স্বরূপ ঈশ্বরের সত্তা যে সদা-জাগ্রত—কাশীর ন্যায় ধর্ম-নগরী ও কলা-নগরী অহর্নিশ তাহাই আমাদের প্রত্যক্ষ করাইতেছে, সেই বাণী অহর্নিশ আমাদের কর্ণের গোচরে আনিতেছে। আমাদের এই উদ্দেশ্য-হীন লক্ষ্যভ্রষ্ট কর্ম-ব্যস্ত জীবনের মধ্যে শাশ্বতের এই আবাহন একটী পরম বরণীয় বস্তু ; কয়লার খনির খাদের ভিতরে আমরা দিনপাত করিতেছি, কাশীর ন্যায় নগর সেখানে মাঝে-মাঝে মহাসাগরের হাওয়া বহাইয়া দেয়, সেখানে রৌদ্রদীপ্ত আকাশ ও হরিদ্বর্ণ শষ্পের শোভা, এবং ঝরণার সঙ্গীত ও পাখীর গান আনিয়া দেয় ॥

আমাদের সামাজিক "প্রগতি"

তিন পুরুষ ধরিয়া কলিকাতায় আমাদের বাস, জীবনের চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রায় সমস্ত কলিকাতাতেই অর্জিত। এখানকার মধ্যবিত্ত সমাজ ছেলেবেলায় যেমন দেখিয়াছি, এখন আর সে-রকমটী নাই। পরিবর্তন যাহা ঘটিতেছে, তাহা আগে একটু মন্থর গতিতেই ঘটিতেছিল, কিন্তু বিগত কুড়ি বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্তনটা একটু দ্রুত গতিতে, একটু বিশেষ "উচ্চৈঃস্বরে" হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সামাজিক গতি এখন আর যেন স্বাভাবিক, সামঞ্জস্যময়, "গতি"-পদবাচ্য নহে, ইহা এখন "প্রগতি" হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার মধ্যে একটা অসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাব আছে ; নিজের খেয়ালে ও আবশ্যকতা অনুসারে না চলিয়া, সমাজ যেন এখন বাহির হইতে চাবুক খাইয়া ছুটিতে চাহিতেছে, দিশাহারা হইয়া কেবল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে পারিলেই যেন বাঁচে। কোনও-কোনও বিষয়ে কালোপযোগী পরিবর্তন ও উন্নতি অবশ্য আসিতেছে ; কিন্তু মোটের উপরে আমার মনে হইতেছে যে, যে-পথে আমাদের সামাজিক জীবন ধাবিত হইতেছে, সে পথ জাতীয় সমাজ ও জাতীয় চর্য্যার পক্ষে সুষ্ঠু পথ নহে, সে পথে চলিয়া শেষটা আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই।

দুই-একটা বিষয় লইয়া অবস্থাটী আলোচনা করা যাক্। নিমন্ত্রণ করিয়া লোক খাওয়ানো একটা বড় সামাজিক ব্যাপার। এই লোক খাওয়ানো আমাদের দেশে

দুই রকমের হয়; ইউরোপে—যতদূর আমার অভিজ্ঞতা—এই দুই রকমের হয় না, অন্ততঃ ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজে হয় না। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আমাদের "সামাজিক" ব্যাপারে আত্মীয়-কুটুম্ব, স্বজাতীয়, পরিচিত ব্যক্তি, বন্ধু, অল্প-পরিচিত ব্যক্তি, ইহাদের নিমন্ত্রণ করিতে হয়। এই নিমন্ত্রণে, সাধারণ সঙ্গতিযুক্ত গৃহস্থ কাহাকেও বাদ দিতে পারেন না। মাঝারী শ্রেণীর গৃহস্থ-বাড়ীতে চার-পাঁচ শত লোকের পাতা পড়া অতি সাধারণ ব্যাপার। এই প্রকারের নিমন্ত্রণে কলিকাতা অঞ্চলে লুচী খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় প্রকারের নিমন্ত্রণ—ঠিক "সামাজিক" বলিলে আমরা যাহা বুঝি, ইহা সে শ্রেণীর নহে। ইহা বন্ধু-খাওয়ানো—ইহাতে দুই-দশ জন কিংবা বিশ-পঞ্চাশ জন অন্তরঙ্গ বন্ধু অথবা আত্মীয়-কুটুম্বকে ভাল করিয়া খাওয়ানো হয়। সমাজ-প্রগতি আলোচনায় এ জিনিস ধর্তব্যের মধ্যে নহে। ইউরোপে সামাজিক ভোজ বলিলে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুসম্মিলনী মুখ্যতঃ বুঝায়। বিলাতে অবস্থানকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক ইংরেজ বন্ধুর নিকট কোনও একটী বিবাহের ঘটার কথা শুনিতেছিলাম। বন্ধুটী সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "এই বিবাহ উপলক্ষে একটী 'লাঞ্চ' বা মধ্যাহ্ন-ভোজ দেওয়া হয়, এবং তাহাতে চল্লিশ জন লোককে খাওয়ানো হইয়াছিল (Quite a swell affair—forty covers were laid for the luncheon)"। আমাদের সাধারণ ভদ্রগৃহে তিন-চারি শত লোক খাওয়ানো যে অতি সাধারণ ব্যাপার তাহা ইহারা কল্পনাই করিতে পারিত না। আমাদের দেশে ইহা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, পূর্ব-কালে যখন এই রীতি বা রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমাজে বিশেষ কোন চাল বা ভোগের আতিশয্য ছিল না, লোকে সাদা-সিধা ভাবে জীবন যাপন করিত, এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে আত্মীয়-কুটুম্ব, স্বজাতীয় স্বগ্রামবাসী, মিত্র এবং পরিচিতগণের সম্মেলনই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—অবশ্য ভোজনটাও অন্যতর বড় উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপ সমবেত সামাজিক উৎসবে গ্রামের লোক পরস্পরের সহায় হইত। তখন খাদ্যদ্রব্যও ছিল সুলভ, এবং সামান্য বস্তুতেই লোকের সন্তোষও হইত। একশ' বছর হইতে চলিল, "কুলীন-কুলসর্বস্ব" নাটকে ঔদরিক ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকারের ফলারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তখনকার দিনের উত্তম ফলারের বর্ণনা শুনিয়া, আজকালকার "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোকের রসনা সিক্ত হওয়া অপেক্ষা নাসিকাই কুঞ্চিত হইবে—"ঘিয়েভাজা তপ্ত লুচি, দু-চারি আদার কুচি, কচুরি তাহাতে খান দুই। ছক্কা আর শাক-ভাজা, মোতিচুর বঁদে খাজা,

ফলারের যোগাড় বড়ই।"—একথা আজকালকার কুড়ি টাকা মাহিনার কেরাণীও শুনিয়া হাসিবে; এবং মধ্যম ফলারের—"সরু চিঁড়া, কাতারি কাটিয়া শুখা দই, মর্তমান কলা এবং ফাকা খই," ও অধম ফলারের—"গুমা চিড়া, জ'লো দই, চিটা গুড় ধেনো খই" প্রভৃতির উল্লেখ তো আজকাল ভদ্র সমাজে করাই চলিবে না। অর্থাৎ এই একশত বৎসরে, বাঙ্গালার ভদ্র-সমাজের পয়সা কমিয়াছে, সামাজিক ঐক্যবোধ কমিয়াছে, সামাজিক ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সহায়তার ভাবও কমিয়াছে; এই একশত বৎসরে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য, এবং বিশুদ্ধ খাদ্য প্রায় অপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে; ঘরে ঘরে এখন দু'বেলা দু'মুঠি অন্নের জন্য হাহাকার; কিন্তু বাড়িয়াছে আমাদের চাল, বাড়িয়াছে পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতার ভাব, বাড়িয়াছে বিরাট্ কিছু একটা ব্যাপার করিয়া, সমাজের সকলের মনে তাক লাগাইয়া দিবার ইচ্ছা।

আমার বেশ মনে আছে, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে যখন আমার বয়স দশ-এগার বৎসর হইবে, কোন বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। সেখানে আহার্য্যের সাধারণ নিরামিষ পদের উপর অধিকন্তু মাছের কালিয়া হইয়াছিল, এবং এই অভিনব ব্যাপার লইয়া অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় প্রকারেরই একটা চাপা আলোচনা পড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারের প্রায় ২০ বৎসর পরে, আর-একটী বিবাহের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হই, বরযাত্রী-হিসাবে। সেদিন "লগনসার বাজার" ছিল, এবং কলিকাতাবাসী সকলেই জানেন, ঐরূপ দিনে কলিকাতায় মাছ, দই, সন্দেশ কিরূপ দুর্মূল্য হইয়া পড়ে; এবং দই সন্দেশ বেশী মূল্য দিয়া পাওয়া গেলেও, মাছ সময়-সময় দুষ্প্রাপ্য হয়, কখন-কখন একেবারে অপ্রাপ্যই হইয়া যায়। যে বিবাহের কথা বলিতেছি, তাহাতে কন্যাকর্তা সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ, কলিকাতায় নবাগত বলিয়া মাছের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। বরপক্ষ তাঁহারই নিজের জেলার। বরের কতকগুলি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কতকগুলি স্বগ্রামবাসী আত্মীয়কুটুম্ব যুবক খাইতে বসিয়া মাছ না পাইয়া এমনি অধৈর্য্য হইলেন যে, তাঁহাদের অধৈর্য্য-ভাব ও অসন্তোষ স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না,—এবং বিপন্ন কন্যাকর্তা আসিয়া ভোজন-নিরত "গয়ার পাপ" এই সকল বরযাত্রীর নিকট করযোড়ে নিজ ক্রটী স্বীকার করা সত্ত্বেও অনেকে হাত গুটাইয়া রহিলেন—আর খাইলেন না, এবং কেহ-কেহ গ্লাসের জলে আচমন সারিয়া লইয়া, রুমালে হাত মুছিয়া সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। বিবাহের ভোজে মাছের ব্যবস্থা না হওয়ায়, অনেক স্থলে, "একি শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে খেতে এসেছি" বলিয়া রূঢ়তা প্রকাশ

করার কথাও শুনিয়াছি।

আরও দশ বৎসর পরে, আজকালকার দিনে একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই সব সাধারণ নিমন্ত্রণ-উৎসবের লুচি ও মাছের কালিয়ার অতিরিক্ত পোলাও ও মাংসের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন, এবং কেহ-কেহ এই চালের সহিত ব্যয়-সংক্ষেপের সামঞ্জস্য করিবার জন্য, পাইকারী হিসাবে ছাগল কিনিয়া আপনার ঘরে দুই একদিন রাখিয়া, সেইগুলিকে যথাদিনে বধ করান—বিবাহাদি উৎসবের আয়োজন মধ্যে একটা ছোট-খাট কসাইখানা বসাইতেও দ্বিধাবোধ করেন না—যদিও এই কসাইখানা বাড়ী হইতে একটু দূরে করা হয়।—ভারতীয় এবং হিন্দু সংস্কৃতির দৃষ্টিতে দেখিতে, এইসব ব্যাপার সাধারণ ভদ্রতা-বিগর্হিত বর্বরতা এবং ঔচিত্যবোধ-রহিত হৃদয়হীনতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কলিকাতার কোনও সম্ভ্রান্ত ও দেশবরেণ্য পরিবারের কথা বলিতেছি ; এই পরিবারের যশ কেবল বাঙ্গালা দেশে বা ভারতবর্ষে নিবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের শিক্ষিত লোকের কাছে এই পরিবারের নাম পঁহুছিয়াছে—একবার ইঁহাদের বাড়ীতে কোন কন্যা বিবাহের নিমন্ত্রণের ভোজে মাছ-মাংসের সংস্পর্শও দেখিলাম না। জিনিসটী এমনই অভাবনীয় লাগিল যে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—বিবাহের ন্যায় শুভ-উৎসবে জীব-হত্যার রীতি ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। এই কথা শুনিয়া আমার অবশ্য বিশেষই আনন্দ হইয়াছিল, এবং সমাগত বন্ধুদের যাঁহারা ইহা শুনিলেন, তাঁহারাও এইরূপ মনোভাবের শ্রেষ্ঠতা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেন।

সামাজিক নিমন্ত্রণের ভোজনের পদের সংখ্যা এইরূপে ক্রমাগত বাড়িয়া চলা বাঙ্গালী সমাজের ক্রমপ্রবর্ধমান মূর্খতা ও বর্বরতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যাপার এইরূপই দাঁড়াইয়াছে যে, কোন কোন স্থলে ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিতেছে—কেবল ভদ্রতা কেন, শালীনতাবোধ এবং কাণ্ডাকাণ্ড-বোধেরও মাত্রাকে অতিক্রম করিতেছে। কলিকাতা-অঞ্চলে বিবাহের আশীর্বাদের নিমন্ত্রণের খাওয়া ("পাকা দেখার খাওয়া") সাধারণতঃ অর্থশূন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে—চল্লিশ-পঞ্চাশ বা ষাট-সত্তর রকমের পদ তৈয়ারী করিয়া নিমন্ত্রিতের পাতে দিয়া নষ্ট করিতে না পারিলে, একটু সম্পন্ন গৃহস্থ যেন স্বস্তি লাভ করেন না।

এইসব ব্যাপার যে ঘটিতেছে, তাহার প্রধান কারণ—আমাদের সমাজের মধ্য হইতে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ-শক্তি যেন আর থাকিতেছে না। নবাগত কাঞ্চন-কৌলীন্যের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের বাঁধন খুলিয়া যাইতেছে। বাঁধনের দোষ অনেক

আছে, কিন্তু বাঁধন না হইলে আবার একতাও হয় না, বাঁধন না থাকিলে ব্যষ্টি সমষ্টিতে পরিণত হইয়া, কার্য্য-সাধিকা সংহতিতে দাঁড়ায় না। বাঙ্গালার বাহিরে যে সমস্ত হিন্দু সমাজ আছে, তাহাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন এখনও অপেক্ষাকৃত প্রবলভাবে বিদ্যমান, এবং সেই সঙ্গে সামাজিক স্বাধীনতাবোধও যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত আছে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে সামাজিক ভোজে যদি একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম করা যায় যে, এই অনুপাতে এই প্রকারের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহার অতিরিক্ত করিলে সমাজের প্রতি অত্যাচার করা হইবে এবং তাহা নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা বাঁচিয়া যাই।

আমাদের সাধারণ জাতীয়তা-বোধ এখন কমিয়া আসিতেছে—অর্থাৎ আমাদের জাতির মধ্যে উদ্ভূত রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, চাল-চলন আর পূর্ববৎ প্রবল থাকিতেছে না। সমাজ চলে নিজের বিপুল দেহভারের স্বাভাবিক গতিতে; কিন্তু দুই-চারিজন সমাজনেতা বা "ফ্যাশন-বাজ," অনেক সময়ে সমাজের এই ধীর-মন্থর গতিকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। "একটা নূতন কিছু করো" এইভাবে প্রণোদিত প্রতিপত্তিশালী কোনও ব্যক্তি, যেখানে নিজের বিচার ও রুচি অনুসারে নূতন কিছু রীতি প্রবর্তিত করান, সমাজের আর দশজন সেই রীতিতে অস্বস্তি অনুভব করিলেও চুপ করিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ মানিয়া লয়—প্রতিবাদের সাহস অনেকের থাকে না, কারণ, তাহা হইলে লোকে প্রতিবাদ-কারীর শিক্ষা এবং মানসিক প্রগতির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবে, হয় তো বা তাহাকে অন্ধ প্রাচীন সংস্কারের দাস-ই বলিয়া ফেলিবে, এবং তাহাতে তাহার মনে অপমান-বোধ হইবে। কলিকাতার সমাজ এখন বহুল পরিমাণে পল্লী-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন। আমাদের সামাজিক চাল-চলন বা আদবকায়দা—ইংরেজীতে যাহাকে বলে "এটিকেট্"—সে সম্বন্ধে এই বছর দশ-পনেরর মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। আমরা স্বদেশীয়ানার দোহাই দিয়া যতই তারস্বরে চেঁচাই না কেন; দৈন্যের নিপীড়নে দেড়-টাকার খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং পাঁচ-সিকার চাপ্লি জুতা পরিয়া Plain Living and High Thinking-এর দোহাই যতই পাড়ি না কেন; আমাদের বিজ্ঞাপনের ছবিতে ভারতীয়ত্বের নিশানা-স্বরূপ নকল অজন্টার ছাপ যতই মারি না কেন;—ইহা অতি সত্য কথা যে, আমরা ইউরোপীয় আদব-কায়দা ও রীতি-নীতি শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া, স্বাভাবিক-ভাবে সহজেই গ্রহণ করিতেছি। এখানে "রীতি-নীতি" শব্দ দ্বারা আমি দেশ-কাল-নিবদ্ধ চলা-বসার কায়দা-কানুন-ই

ধরিতেছি—মানসিক উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয়ের কথা ধরিতেছি না। গাছ-তলায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ মনীষার সহিত টক্কর দিতে পারে, এইরূপটীও দেশে দেখিয়াছি; আবার খুব কেতা-দুরুস্ত ইংরেজী-ফ্যাশন-বিদ্ ব্যক্তি, মানসিক উৎকর্ষ বিষয়ে অশিক্ষিত-পদবাচ্য, এরূপটীও দেখিয়াছি। আমাদের দেশে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে, যেরূপ রীতি-নীতি, আদব-কায়দা হওয়া স্বাভাবিক, তাহা ক্রমে-ক্রমে গঠিত হইয়াছিল। এখন আমরা সেগুলিকে ছাড়িতেছি, সেগুলির সহিত পরিচয়ের অভাব হেতু, এবং ইউরোপীয় রীতি-নীতির সহিত পরিচয় ও তাহার অনুচিকীর্ষা হেতু। কলিকাতায় পাঁচ বাড়ীর ভদ্র শিক্ষিত লোক একত্র হইলেই, আমাদের আদব-কায়দা অনেকটা ইংরেজী আদব-কায়দার এক নিকৃষ্ট অনুকরণ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের বৈঠকখানা এখন ড্রয়িঙ্-রুম্-এ পরিবর্তিত হইতেছে—ইহা বলিলেই এক কথায় অবস্থার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি ঘটিবে। ড্রয়িঙ্-রুমে পরিবর্তিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু বৈঠকখানার বিকাশ যদি সময়-উপযোগী হইয়া ঘটিত, বৈঠকখানাকে ঘুচাইয়া দিয়া ড্রয়িঙ্-রুম যদি আসিয়া না বসিত, তাহা হইলে জাতির "কাল্‌চার" বা চর্য্যার ধারার সহিত একটা যোগ থাকিত। অন্তঃপুরেও এই ভাব প্রবেশ করিতেছে। সে দিন কোনও বন্ধু, একটী সান্ধ্য-সম্মেলনের বন্দোবস্ত করিবার কালে আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিলেন—"হ্যাঁ মহাশয়, আজকের সন্ধ্যার পার্টির চীফ গেস্টকে যদি মালার সঙ্গে চন্দন দেওয়া যায়, তা হ'লে সেটা কি 'ওরীয়্যাণ্টাল' হবে?" হিন্দুর ছেলে আমার কাছে দৌড়িয়া আসিয়াছে ফতোয়া লইবার জন্য—সান্ধ্য-সম্মেলনে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের কপালে চন্দন দিলে, "ওরীয়্যাণ্টাল" হইবে কিনা। অর্থাৎ আমাদের কাছে সাবেক ধরণ-ধারণ সমস্ত এখন যেন কোন্ সুদূর "ওরীয়্যাণ্টাল" হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আমাদের নিজের দেশের-ই রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব ঠিক যেন ইউরোপীয়ানের মনের ভাবের অনুকারক হইয়া পড়িতেছে—নাড়ীর টান আমরা হারাইতেছি। এই নূতন "কাল্‌চার"-এর চোখ, ইউরোপীয়ানের চোখ আমরা পাইতেছি; ওদিকে মানসিক ফিরিঙ্গীয়ানা যত বাড়িতেছে, নিজেদের সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্থিতির প্রতি, জাতীয় মনোভাবের প্রতি, যতই আস্থা ও শ্রদ্ধা আমাদের কমিতেছে, যতই আমরা সুবিধাবাদী হইয়া পড়িতেছি, ততই আমরা আমাদের জীবনের একটু বাহ্য decoration বা অলঙ্কৃতি-রূপে দুই-একটা সেকেলে জিনিস রাখিয়া, "ওরীয়্যাণ্টাল", "ওরীয়্যাণ্টাল" বলিয়া চেঁচাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিতেছি।

নিমন্ত্রণের ভোজের কথা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম—সেই সম্পর্কে আর একটা পরিবর্তনের উল্লেখ করিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার বক্তব্যের শেষ করিব। আজকাল কলিকাতায় হিন্দু ভদ্র গৃহে সামাজিক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে টেবিলে খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত হইতেছে। শুচিবায়ুগ্রস্তা অথবা শুচিব্রতা আমাদের পিতামহীগণ স্বর্গে থাকিয়া আজকালকার হিন্দু সমাজের অনাচার দেখিয়া নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিতেছেন; কিন্তু কালধর্মে, সকড়ী বা উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে সেকেলে নিষ্ঠাবান্ বাঙ্গালী হিন্দুর ধারণা আর বজায় থাকিতেছে না। টেবিলে খাওয়া প্রচলিত হওয়া কতকটা এই অত্যধিক শুচিতাবোধ অথবা শুচিবায়ুর বিরুদ্ধে একটী অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া। নিমন্ত্রণ-সভায় জুতা চুরি যাইবার ভয় আছে; জুতা চোখের সামনে রাখিয়া, বা পরিয়া খাইতে বসায়, মনে একটা স্বচ্ছন্দতা আসে, এইজন্য টেবিলে বসিয়া খাওয়ার এতটা লোকপ্রিয়তা ঘটিতেছে। সমাজের মধ্যে যে কিরূপ ট্রাজি-কমিক ব্যাপার বিদ্যমান, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। ইহার উপরে হোটেলগুলিরও প্রভাব আছে। এই সকল মিলিয়া, সামাজিক ভোজেও টেবিলে বসিয়া খাওয়ার রীতি প্রবর্তনের সহায়তা করিতেছে। কিন্তু ইহাতে এখনও সাধারণ বাঙ্গালী সামাজিক-ভাবে অনেকে একত্রে বসিয়া খাওয়ার কালে, স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে না। পূরা ইউরোপীয় মতে টেবিলে বসিয়া খাওয়া আমাদের পক্ষে শিক্ষা-সাপেক্ষ ব্যাপার, বিশেষ ব্যয়-সাধ্য তো বটেই। খাইতে-খাইতে পাঁচবার দেহ বাঁকাইয়া অষ্টাবক্র হইয়া, ধুতি, জামা, চাদর বাঁচাইয়া বসা খুব প্রীতিকর ব্যাপার নহে—জুতা বাঁচিল বটে, কিন্তু টেবিলের উপরে রক্ষিত কদলীপত্র বা অন্য পাত্র হইতে, অথবা পরিবেশকের হাতা হইতে নিপতিত তরকারীর ঝোল বা পানিতোয়াব রস গায়ে যাহাতে না পড়ে, সে বিষয়ে নজর রাখিতে-রাখিতেই যেন প্রাণ যায়। কুশাসনের ভাড়া এবং কলাপাতা কেনার যে খরচ, চেয়ার-টেবিলের ভাড়া এবং অন্য খরচ তাহা অপেক্ষা কম নহে, —কিন্তু কর্মভোগও অনেক; এবং সকলেই যে ইহা পছন্দ করে তাহাও নয়। আবার কলাপাতার বদলে টেবিলে পাতিবার জাপানী কাগজের জন্য কিছু পয়সা আমরা বিদেশে দিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে "বাবু-ভাইয়া"দের মধ্যে একটা ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, এই টেবিলে খাওয়ানোটাই smart এবং fashionable; আর কি রক্ষা আছে? শত অসুবিধার কথাও ইহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়। প্রথম-প্রথম টেবিলে খাওয়ার রীতি প্রবর্তিত হওয়ার সময়ে, এরূপ খাওয়াকে কোথাও-কোথাও "দাঁড়া খাওয়া" বলিতে শুনিয়াছি; তখন কেহ-কেহ ইহাতে আপত্তিও করিতেন। এইরূপ "দাঁড়া-খাওয়া"-তে যোগ না দিয়া, আমিও

এক-আধ বার আমার জাতীয়তা-বোধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু ফ্যাশন-এর স্রোত দুর্নিবার। কোনও নিমন্ত্রণে গিয়া পংক্তিতে বসিয়া, কলাপাতায় করিয়া খাইতে গেলে বিশেষ দেরী হইবে, অতএব টেবিলে-ই বসিয়া যাও, এই অনুরোধের উত্তরে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা দ্বারাই আমার এবং আমার ন্যায় জাতীয় চর্য্যা-বিষয়ে রক্ষণশীল বহু হিন্দু-সন্তানের মনোভাব বুঝা যাইবে—"হিন্দুর মধ্যে খাওয়া-দাওয়ায় আমরা জা'ত মানি না; কিন্তু পাত মানি॥"

পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি

বঙ্গীয়-পুরাণ-পরিষদের সভাপতি, পরিচালক ও সদস্যবৃন্দ, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, তথা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ও স্নাতকগণ—

আপনারা আমার যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কার এবং অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। পুরাণ-পরিষদের পরিচালকবর্গ এই বৎসর পরিষদের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিতে আহ্বান করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে যে-সকল দেশপূজ্য পুণ্যশ্লোক মনীষী এই উৎসব উপলক্ষ্যে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, বিশেষতঃ পুরাণ-শাস্ত্রে অলব্ধ প্রবেশ মাদৃশ অনধিকারী জনের আপনাদের সমক্ষে কিছু বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, আমার নিজের কাছে নিতান্তই অশোভন এবং স্পর্ধার কার্য্য বলিয়া মনে হয়। তথাপি, আমাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হিন্দু চর্য্যা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ ও সাধন স্বরূপ পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে অন্য হিন্দুর ন্যায় আমি মনে-মনে বিশেষ গৌরববোধ পোষণ করি; এবং আপনারা স্নেহশীল চিত্তে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন; এই উভয় কারণে, আমি আপনাদের প্রদত্ত অদ্যকার দিনের কার্য্যভার শিরোধার্য্য করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীশ্রীমহাপূজা অবসিত; কিন্তু পূজার বাদ্য ও ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গে, পূজা-প্রকোষ্ঠে ও মণ্ডপে সপ্তশতী চণ্ডীর উদার শ্লোকরাশির স্নিগ্ধোদাত্ত ধ্বনি এখনও আমার কানে ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহার রেশটুকু এখনও মিলায় নাই; পূজার ধূপ-ধূনার সৌরভের সঙ্গে-সঙ্গে এই নিরানন্দ দেশে এই কয়দিনে শিশুদের কলরবে ও গৃহপ্রত্যাগত প্রবাসীর মুখের হাসিতে যে আনন্দের আভাস আনিয়াছে, তাহার স্মৃতি এখনও আমাকে

আকুল করিতেছে। সমস্ত বঙ্গদেশ এখন জগজ্জননী উমার জয়গানে নিযুক্ত, যে জগজ্জননীর মহিমা পুরাণেই প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হইয়াছে; নৈরাশ্যপূর্ণ বর্তমানকে ভুলিয়া কয়দিনের জন্য যেন বাঙ্গালী জাতি পুরাণের শাশ্বতত্বে, অতীতের চিরন্তনত্বে ডুবিয়া গিয়া, অনন্তের প্রবহমাণ ভাবধারায় অবগাহন করিয়া, সংবৎসরের জন্য, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য চিত্তশুদ্ধির পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। এইরূপ শুভ অবসরে পণ্ডিত-সজ্জন-সকাশে পুরাণ- মহিমা শ্রবণ ও শ্রাবণ লোভনীয় বস্তু বলিয়া মনে হয়; সেই হেতুও আপনাদের আদেশ পালন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ, হিন্দু ধর্ম ও চর্য্যার প্রধান গ্রন্থ। বেদ উপনিষদ্ আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চর্য্যার ভিত্তি স্বরূপ পরোক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে বটে, কিন্তু যে শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম অবস্থান করিতেছে, যে শাস্ত্রকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কায়া বলিতে পারা যায়, সে শাস্ত্র হইতেছে আমাদের ইতিহাস ও পুরাণ। আমাদের দেশে নব-সৃষ্ট এরূপ একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে, যে মতবাদে ইতিহাস ও পুরাণের প্রকৃত মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রক্ষা করা হয় নাই। এই-সকল মতবাদ অনুসারে, ভারতের ধর্মচিন্তার ইতিহাসে সোপনিষদ্ বেদ অথবা কেবলমাত্র উপনিষদ্ একমাত্র আলোচনীয় পুস্তক, বেদেতর বা উপনিষদিতর অন্য শাস্ত্র অগ্রাহ্য; এবং এইরূপ মতবাদ যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের অনেকের মনে পরিস্ফুট বা প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস এই যে, ভারতের অথবা হিন্দুজাতির ইতিহাসে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ চিন্তা তাহার চরম বিকাশ উপনিষদের যুগে ঘটিয়াছিল, তদনন্তর অথবা তদতিরিক্ত আর যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে—যথা তন্ত্রশাস্ত্র বা আগমশাস্ত্র, ভক্তিবাদ, পৌরাণিক ধর্ম ও অনুষ্ঠান—এ সমস্তই ভুল, এ সমস্ত না হইলে হিন্দুজাতির পক্ষে মঙ্গল ছিল, এ সমস্তই ক্রমিক অবনতির লক্ষণ। উপনিষদের শুভ্র জ্যোতির আতিশয্য-হেতু এবং ধর্ম-সাধনায় পথ-বিশেষের প্রতি ইহাদের অত্যন্ত অনুরাগ অথবা পথান্তরের প্রতি সমধিক বিরাগ হেতু, ইঁহাদের দৃষ্টিশক্তি অন্য বস্তুকে স্বরূপে দর্শন করিতে অক্ষম। আমাদের জাতির ধর্ম ও চর্য্যার ইতিহাসে, বিগত যুগের ঐতিহাসিকগণের চেষ্টায়, বহু আলোচনার পরে একটি ক্রম-বিবর্তন স্থিরীকৃত হইয়া সকলের দ্বারা এক প্রকার স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। ক্রম-বিবর্তনটী এই যে,—প্রথমে বেদ-সংহিতা, পরে উপনিষদ্, ও তৎপরে পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র,—এই ক্রম অনুসারে, উপনিষদ্ অপেক্ষা পুরাণাদি শাস্ত্র অর্বাচীন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্মের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের সহিত শাস্ত্রের পৌর্বাপর্য্যের সংযোগ বা সম্বন্ধ আছে, এই ভ্রান্ত ধারণার পোষকতা যাঁহারা করেন,

তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে অর্বাচীনতর পুরাণাদি শাস্ত্র, প্রাচীনতর বেদ ও উপনিষদ্ অপেক্ষা অপকৃষ্টতর, এবং পূর্ণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক চেষ্টার সহিত আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু বেদ ও উপনিষদ্, এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদি—ইহাদের আপেক্ষিক পৌর্বাপর্য্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ভ্রান্ত, অন্ততঃ মাত্র আংশিক ভাবে সত্য ; এই তথ্যেই এখন আধুনিক আলোচনার ফলে আমরা উপনীত হইতেছি। পুরাণাদি তথাকথিত অর্বাচীন শাস্ত্রের মূল বস্তু, বেদ অপেক্ষা আধুনিক নহে ; হিন্দু-চিন্তার ইতিহাসে, পুরাণের ভাবধারা বেদেরই পরিপূর্ত্তি—বেদ ও পুরাণ, নিগম বা শ্রুতি ও আগম, উভয়ের সমন্বয় ও উচ্ছেদ্য মিলনের ফলে হিন্দু ধর্ম ও চর্য্যার পত্তন। হিন্দুর ইতিহাসে পুরাণকে অশ্রদ্ধা করিলে চলে না, পুরাণের অবশ্যম্ভাবিতা ও নানাবিষয়িণী শ্রেষ্ঠতাকে স্বীকার করিতেই হয় ; আধুনিক বিচার-শৈলী অনুসারে আমরা এই সকল সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। ঐতিহাসিক আলোচনার দিক্ হইতে, হিন্দু সভ্যতার বিকাশে পুরাণের স্থান যে অতি উচ্চে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। হিন্দু সভ্যতার স্বরূপটী বুঝিবার জন্য এই প্রকার ঐতিহাসিক আলোচনার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনা বিশেষ একটী বিদ্যা মাত্র, এবং বিদ্যা-পদবাচ্য আলোচনা বলিয়া ইহা অনধিকারী জনসাধারণের জন্য হইতে পারে না—এই দিক দিয়া পুরাণ আলোচনা কেবল পণ্ডিতগণ-মধ্যেই নিবদ্ধ, জনগণের ইহাতে বিশেষ আস্থা বা ইহার সম্বন্ধে তাদৃশ ঔৎসুক্য হইতে পারে না ; সুতরাং সমাজের পক্ষে ইহার সার্থকতা তাদৃশ প্রবল নহে ; পণ্ডিতের বিচারের বস্তু হইয়া বাদ-বিতণ্ডা মত-বিশেষের খণ্ডন-মণ্ডনেই এই প্রকার আলোচনা পর্য্যবসিত হইবার সম্ভাবনা অধিক, —মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে, তাহার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ইহার সংযোগ প্রায় কিছুই থাকে না। অবশ্য, মানসিক অনুশীলন বা চর্য্যার পক্ষে এই প্রকার আলোচনার একটী প্রধান স্থান আছে, ইহা স্বীকার্য্য ; কিন্তু তদতিরিক্ত আরও কিছু না পাইলে, আলোচনার বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের আত্মীয়তা-বোধ বা প্রীতি উৎপন্ন হইতে পারে না, সাধারণ ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষই থাকে। কিন্তু পুরাণ আমাদের দেশে কেবল পণ্ডিতের উপজীব্য, মৃত বা মৃতকল্প বিদ্যামাত্র নহে ; ইহা তদতিরিক্ত অনেক কিছু ; পুরাণ কেবল কোনও সম্প্রদায়-বিশেষে নিবদ্ধ বিশেষ ভাষা বা শাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় শিষ্টজনের-ই আলোচ্য বস্তু মাত্র নহে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে ইহা একটী বিরাট্ ভূভাগের সমগ্র অধিবাসী-বৃন্দের হৃদয়-স্পন্দনের সহিত জড়িত ; আধিভৌতিক অর্থাৎ রক্ত-মাংসের দেহের মত-ই ইহা জাতির আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক দেহ ; ইহা পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত রিকুথের

এক অশরীরী অংশ। এই রিক্থকে এতদিন ধরিয়া হিন্দু যে ভাবে আঁকড়াইয়া রক্ষা করিয়া আছে, তাহা জগতে অন্য জাতির মধ্যে দেখা যায় না; এবং এই রিক্থকে আত্মসাৎ করিয়া রাখিবার চেষ্টাই তাহাকে চিরকাল ধরিয়া অপূর্ব শক্তি দিয়াছে, বহু পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক ঝঞ্ঝার মধ্যে নিজ প্রতিষ্ঠায় অটল থাকিতে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশের পথে অবিচলিত গতিতে তাহাকে চালিত করিয়াছে। বিগত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব, ভারতীয়ের ভারতীয়ত্ব যাহা, তাহা ইতিহাস ও পুরাণের আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুর ব্যক্তি-গত, গোষ্ঠী-গত ও জাতি-গত নানা সমস্যা ও সমাধান, তাহার রূপকথা ও ইতিহাস, তাহার ভূয়োদর্শন ও চিন্তা, তাহার ব্যবহারিক জ্ঞান ও ভাব-জগৎ, তাহার ভোগ ও ত্যাগ, অনুরাগ ও বিরাগ, তাহার আশা ও আশঙ্কা, আদর্শ ও জুগুপ্সা, শৌর্য্য ও ভীরুতা, তাহার শৈশব-স্মৃতি ও বার্ধক্যের বিচার—সমস্তই রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে আনিয়া ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ জীবনের-ই মত বিরাট্, অখণ্ড, সর্বন্দর, সর্বংসহ; সদ্ভাব ও বিরোধ উভয়েই পূর্ণ, সঙ্গতার্থ এবং অসঙ্গতার্থ উভয় প্রকারের বাণী বা বচন পুরাণে বিদ্যমান। বহু শতাব্দী ধরিয়া একটী বিশাল জাতির সমগ্র জীবনের প্রতীক-স্বরূপ পুরাণ উপেক্ষণীয় নহে। হিন্দুর জ্ঞান-সাধনার পরিচয় এই পুরাণের মধ্যেই নিহিত আছে—প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষ, শিল্পশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যবহারিক শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনা করিতে গেলে, পুরাণগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিতে হয়।

পুরাণের মধ্যে নিহিত যে শাশ্বত আদর্শ-সমূহ দুই তিন সহস্রক ধরিয়া হিন্দুর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে, সেই আদর্শগুলির কার্য্যকারিতা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বরঞ্চ, অধুনাতন কালে আমাদের জীবনে পুরাণের শিক্ষা ও সাধনার আবশ্যকতা যতটা অধিক ভাবে অনুভূত হইতেছে, ততটা প্রাচীন কালে ছিল কি না সন্দেহ। এখন আমাদের সমাজ, বিশেষতঃ গত দুই-তিন দশকের মধ্যে, যতটা আত্মহারা, যতটা কেন্দ্রচ্যুত, যতটা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ততটা পূর্বে কখনও হইয়াছিল কিনা জানি না; বোধ হয়, ততটা কখনও হয় নাই। জীবন-যাত্রা এতাবৎ সরল ছিল, সহজ ছিল; দেশের আপামর সাধারণ একটী সর্বজন-গ্রাহ্য philosophy of life অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চের সহিত মানব-জীবনের সম্বন্ধ বিষয়ে একটা ধারণা, ও তদনুসারে একটী discipline of life অর্থাৎ জীবন-যাত্রার-নিয়ামক একটী বিনয় বা পরিপাটী স্থির করিয়া লইয়াছিল, এবং তদনুসারে সকলেই

চলিতে চেষ্টা করিত। এখন আমরা এই philosophy ও discipline, এই অবলোকন-শক্তি ও বিনয়-পরিপাটী, উভয়ই হারাইতে বসিয়াছি, বহু স্থলে হারাইয়াও ফেলিয়াছি। নূতন কোনও philosophy, যোগ্যতর অর্থাৎ যুগোপযোগী নূতন কোনও discipline এখনও আমরা পাই নাই। এখন ভাঙ্গনের দশা; কাল-বৈশাখীতে সমস্ত জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে, আমাদের সমাজ-তরী প্রতিকূল বায়ু ও স্রোতের মুখে পড়িয়া কোন্ বিশালাক্ষীর দহে গিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, জানি না; কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-সাধ্য মানবের অবস্থা-পরিবর্তনের স্রোতে আমরা তো জড় কাঠ-কুটার মত গা ভাসাইয়া দিতে পারি না, আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে, কি উপায়ে আমরা ঝড়-জল কাটাইয়া উঠিতে পারি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও তন্নিহিত ভাব-সম্পদ আমাদিগের এখন অবস্থা বুঝিয়া চলিতে সাহায্য করিতে পারে।

পুরাণ-কথা ও তন্নিহিত গভীর ও উচ্চ ভাবাবলী, ভারতীয় সভ্যতার আদিম অবস্থা হইতেই এদেশীয় জনগণের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। বহু বিভিন্ন জাতির মিলনে আমাদের ভারতীয় হিন্দু-জাতির উদ্ভব। ভারতের (অথবা অন্য কোনও দেশের) প্রাচীন সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনায় নিযুক্ত হইবার পূর্বে, আধুনিক মনোভাব অনুযায়ী অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুমোদিত কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রথমেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হয়; অন্যথায়, আলোচনা সার্থক হয় না, সমদর্শী ও সর্বগ্রাহী হয় না—একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ এবং নিরর্থক থাকিয়া যায়। এই দুইটী প্রতিজ্ঞা গ্রহণে কাহারও আপত্তি উঠিতে পারে না, এবং সে আপত্তি আজিকার দিনে কেহ গ্রাহ্যও করিবে না। প্রতিজ্ঞা দুইটী এই; এক—ভারতের ও ভারতীয় মানবের ইতিহাস, জগতের অর্থাৎ ভারতের বাহিরের সমগ্র বিশ্বের মানবগণের ইতিহাসের-ই অন্তর্ভুক্ত, এক অখণ্ড মানব-প্রচেষ্টার অংশ-রূপেই আমাদের ভারতের মানব-প্রচেষ্টাকে ধরিতে হইবে, ইহার বহির্ভূত রূপে নহে; এবং দুই—কোনও বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায় বা শ্রেণী, বিশেষ-রূপে ভগবানের অনুগৃহীত হইতে পারে না—প্রাচীন ইহুদী, প্রাচীন ও আধুনিক খ্রীষ্টান ও মুসলমান, জাপানী ও চীনা প্রভৃতি বহু জাতির (এবং ব্যবহারিক জীবনে ব্রাহ্মণাদি বহু ভারতীয়ের) মধ্যে তথা বহু অসভ্য জাতির মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আরোপকারী এইরূপ অনুচিত বিশ্বাস বিদ্যমান দেখা যায়। শিষ্টজনের উচিত, এইরূপ মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা; গীতায় উক্ত সর্ব-জীব ও সর্ব-জাতির প্রতি ঈশ্বরের পক্ষপাত-শূন্য সমদৃষ্টিতে আস্থা স্থাপন পূর্বক, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির কত বিচিত্র প্রকাশ ও বিকাস হইয়াছে সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া, কি ভাবে বিভিন্ন জাতি-

সমূহের কৃতিত্ব পরস্পরকে সম্পূরণ করিয়া, এক অখণ্ড, সর্বাবলম্বী, সমন্বয়-মূলক মানব-জাতির কৃতিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার চর্চা করা, এবং এই কার্য্যে প্রত্যেক জাতিকে তাহার চেষ্টার ও সার্থকতার অনুরূপ জয়মাল্য অর্পণ করা।

এই প্রতিজ্ঞা দুইটী মানিয়া লইলে, যুক্তিতর্কানুমোদিত ঐতিহাসিক আলোচনায় স্পষ্টীকৃত হয় যে, ভারতের বাহির হইতে আর্য্যজাতি তাঁহাদের চর্য্যা ও ধর্ম-নীতি তথা পুরাণ-কথা লইয়া এদেশে আগমন করেন। এদেশে আর্য্যজাতির আগমনের পূর্বে, দ্রাবিড় ও কোল জাতীয় অনার্য্যগণ বাস করিতেন। এই অনার্য্যদের যে নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল, নিজ ধর্ম ও অনুষ্ঠান, নিজ ইতিকথা ও পুরাণ ছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আর্য্যের ধর্ম ও সমাজ এবং অনার্য্যের ধর্ম ও সমাজ, বহু বিষয়ে পৃথক্ ছিল। আর্য্য ও অনার্য্যের প্রথম সংঘর্ষের পরে, উভয় জাতির মধ্যে মিলন ঘটিল, এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতি ও ধর্ম মিলিয়া হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় জাতি ও ধর্মের উদ্ভব হইল। এই মিলন-সঞ্জাত নবীন সভ্যতা ও ধর্মের বাহন হইল আর্য্যের ভাষা সংস্কৃত। ধর্ম-বিশ্বাস, দেবতা-বাদ, আচার ও অনুষ্ঠান, ইতিহাস ও পুরাণ-কথা উভয় জাতির নিকট হইতেই গৃহীত হয়, এবং ধীরে-ধীরে এই সমস্ত বিষয় সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত হইয়া চিরতরে রক্ষিত হইয়া থাকে। আর্য্যের সভ্যতার ও ধর্মের নিদর্শন অনেকটা অবিমিশ্র-রূপে আমরা ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় পাই। পরবর্তী যুগে বিশুদ্ধ আর্য্য ধর্ম ও মতবাদ, ধীরে-ধীরে অনার্য্য তথা মিশ্র আর্য্যানার্য্য ধর্ম ও মতবাদের প্রভাবে নিষ্প্রভ হইয়া যাইতে থাকে—আর্য্যের অনুষ্ঠিত উপাসনা-রীতির সহিত অনার্য্যের উপাসনা-রীতির একটা অচ্ছেদ্য সমন্বয় সাধিত হইয়া উঠে। হোম, আর্য্যদের রীতি; ব্রাহ্মণাদি তিন দ্বিজ-বংশেরই হোমে অধিকার, শূদ্রের ইহাতে অধিকার নাই। বেদে ও অন্য বৈদিক সাহিত্যে আমরা কেবল হোমেরই কথা পাই—পুষ্প-চন্দন অক্ষতাদি দ্বারা পূজার উল্লেখ পর্য্যন্তও বৈদিক সাহিত্যে কুত্রাপি নাই। পূজার অনুষ্ঠানটী মূলতঃ অনার্য্যদেরই অনুষ্ঠান বলিয়া অনুমিত হয়। আধুনিক হিন্দুজনগণের মধ্যে যে-সমুদয় দেবতার পূজা প্রচলিত—যাঁহারা হিন্দুজাতির প্রথম ও প্রধান শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ কারন,—ঋগ্বেদের দেবসভায় তাঁহাদের স্থান অপ্রধান ও নগণ্য, বৈদিক উপাসনায় তাঁহাদের আবাহন নাই বলিলেই হয়। অথচ হিন্দুধর্মে শিব ও উমা, বা বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনার মত মহীয়সী কল্পনা আর কোথায়? সমস্ত পুরাণ ইঁহাদেরই অনন্ত মহিমা বর্ণনে নিযুক্ত, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও দর্শন ইঁহাদের শ্রীচরণ বেড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে। পুরাণ-বর্ণিত দেব-কল্পনা ও দেব-লীলা হঠাৎ একদিন বেদের পরবর্তী কোনও কালে হিন্দুর মস্তিষ্কে

গজাইয়া উঠিয়াছিল, এরূপ অনুমানের পক্ষে কোনও যুক্তি নাই। বহু শত বৎসর ধরিয়া, বেদের সময় হইতেই (এমনকি তাহার পূর্ব হইতেই), পুরাণের প্রধান দেব-কাহিনীগুলি কোন না কোন রূপে বিদ্যমান ছিল, ইহা অনুমতি হয়; অবশ্য হিন্দুজাতির কল্পনা ও দর্শন-শক্তির প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে-সঙ্গে পরে সেগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করে—কাব্য-সৌন্দর্য্য ও সত্য-দর্শনের আলোক দ্বারা সেগুলি উদ্ভাসিত হয়। পৃথিবীর মানব-কল্পনা এবং মানবের চিন্তা, ঈশ্বরের সত্তাকে ও স্বরূপকে শব্দের দ্বারা ও রূপ-সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করিবার জন্য যুগে-যুগে দেশে-দেশে নানাবিধ প্রয়াস করিয়াছে—কিন্তু উমা ও শিব, শ্রী ও বিষ্ণুর প্রতীককে আশ্রয় করিয়া মানুষের এই কল্পনা ও চিন্তা ভারতবর্ষে যেরূপ গভীর-ভাবে যতটা ব্যাপক-ভাবে ব্রহ্মের আস্বাদন করিতে আমাদের সহায়তা করিয়াছে, সে-ভাবে পৃথিবীর আর কোথাও মানবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই; বিভিন্ন ধর্মের সামান্য মাত্রও তুলনা-মূলক আলোচনা যিনি করিবেন, তিনিই এই কথা স্বীকার করিবেন। শিব ও উমা—শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি যে ভারতবর্ষে বেদ-রচক আর্য্যদের আগমনের পূর্বেই বিরাজ করিতেছিলেন, এমন কি লিঙ্গ ও গৌরীপট্টময় তাঁহাদের প্রতীকও যে ভারতবর্ষে আর্য্য-পূর্ব যুগেও বিদ্যমান ছিল ও লোকের নিকট পূজিত হইত, তাহার প্রমাণ দক্ষিণ-পাঞ্জাবে হড়প্পাতে ও সিন্ধু-প্রদেশে মোহেন-জো-দড়োতে (যেখানে আর্য্য-পূর্ব যুগের বিশাল নগরীর সুবৃহৎ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে সেখানে) পাওয়া গিয়াছে। পুরাণে হর-পার্বতীর যে লীলা প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মূল উৎস যেমন এক দিকে আর্য্যদের মূল-গ্রন্থ বেদে গিয়া খুঁজিতে হয়, তেমনি অপর দিকে তাহা বেদ-পূর্ববর্তী মোহেন্-জো-দড়োর যুগের আর্য্যেতর জাতির ধর্ম এবং দেবার্চনা-রীতির সম্পর্কিত নানা নিদর্শন হইতেও দেখা যায়। দেবতাদের সম্বন্ধে যে-সকল গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা পুরাণে পাওয়া যায়, সেগুলি আংশিক-ভাবেও যে আর্য্য-পূর্ব যুগের, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। হিন্দুধর্মের সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে যোগ; এই যোগ-সাধন পদ্ধতিও যে প্রাগ্‌বৈদিক, অনার্য্য,—সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাস আমরা মোহেন-জো দড়োর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে পাইতেছি। সৃষ্টি-প্রকরণ—ক্ষীরাব্ধিতে অনন্তশয্যায় শয়ান নারায়ণ, তাঁহার নাভিজাত-কমলে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান, মধুকৈটভ-বধ প্রভৃতি ব্যাপার; সাগর-মন্থন; দেবাসুর-যুদ্ধ, শক্তির আবির্ভাব; দশাবতার-কথা; ইত্যাদি শত-শত দেব-কাহিনী আছে; ঐতিহাসিক বিচারের দিক হইতে এগুলির গভীর ভাবে আলোচনা হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত কাহিনী, পুরাপুরি বৈদিক জগৎ হইতে লব্ধ নহে; বেদ-বহির্ভূত অনার্য্য জগতেও

ইহাদের অনেকগুলি রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। উপস্থিত এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া জানিবার উপায় আমাদের নাই—হয় তো অদূর ভবিষ্যতে নূতন আবিষ্কার-দ্বারা আহৃত প্রাচীন শিল্পাদির নিদর্শনের সাহায্যে পূর্ণ আলোচনার ফলে, আমাদের নিকটে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।

দেব-কাহিনীর মত ইতিহাস-কথা—প্রাচীন রাজগণের জীবনী ও কীর্তির কথা, যাহা পুরাণে ও রামায়ণ-মহাভারতে রক্ষিত আছে, সেই ইতিহাস-কথাও যে দেব-কাহিনীর মত কতক অংশে আর্য্যেতর জাতিরও প্রাচীন ইতিকথাকে রক্ষা করিয়া আছে, সে সম্বন্ধেও অনুকূল মত ও যুক্তি প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজন্য বা ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি এবং ইতিকথা যে অনেকটা অনার্য্য জাতিরই রীতি-নীতি এবং ইতিকথা, এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। যাহা হউক, এ বিষয়ে আলোচনা এখনও অনেকটা জল্পনা-কল্পনার আকারেই চলিতেছে। এখনও এ বিষয়ে সর্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই হয় নাই। তবে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে উপস্থিত যে দিকে হাওয়া বহিতেছে, সেদিকের কথা একটু উল্লেখ করিয়া রাখিলাম।

এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই:—ভারতের পুরাণের ধারা, আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতির দেবতাবাদ ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান; পুরাণের মূল উৎস, আংশিক-ভাবে বেদেরও পূর্ব্বকার যুগে ভারতে প্রচলিত দেব-কাহিনী ও রাজ-কাহিনী। আর্য্য এবং অনার্য্যের মিশ্রণের ফলে হিন্দুজাতির উদ্ভব ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে, অনার্য্য পুরাণও আর্য্য-ভাষায় গ্রথিত হইতে থাকে;—কোথাও সংস্কৃতে, কোথাও প্রাকৃতে; এবং অবশেষে, গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌দের রাজ্যকালে, ব্যাসদেবের নামের সঙ্গে পুরাণ-কাহিনীগুলিকে জড়িত করিয়া, রামায়ণ-মহাভারতের পাশে পুরাণগুলির শেষ সংস্কৃত রূপ হিন্দুজন-মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃত রূপ দিবার আবশ্যকতা ছিল; অন্যথা সমগ্র ভারতে প্রচারের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ সংস্কৃতভাষাই হিন্দুভারতে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দ্বারা চালিত ভারতকে, একসূত্রে বাঁধিয়া, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নানা প্রদেশকে মিলিত করিয়া এক অখণ্ড দেশে পরিণত করিয়াছিল। সংস্কৃতে রূপ দেওয়ার ফলেই এগুলিকে আরও পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত করিবার সম্ভাবনা কম হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সংস্কৃত রূপ ছিল পণ্ডিতের আলোচনার জন্য; পুরাণের প্রাচীন কাহিনীগুলি, দেশভাষাতেও জনসমাজ-মধ্যে প্রচলিত ছিল,—প্রাকৃতে, দ্রাবিড় ভাষায় ও সম্ভবতঃ অস্ট্রিক বা কোল ভাষায়। এখন যেমন নিরক্ষর কৃষক বা শ্রমিক, অথবা ভদ্রঘরের অশিক্ষিত ব্যক্তি, বাঙ্গালা

বা হিন্দী বা তামিল ভাষাতেই পুরাণের গল্প শুনে ও শিখে, এবং সেগুলি হইতে জীবনের শ্রেষ্ঠ রসায়ন সংগ্রহ করে, তখনও তাহাই করিত; প্রাকৃতে, প্রাচীন তামিলে বা প্রাচীন কানাড়ীতে এইরূপ পুরাণের গল্প প্রচলিত থাকার প্রমাণ আমাদের হাতে যথেষ্ট আছে। ভারতের গণ-চিত্ত কখনও পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ হারায় নাই। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের কথা ভাষায় শুনিলে মানুষ রৌরব নরকে যাইবে—এইরূপ উক্তি, অর্বাচীন কালের কোন্ ইতিহাসানভিজ্ঞ মূর্খের রচনা তাহা জানি না। এইরূপ উক্তিকে প্রাধান্য দিয়া প্রাচীনকালে লোক-ভাষায় পুরাণাদির প্রচার ছিল না এইরূপ কল্পনা করা নিতান্তই অযৌক্তিক ব্যাপার।

মুসলমান রাজত্বের পূর্বে, প্রাচীনকালে সংস্কৃতেতর লোকভাষায় পুরাণ যে ছিল, তাহা আমাদের আধুনিক আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষায়, পুরাণ ও ইতিহাসের কতকগুলি পাত্র-পাত্রীর নামের রূপ হইতে বুঝা যায়। আজি হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে, আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষী জনগণের পূর্বপুরুষগণ, সংস্কৃত শব্দ 'কৃষ্ণ', 'রাধিকা', 'অভিমন্যু' প্রভৃতির প্রাকৃত রূপ 'কণ্‌হ', 'রাহিআ', 'অহিবন্নু' বলিতেন; তাই না আমরা এই-সব প্রাকৃত নামের আধুনিক বাঙ্গালা রূপ 'কানু', 'রাই'; 'আয়ান' এখনও ভুলিতে পারি নাই, এবং ইহাদের প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ 'কান্‌হ', 'রাহী', 'আইহণ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-প্রমুখ প্রাচীন পুঁথিতে পাই। এইরূপ যে কত প্রাকৃত রূপ পরবর্তী কালে মূল সংস্কৃত রূপের দ্বারা ভাষা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই কারণেই উত্তর-ভারতে হিন্দীতে, সংস্কৃত শব্দ 'সীতা-'র পাশে উক্ত শব্দের প্রাকৃতজ রূপ 'সীয়, সিয়' এখনও পাওয়া যায়, 'লক্ষ্মণ'-এর পাশে 'লখন', এবং প্রাচীন হিন্দীতে 'রাম'-এর যে একটী প্রাকৃতজ রূপ 'রাওঁ' ছিল, তাহারও ইঙ্গিত আমরা পাই। তামিলে প্রাচীন কাল হইতেই প্রধান পৌরাণিক দেবতাদের বিশুদ্ধ দ্রাবিড় নাম পাই—'মাল্' অর্থাৎ বিষ্ণু, 'পেরু-মাল্' অর্থাৎ মহাবিষ্ণু, 'অয়ন্' অর্থাৎ ব্রহ্মা; 'শিবন্' বা 'শিব' শব্দটিকেই কেহ-কেহ দ্রাবিড় ভাষার-ই শব্দ বলিয়াছেন; উমার এক তামিল নাম 'কোব্বৈ'; গণেশ 'পিল্লৈয়ার্' রূপে পূজিত, কার্ত্তিকেয় তামিলদেশে 'মুরুকন্' নামে জনপ্রিয় দেবতা; তেলেগুতে 'ত্রি-নয়ন' শিবের নাম 'মুক্কণ্টি'।

কতকগুলি প্রমাণ ও যুক্তির বলে এই-রূপ বোধ হয় যে, আমাদের অধুনা-প্রচলিত সংস্কৃতে রচিত পুরাণ ও ইতিহাস, আদিম যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল না। প্রাচীন আর্য্য যুগে ছিল কতকটা আর্য্য বৈদিক ভাষায় ও কতকটা নানা আদিম

অনার্য্য ভাষায়—দেব-কাহিনী ও রাজ-কাহিনী ; এবং পরবর্তী কালে ছিল, প্রাকৃতে ও প্রাচীন তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষায়, পুরাণ-কথা। অধিকন্তু, সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে স্বতন্ত্রাকারে সেদিন পর্য্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতেও কতকগুলি পুরাণ-কাহিনী বিদ্যমান ছিল। পুরাণ চিরকাল ধরিয়া ভারতের জনগণের সাহিত্য, ভাষা-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য। লোক-সাহিত্য বলিয়া ইহাকে মার্জিত করিয়া লইবার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা, যতগুলি সম্ভব আখ্যানকে সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন, 'পুরাণ'-নামক গ্রন্থাবলী মধ্যে গ্রথিত করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে সংস্কৃতীকরণের ফলে, ও সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণের চিন্তা, দর্শন ও কল্পনা দ্বারা আলোকিত ও উন্নীত হওয়ার ফলে, এবং প্রামাণিক গ্রন্থ-মধ্যে সংগৃহীত হওয়ায়, এগুলির লোক-প্রসিদ্ধি এবং সমাজে প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত অষ্টাদশ পুরাণের ও তৎসংখ্যক উপ-পুরাণের বাহিরেও, শত-শত অন্য পুরাণ-কাহিনী এখনও বিদ্যমান ; কোথাও সম্পূর্ণ পৃথক্ বা নূতন দেব-কাহিনী বা ঐতিহ্য রূপে, কোথাও বা সংস্কৃত পুরাণ ও ইতিহাস-ধৃত আখ্যায়িকা হইতে অল্পাধিক বিভিন্ন রূপের আখ্যায়িকা রূপে। হয় তো এগুলিও সংস্কৃতে নীত হইয়া ব্যাসদেবের নামের ছাপ লইয়া পুরাণ-রূপেই পরিগণিত হইত ; কিন্তু উত্তর-ভারত বিদেশীয় তুর্কী মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইবার পরে, এবং তদনন্তর মুসলমানীকৃত উত্তর-ভারতীয়গণের দ্বারা দক্ষিণ-ভারত বিজয়ের পরে, দেশে যে অরাজকতার ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলিল, তাহার ফলে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষায় নূতন পুরাণ সঙ্কলন বিষয়ে আর ততটা অবহিত হইতে পারিলেন না। কেন্দ্রীভূত হিন্দু রাজ-শক্তির ও ব্রাহ্মণ-শক্তির অভাবে, নূতন সংস্কৃত পুরাণ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হওয়া আর সম্ভবপর রহিল না, এই-সকল পুরাণের কাহিনী ও উপদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশেই নিবদ্ধ রহিল। দক্ষিণের প্রায় প্রত্যেক বড় তীর্থস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার লীলা অবলম্বন করিয়া বহু 'স্থল-পুরাণ' বা 'মাহাত্ম্য' আছে, তাহাদের অনেকগুলি মনোহারিত্বে অথবা প্রাচীনত্বে সাধারণ পৌরাণিক কাহিনী হইতে কোনও অংশে হীন নহে ; কিন্তু 'গয়া-খণ্ড', 'কাশী-খণ্ড', 'জগন্নাথ-মাহাত্ম্য' প্রভৃতির ন্যায় এগুলি সর্বজন-স্বীকৃত পুরাণ বা উপ-পুরাণ মধ্যে স্থান পাইল না। বাঙ্গালা দেশের মঙ্গল-কাব্যগুলি পুরাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে ; কিন্তু মনসা-মঙ্গলের সতী বেহুলার কাহিনী, বা চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু ও শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী, সংস্কৃতে গৃহীত না হওয়ায় ও পুরাণ-পদবী না পাওয়ায়, বাঙ্গালা ভাষায় ও বাঙ্গালা দেশেই সীমাবদ্ধ রহিল। বৌদ্ধমতের পুরাণ বলিয়া ধর্ম-মঙ্গলে বর্ণিত লাউসেনের কাহিনীও অনাদৃত-

রহিল, এবং রাজা গোপীচাঁদের কাহিনীও সংস্কৃতে গৃহীত হইল না; অথচ এই গোপীচাঁদ-কাহিনী সমগ্র ভারতের বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় জনগণ-মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রচারিত হইয়া আছে। রামায়ণের কথা বাঙ্গালা দেশে যে-ভাবে আবহমান কাল প্রচলিত, যাহার ধারাটী আমরা কৃত্তিবাস-প্রমুখ কবিগণের বাঙ্গালা রামায়ণে পাই, তাহার মধ্যে এমন দুই-একটী সুপ্রাচীন কথা আছে, যেগুলি বাল্মীকি-রচিত সংস্কৃত রামায়ণে নাই, অথচ যবদ্বীপের রামায়ণে আছে। বাঙ্গালা রামায়ণের মূলে যে বাল্মীকি-বহির্ভূত অন্য প্রাচীন রামায়ণ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

বহুস্থলে আবার এরূপ দেখা যায় যে, অধুনা-প্রচলিত বিশেষ কোনও দেবলীলা-কথার কোনও অংশ বা অঙ্গ, সেই লীলা-বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণে পাইতেছি না—পাইতেছি, পরবর্তী যুগের ভাষায় রচিত কোনও আখ্যান বা কাব্যে। দুইটী কারণে এই রূপটী ঘটিতে পারে; এক—দেবলীলার প্রাচীন-পুরাণ-বহির্ভূত এই অঙ্গ বা অংশ পরবর্তী কালের কল্পনা-প্রসূত, এবং নূতন সংযোজন; অথবা, দুই—প্রাচীন পুরাণে কোনও কারণে অগৃহীত, সুপ্রাচীন কথার-ই লোকমুখে প্রচারিত রূপ অবলম্বন করিয়া, ভাষা-পুস্তক মধ্যে-ই ইহা প্রথম গ্রথিত। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ সমীক্ষার সহিত তথ্য-নির্ধারণ করিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়—প্রাচীন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ নাই, শ্রীরাধার অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মত গ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লেখ নাই; অথচ হিন্দী ও বাঙ্গালা কাব্যে দানখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-লীলার দুইটী অংশ-রূপে গৃহীত, এবং শ্রীরাধা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব, পরবর্তী কাব্যে ও কবিতায় কল্পনাতেই আনিতে পারা যায় না। বাঙ্গালীর প্রাচীনতম বৈষ্ণব কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে দৌত্য করিবার জন্য 'বড়ায়ি' বা জরতীকে মাত্র পাই, শ্রীরাধার ললিতাদি অষ্টসখীর নাম অজ্ঞাত, শ্রীকৃষ্ণের সুবলাদি সখা-গণও অজ্ঞাত, এবং জটিলা কুটিলার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই নাই। কৃষ্ণায়ণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বৃন্দাবন-খণ্ডের আলোচনায় এই সকল অসঙ্গতির পূর্ণ সমাধানের প্রয়াসকে পুরাণ-আলোচনার অংশ বলিয়াই ধরিতে হইবে। বাঙ্গালায় প্রচারিত শিবায়নে-ও সংস্কৃত পুরাণের অতিরিক্ত, অর্বাচীন যুগে বাঙ্গালার হিন্দুজাতি কর্তৃক গৃহীত শিব-বিষয়ক কতকগুলি কাহিনী মিলে। বাঙ্গালার ব্রতকথাগুলিও অ-সংস্কৃত লোক-পুরাণের অন্তর্গত।

এইরূপ নানা দিক্ দিয়া, ভারতবর্ষের ধর্ম, চিন্তা ও রসসৃষ্টির প্রাচীনতম ধারা, ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির চিরন্তন অনুপ্রাণনা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক

জীবনের উৎকর্ষ বিধানে ভারতের নরনারীর চির-সহচর, পুরাণ গ্রন্থগুলি, প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ের আলোচনার বস্তু হওয়া উচিত। পুরাণ- ও ইতিহাস-কথা ভারতের ঋষিগণের বাণীকে সকলের নিকট সহজ-বোধ্য করিয়া দিয়াছে, গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্যকে রূপক-চ্ছলে সুলভ করিয়া দিয়াছে। ভারতের বাহিরে যেখানে-যেখানে ভারতের সভ্যতা প্রসৃত হইয়াছে, সেখানে সেখানে ভারতের পুরাণ-কাহিনীও পহুঁছিয়াছে। শক-জাতীয় কুষাণ সম্রাট্‌দের (কনিষ্কাদির) মুদ্রায় 'উগ্র', 'অহীশ' বা 'বিষ-বৃষ', 'মহাদেব' নামে শিবের মূর্তি, 'বাত' নামে বায়ুর মূর্তি, 'স্কন্দ', 'কুমার', 'মহাসেন' নামে কার্ত্তিকেয়ের মূর্তি চিত্রিত দেখা যায়; কুষাণ সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া পর্য্যন্ত প্রসৃত ছিল, সুতরাং তখন ভারতের এই সমস্ত পৌরাণিক দেবদের সম্বন্ধে, এবং সম্ভবতঃ পুরাণ-নিবদ্ধ ইঁহাদের লীলা-কথার সম্বন্ধে, মধ্য-এশিয়ার লোকেরাও কিছু-কিছু খবর পাইয়াছিল। কুষাণ সম্রাট্‌দের পরবর্ত্তী কালে মধ্য-এশিয়ায় পঞ্চমুখ বৃষ বাহন শিবের, হর-পার্বতীর ও শ্মশ্রুমান্ ইন্দ্রের চিত্র পাওয়া গিয়াছে; চীনে বৃষ-বাহন শিব, ষডানন ময়ূর-বাহন স্কন্দ, ও গণেশের পর্বত-গাত্রে খোদিত মূর্তি আছে। গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী চীন ও জাপানে এখনও পূজিত। মধ্য-এশিয়ার লোকেরা, তথা চীন, কোরিয়া ও জাপানের অধিবাসীরা, ভারতের ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের কথা ভালরূপই জানিত—জটাজূটধারী দীর্ঘশ্মশ্রু ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের তত্তৎ দেশের শিল্পীদের হাতে আঁকা অনেক চিত্র মধ্য-এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে পাওয়া গিয়াছে। মধ্য-এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে বৌদ্ধ প্রভাব-ই সমধিক ঘটিয়াছিল, সেইজন্য জাতক অবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ পুরাণ-ই এই সকল দেশে অধিকতর আদৃত; ব্রাহ্মণ্যানুমোদিত পুরাণ ও ইতিহাস সেখানে প্রসৃত হইতে পারে নাই। তথাপি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মী, দেবতা-বাদে উভয়ের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আছে, এবং সেই ঐক্য-হেতু, আমাদের সুপরিচিত অনেক পৌরাণিক কাহিনী চীন ও জাপানের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে পাইয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিন্তু ভারতের পুরাণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যানুমোদিত পুরাণ, একেবারে দিগ্‌বিজয় করিয়া সেই দেশের লোকের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে। 'ইন্দোচীন'-নামধেয় ভূ-ভাগে—অর্থাৎ সুবর্ণভূমি বা দক্ষিণ-বর্মা, ব্রহ্মদেশ বা উত্তর ও মধ্য-বর্মা, দ্বারাবতী বা দক্ষিণ-শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা বা কোচিন্-চীন, এবং শ্যামরাষ্ট্র, এই কয়টী দেশে, এবং 'ইন্দোনেসিয়া' অর্থাৎ দ্বীপময়-ভারতে, অর্থাৎ মালয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক, বোর্নিও প্রভৃতি স্থানে, ভারতের পুরাণ-কথা এবং রামায়ণ-মহাভারত নব নিকেতন প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্মা, শ্যাম

ও কম্বোজের লোকেরা এখন বৌদ্ধ ; মালয়, সুমাত্রা ও যবদ্বীপের লোকেরা এখন মুসলমান ; কেবল ক্ষুদ্র বলিদ্বীপের লোকেরা মিশ্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম পালন করিয়া থাকে। তথাপি ঐ সব স্থানে রামায়ণ, মহাভারত এবং আমাদের বহু পৌরাণিক কাহিনী, ভারতবর্ষের হিন্দুদের কাছে যতটা আদৃত হইয়া থাকে, ততটা-ই আদৃত হইয়া আছে ; এবং ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময়-ভারতে বোধ হয় ভারতবর্ষের চেয়েও অধিক আদৃত। ভারতবর্ষের-ই মত ঐ-সব দেশের ভাস্কর্য্য ও অন্য শিল্পকে আমাদেরই ইতিহাস ও পুরাণ পুষ্ট করিয়াছে—রামায়ণ-মহাভারত বা তদবলম্বনে রচিত নানা কাব্য ও নাটক গ্রন্থ বাদ দিলে, যবদ্বীপীয় ও বলিদ্বীপীয় সাহিত্যের, শ্যাম ও বর্মা ভাষার সাহিত্যের এবং কম্বোজ সাহিত্যের অনেকখানি চলিয়া যায়। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি—আমাদের-ই জাতীয় সম্পদ্ লইয়া সেখানকার লোকেরাও যে এতটা আপনার করিয়া ফেলিয়াছে, এতটা গর্ব করে, তাহা দেখিয়া আমাদের মন গর্ব-সুখে ভরিয়া উঠে। যবদ্বীপের প্রাম্বানান্-এর বিশাল শিবক্ষেত্রের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের তিনটী বিরাট্ মন্দিরের গাত্রে খোদিত রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ণ চিত্র ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন ; ভারতবর্ষেও এত সুন্দর ও লক্ষণীয় অনুরূপ রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ণ চিত্রাবলী কুত্রাপি নাই। কম্বোজের সুবিখ্যাত আঙ্কর-বাৎ মন্দিরের ভিত্তিতে-ও তদ্রূপ রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের দৃশ্যাবলী অঙ্কিত আছে। রামায়ণ-মহাভারত এবং কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যান এখনও বিশেষ লোকপ্রিয় নাটকের কথাবস্তু ; এবং এইগুলিকে আশ্রয় করিয়া বর্মা, শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের অভিনব ছায়ানাট্য সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আমি অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি—এবং যবদ্বীপে আমাদের মহাভারত কি আকারে পাওয়া যায়, সে বিষয়েও সামান্য একটু পরিচয় অন্যত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

পুরাণ ও ইতিহাসের আখ্যান ও আদর্শ, যতই অনুশীলন করা যাইবে, দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক তথা শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় সংস্কৃতির পক্ষে ততই মঙ্গল। একটা কথা আমাদিগের ভুলিলে চলিবে না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ যেমন একদিকে জগতের শ্রেষ্ঠতম উপাখ্যানাবলীর অক্ষয় ভাণ্ডার তেমনি অন্যদিকে ভগবদ্জ্ঞান ও ভগবৎপ্রেম এবং চিত্তশুদ্ধির অনুকূল ভাবধারার, তথা ভারতের বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ তপস্যা ও যোগ-সাধনার অনন্ত অমৃত-প্রস্রবণ। পুরাণ ও ইতিহাস আলোচনায় এবং লোক-সমাজে ইহাদের ভূয়ঃ প্রচারে একদেশদর্শী হইলে চলিবে না। রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের উপাখ্যানের সহিত শিশু ও কিশোরদিগকে

সময়োপযোগী আকারে পরিচিত করাইবার সাধু চেষ্টা বঙ্গদেশে আজ-কাল দেখা যায়। কিন্তু দেশের সাধারণ ভাব-গতিক দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হয় যে, পুরাণের অমর উপাখ্যানাবলীকে, ইহার দেবচরিত্র-বিষয়ক কাহিনীগুলিকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভাবশুদ্ধির সহিত আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি যেন বহুক্ষেত্রে আমরা হারাইয়া ফেলিতেছি। পুরাণের আখ্যান কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে অতুলনীয়; আমরা অধুনা যেন সেই আখ্যানগুলিকে কেবল আমাদের aesthetics বা সৌন্দর্য্য-বোধের উপায়ন-রূপেই ব্যবহার করিয়া, তাহাদের অমর্য্যাদা করিতেছি। পৌরাণিক আখ্যানের কাব্য- বা চিত্র-সৌন্দর্য্যেই তাহাদের চরম সার্থকতা নহে; এই আখ্যানগুলি মানুষের গভীরতম সত্তার ও অনুভূতির প্রতীক; এই বোধ—অন্ততঃ পক্ষে—এইরূপ বোধকে জাগরিত করিবার ইচ্ছা, না থাকিলে, পিতৃপিতামহ হইতে লব্ধ আমাদের এই রিক্থের প্রতি অবমাননা করা হয়। পুরাণের অথবা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পারি-পার্শ্বিকের মধ্যে স্বয়ং পরিবর্ধিত না হইলেও রবীন্দ্রনাথের মত কবি, ভগবদ্দত্ত প্রতিভা-বলে ও তাঁহার ঐশী কল্পনাশক্তি-প্রভাবে, আমাদের কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যান, কতকগুলি পৌরাণিক মূর্তির ভাব-সম্পদ অনুভূতি-গোচর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাঁহার অমর কবিতায় অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যের সহিত তাঁহার অনুভূত এই ভাব-সম্পদ্ বঙ্গভাষী পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শিবের মহীয়সী কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথের 'মরণ', 'পাগল' প্রভৃতি কবিতায় ও গদ্য-রচনায় যে ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার আর তুলনা হয় না। রূপ-কলায় তদ্রূপ সিদ্ধ-শিল্পী নন্দলাল যে-ভাবে পুরাণের মহিমা তাঁহার অমর তূলিকার রেখা-শক্তি ও বর্ণ-সুষমায় ধরিয়া দিয়াছেন, তাহাও অপূর্ব: তাঁহার নটরাজে, শিবের ও উমার বহু চিত্রে, ও অন্য দেবতা-বিষয়ক বহু চিত্রে—এবং তাঁহার রামায়ণ-চিত্রাবলীর মত নানা চিত্র রচনায়—তিনি আমাদের প্রাচীন যুগের বিরাট্ ধ্রুপদ-ছন্দী হিন্দু শিল্পের, মহাবলিপুর অজন্টা এলোরা ধারাপুরীর দেবোচিত সৃষ্টির ঝঙ্কার বা আভাস আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে আনয়ন করিয়াছেন। দৈবী প্রতিভায় ও কল্পনাশক্তিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কতকগুলি কবিতায় যে উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, আস্থাযুক্ত ও শ্রদ্ধাশীল হিন্দুর সাধনার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নন্দলাল আমাদের যে স্বর্গীয় সঙ্গীত তাঁহার তূলিকার রেখা-ভঙ্গীতে ও বর্ণ-সম্পাতে শুনাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিক-ই বিস্ময়কর। কিন্তু অন্য সাধারণ কবি ও রূপকারের নিকট, পুরাণ ও ইতিহাসের আখ্যানের ভাবগাম্ভীর্য্যটুকু যেন ধরা দেয় নাই—মাত্র তাহার কাব্য বা

রূপ-সৌন্দর্য্যটুকুই ইঁহারা 'গ্রহণ করিতে' সমর্থ হইয়াছেন। বিগত যুগের কবি ও লেখকদের মধ্যে, বঙ্কিম ও মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীন যেভাবে পুরাণকে নিজ নিজ গ্রন্থে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ভাবেই তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা intellect বা ব্যবহারিক বোধ ও বিচার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই করিয়াছিলেন, পুরাণের আভ্যন্তর ভাবগাম্ভীর্য্য, অথবা পুরাণ হইতে আহৃত নিছক aestheticism তাঁহাদের প্রেরণা দেয় নাই। ভক্তকবি গিরিশচন্দ্রও পুরাণের আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতাকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—তবে পুরাণের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বঙ্গদেশে প্রচলিত ভক্তিবাদই তাঁহার 'পৌরাণিক' নাটকগুলিকে রাগরঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী যুগের সাধারণ কবি ও লেখকদের কাছে পুরাণকথা কাব্য বা কলাবিলাসের অঙ্গ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাবগাম্ভীর্য্যের পরিবর্তে, দিব্যানুভূতির দ্যোতনার পরিবর্তে, পুরাণকথা ইঁহাদের কাছে ভাববিলাসের বস্তু, রূপবিলাসের বা কাব্যবিলাসের উপকরণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। জাতির চিত্তে ভাবগ্রাহিণী শক্তির অথবা অনুভূতিশক্তির এবং চিন্তার গভীরতার হ্রাস হইতে থাকিলে, যথার্থ সৌন্দর্য্য-বোধের প্রতিষেধক চিত্তমালিন্য ঘটিতে থাকিলে, এইরূপটী হয়। প্রাচীন গ্রীসেও এইরূপ ঘটিয়াছিল ; আদি ও মধ্য যুগের গ্রীক শিল্প—খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক পর্য্যন্ত যে শিল্প রচিত হইয়াছিল—তাহা ভাবশুদ্ধিতে অতুলনীয় ; তৎপরবর্তী কালে দেবতার লীলা ও রূপশুচিতা, শিল্পের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ও কলাবিলাসের দাসী মাত্র হইয়া দাঁড়াইল, এবং গ্রীক ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক শিল্পেরও পতন হইল।

আমাদের দেশে এই প্রকারের-ই কলা-বিলাস আসিয়া, কাব্যে ও শিল্পে পুরাণের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে, জাতীয় ভাবশুদ্ধিরও বিনাশ সাধন করিতেছে। আমাদের অধুনাতন ভদ্রসমাজে অনাদৃত যাত্রাগান পুরাণের ভাব-মন্দাকিনীকে যথোপযুক্ত রূপে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালাদেশে পুরাণের ধারা এই যাত্রাগানেই নূতন রূপ পাইয়াছে। পুরাণের যেটুকু জ্ঞান এখনও ভদ্র ইতর সকলের মধ্যে বিদ্যমান, সেটুকু যাত্রাগান ও কথকতার মধ্যেই আমরা পাইয়াছি ; অধুনা সুচিত্রিত চক্‌চকে' ঝক্‌ঝকে' নানা নয়নাভিরাম পুরাণ-কথার পুস্তক সেই সহজলভ্য জ্ঞানকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। অতি-আধুনিক সাহিত্যের মত অতি-আধুনিক শিল্প আসিয়া পুরাণের মহিমাকে, হিন্দুর দেব-দেবীকে নিত্য অপমানিত করিতেছে ; ইউরোপীয় নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপের আলোক-চিত্র ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া, শিল্পিনামধারী আধুনিক অসুরগণ যে ভাবে দেবতার লাঞ্ছনা

করিতেছেন, তাহা দেখিয়া জাতির ভাবজগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিদারুণ ভাবে হতাশ হইতে হয়। আর একটি অতি-আধুনিক উৎপাত আসিয়া এই ভাব-গঙ্গাকে পঙ্কিল করিতে আরম্ভ করিয়াছে; সেটী হইতেছে সিনেমা। ভগবান্ ইহাদের হাত হইতে পুরাণকে রক্ষা করুন। জাতির মন হইতে আবার কি করিয়া এই বিলাস-বিভ্রান্তিকে দূর করিয়া, তাহার স্থানে, যে ভাবশুদ্ধি, যে চিত্তস্থৈর্য্য ও যে যথার্থ সৌন্দর্য্যবোধ এতদিন ধরিয়া হিন্দুর সহজ সম্পত্তি ছিল তাহাকে ফিরাইয়া আনা যায়, তদ্বিষয়ে আমাদের সমাজ-নেতৃগণের, হিন্দুর চিত্তগতির নিয়ন্তৃগণের, আশু অবহিত হওয়া আবশ্যক।

আমার মনে হয়, পুরাণ যে কেবল সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার নহে, গভীর চিন্তারও ভাণ্ডার বটে, এইরূপ শিক্ষা সাধারণ্যে প্রচার করা আবশ্যক—বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে চাই যে, রায় বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্কলিত 'ভাগবত কুসুমাঞ্জলি'র মত পুরাণ হইতে আধ্যাত্মিক সাধন সম্বন্ধীয় সুক্তি-চয়নময় পুস্তকের বিশেষ উপযোগিতা আছে। এবং ওমর খয়্যামের অনুবাদের বাহুল্য যখন চোখে নিতান্তই লাগে, তখন মনে হয়, দক্ষিণ ভারতের তামিল শৈব সাধক মাণিক্যবাচকর্ ও তয়ুমানবর প্রভৃতির, এবং দক্ষিণের বৈষ্ণব সাধক আল্‌বার্‌গণের পৌরাণিক দেব-প্রতীকের মাধ্যম অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার বাণী আমাদের দেশে পহুঁছানো আবশ্যক। এইরূপ পুরাণ-সংগ্রহ ও তিরুবাচকম্, নালায়ির-প্রবন্ধম্ প্রভৃতি পুস্তক হইতে অনুবাদ হাতে পড়িলেই, সদ্‌ভাবযুক্ত তরুণ-তরুণীকে চিত্তস্থৈর্য্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অবহিত করিবে, গভীর বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য দৈববাণীর মত আহ্বান করিবে,—এবং আমাদের পৌরাণিক দেব-দেবী, যাঁহাদের আমরা কেবল রঙ্গমঞ্চে বা চিত্রশালায় রক্ষা করিয়া জীবন হইতে নির্বাসিত করিতেছি, তাঁহাদের আবার হৃদয় মধ্যে গ্রহণ করিয়া, এ যুগের মানুষ যে আমরা, আমরাও ধন্য হইব।

বঙ্গীয়-পুরাণ-পরিষৎ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া পুবাণ ও ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান-প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুজাতির অশেষ কল্যাণকর কার্য্য করিতেছেন। পুরাণের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্য সাধারণ বাঙ্গালী তরুণ-তরুণী তথা বয়োবৃদ্ধগণকে ইহারা সুন্দর ভাবে সময়োপযোগী পদ্ধতিতেই আহ্বান করিতেছেন। "হরি-ভেটন, দধি-বেচন, এক পন্থ দৈ কাজ"—পুবাণের সঙ্গে পরিচয়, ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় একাধিক শ্রেষ্ঠ সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মাতৃভাষা শিক্ষার দিকে প্ররোচনা—এই দুইটী জিনিস যুগপৎ ইহারা দেশের ছেলেমেয়েদের সমক্ষে আনিয়া দিয়াছেন।

পরীক্ষান্তে অর্জিত প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক উপাধি লাভের আশা এই পরীক্ষার্থীদিগকে অতি সাধু উপায়ে এই সৎকার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে। আমার মনে হয়, বাঙ্গালা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পুরাণ-পরিষদের প্রবর্তিত এই কার্য্যের আরও প্রচার হওয়া আবশ্যক। উত্তর ভারতে হিন্দী ভাষায় তিনটী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, হিন্দী সাহিত্যের চর্চা ও তাহার প্রচারের পথ অনেকটা সহজ করিয়া দিয়াছেন। সম্মেলনের এই পরীক্ষাগুলি যথার্থই পরীক্ষা-পদ-বাচ্য পরীক্ষার্থীদিগের যোগ্যতার বিচার, উচ্চ আদর্শ অনুসারে যথোচিত নিরপেক্ষতার সহিত হয় বলিয়া, সম্মেলনের উপাধি-প্রাপ্ত নর-নারী হিন্দী জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এরূপ পরীক্ষার প্রবর্তন করুন, এতদ্বিষয়ে বহুদিন ধরিয়া আমি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছি। এখন দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছি যে বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষৎ আংশিক ভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরই কর্তব্য পালন করিতেছেন। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, পুরাণ-পরিষদের দ্বারা গৃহীত এই গুরুতর কার্য্যভার লাঘব করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে ও বঙ্গভাষী জাতির নিকট হইতে সহানুভূতি ও সহায়তা আসুক, পুরাণ-পরিষদের কার্য্যের ক্ষেত্র উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করুক, এবং জাতির সংরক্ষণ ও সংগঠন কার্য্যে পরিষদের আরব্ধ চেষ্টা পূর্ণ হউক, পরিষদ্ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করুন।

আজিকার সভায় উপস্থিত উত্তীর্ণ ও উপাধি-প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের দুইটী কথা নিবেদন করিয়া আমার অভিভাষণেব উপসংহার করিব। আপনারা এই পরীক্ষা দিয়া বিশেষ প্রশংসার কার্য্য করিয়াছেন, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন,—তজ্জন্য প্রথমতঃ আপনাদের অভিনন্দিত করিতে চাহি। সাধারণ শিক্ষার উপরন্তু আপনারা যে মাতৃভাষার প্রতি এবং আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছেন,—শ্রম-স্বীকার কবিয়া যে পাঠ্যগুলির অধ্যয়ন করিয়াছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় যে প্রতিষ্ঠা আপনারা পাইলেন, তাহা এই অনুরাগের ও শ্রম-স্বীকারের পূর্ণ পারিতোষিক নহে। ব্রত-গ্রহণ ও ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য আত্মপ্রসাদ এবং সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ-জনিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক লাভই এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ও চিরস্থায়ী পারিতোষিক। যাঁহারা আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, আশা করি তাঁহারা যথাকালে মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা দিবেন। যাঁহারা 'পুরাণ রত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা যেন এই উপাধিলাভেই আরব্ধ পুরাণ-চর্চার পরিসমাপ্তি না করেন। পুরাণ ও ইতিহাস ও তৎসম্পর্কে আমাদের জাতীয়

সংস্কৃতি ও চর্চ্চা সম্বন্ধে উত্তরোত্তর জ্ঞানবৃদ্ধি করা, এবং [illegible] দেশের লোকদের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করা তাঁহাদের [illegible] এই পরীক্ষা দেওন দ্বারা যদি তাঁহারা পাঠ হেতু, অথবা উত্তী[illegible] আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠালাভ হেতু, নিজেদের স্বল্প পরিমাণেও উপকৃত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে, তাঁহাদের পরিচিত মণ্ডলীর মধ্যে এই পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত তরুণ-তরুণী বা অন্য ব্যক্তিকে পুরাণের দিকে আকৃষ্ট করা। নিজেদের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত তো হইবেন-ই, পুরাণ-প্রচার-কল্পে যেখানে সুবিধা হইবে—কথকতা, কীর্ত্তন, রামায়ণ-গান, মনসার গান, যাত্রা প্রভৃতি ধার্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য সদা অবহিত থাকিবেন। বহু বিষয়ে আমরা পিতৃপুরুষগণের নিকটে ঋণী; পুরাণ-প্রচার, পুরাণের পঠন-পাঠন, শ্রবণ-শ্রাবণ এই ঋণ শোধ করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। ইহার দ্বারা পিতৃ-ঋণের আংশিক ভাবে পরিশোধ হইবে; এবং প্রকৃত লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়া দেশবাসিগণের-ও যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিবার সৌভাগ্য আপনারা প্রাপ্ত হইবেন। আপনাদের উপস্থিত সাফল্যের জন্য ও ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের জন্য আমার সাদর অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভকামনা নিবেদন করিতেছি।*

---

* শান্তিপুর বঙ্গীয়-পুরাণ-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ, শারদীয়া ত্রয়োদশী (২৬-শে আশ্বিন ১৩৩৯)।